সপ্তশতী-সমন্বিত

চণ্ডীচিন্তা

ষড়ঙ্গ—অর্গল, কবচ, প্রাধানিক-রহস্য, বৈকৃতিক-রহস্য
ও মূর্ত্তি-রহস্য সম্বলিত

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"

গোরক্ষপুর মহারাণা-প্রতাপ ডিগ্রী কলেজের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত ভূমিকা

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

প্রকাশক—
শ্রীমহানামব্রত পাবলিকেশন ট্রাস্ট
২৪বি স্যর গুরুদাস রোড
কলিকাতা-৫৪

৫ম সংস্করণ, শ্রীচৈতন্যপূর্ণিমা
১৩৫৮ সাল শ্রীহরিপুরুষাব্দ

মুদ্রক—
শ্রীরমেন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬ বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

বিশেষ বক্তব্য

'চণ্ডীচিন্তা'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুধী-পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে যেমন আনন্দের, তেমনি গৌরবেরও বটে।

'চণ্ডীচিন্তা' চণ্ডীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান। চণ্ডী বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থের সহায়তা যে কতদূর প্রয়োজনীয়, পাঠক মাত্রেরই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। গ্রন্থে প্রতিটি শ্লোক ব্যাখ্যাত হয় নাই, মূল বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে মাত্র। সেই সকল শ্লোকের আকর শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্পূর্ণ, বঙ্গানুবাদসহ এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইল। গ্রন্থোক্ত চণ্ডীর উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠক পাঠিকাগণের দেখিবার প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য আর পৃথক্ চণ্ডী গ্রন্থ খুঁজিতে হইবে না। কাজেই 'চণ্ডীচিন্তা' বর্ত্তমানে সপ্তশতী-সমন্বিত হওয়ায়, পূর্ব্বে এবিষয়ে যে অভাব দৃষ্ট হইত, তাহা এইক্ষণ মিটিয়াছে বলা যাইতে পারে।

অনেকেই নিত্য চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থটি যথাসাধ্য নির্ভুল করিয়া পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি গ্রন্থের এই নূতন সংস্করণ পাঠক-পাঠিকাগণের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে।

শ্রদ্ধাবনত
প্রকাশক

ভূমিকা

বৈজ্ঞানিকের ঈশ্বরাবিষ্কার

একজন বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিককে তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন,—মহাশয়, আপনি ত সারাজীবন অক্লান্ত তপস্যা ক'রে প্রকৃতি রাজ্যের বহুবিধ সূক্ষ্ম রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন এবং আপনার অসাধারণ প্রতিভা-বলে মানব-সমাজের সুখসুবিধার জন্য নানাপ্রকার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নিজের বিচারে আপনার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি? বৈজ্ঞানিক-প্রবর একটু হেসে এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দিলেন,—God (ঈশ্বর)। বন্ধু এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বিস্মিত হয়ে এর একটু বিশদ ব্যাখ্যা চাইলেন। প্রবীণ বৈজ্ঞানিক সংক্ষেপে তাঁর ঈশ্বরাবিষ্কারের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তার সার মর্ম্ম আমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রথম থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-সমূহের বাস্তব সত্তা মেনে নিয়ে তত্ত্বানুসন্ধান শুরু করে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, যুক্তি, বিচার ইত্যাদি বিবিধ পদ্ধতিতে আমাদের তত্ত্বানু-সন্ধান যত অগ্রসর হয়, ততই এই ইন্দ্রিয়গোচর জগতেই চিত্ত-চমৎকারী নূতন নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত হয় এবং তা আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা প্রয়োগ করতে সামর্থ্য অর্জন

করি। এই সব রহস্যের ইয়ত্তা নাই। যতই আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হ'তে থাকে, এই জগৎ যে কত রহস্যময়, তা' ততই আমরা উপলব্ধি করতে থাকি। আমাদের বিজ্ঞানের যত প্রসার হয়, আমাদের জ্ঞানের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমরা ততই সজ্ঞান হ'তে থাকি। আমরা বুঝতে থাকি, জ্ঞাতব্যের তুলনায় আমাদের জ্ঞাত কত সামান্য।

আমাদের বিজ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়গোচর অসংখ্য স্থূল পদার্থের রহস্য ভেদ করে, সারা বাস্তব জগতের উপাদানরূপে কয়েকটি মাত্র মৌলিক বস্তু (elements) আবিষ্কার করতে সমর্থ হল এবং তাদেরই সংযোগ বিয়োগে সারা বিশ্ব রচিত বলে সিদ্ধান্ত ক'রল, আবার প্রত্যেকটি মৌলিক বস্তুর সূক্ষ্মতম পরমাণুস্বরূপ নিরূপণ ক'রে তাদের সংযোগ বিয়োগের কতকগুলি নিয়মপ্রণালীও নির্দ্ধারণ ক'রল, তখন বিশ্ব প্রকৃতির সহিত আমাদের নিবিড় পরিচয় হ'ল বলে বৈজ্ঞানিকদের যে অভিমান হয়েছিল, তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে সব জড় পরমাণু অবিভাজ্য, অপরিণামী, নিত্য সত্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তারাও বিভাজ্য, পরিণামী ও অনিত্য ব'লে প্রতিপন্ন হ'ল এবং তাদেরও গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে কত জটিলতা ও রহস্যময়তা আবিষ্কৃত হল। প্রত্যেকটি পরমাণু কতকগুলি শক্তির অদ্ভুত সমাবেশ বলে প্রমাণিত হ'ল, সেই সব শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলও মানুষের কতকটা করায়ত্ত হল, সেই সব শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কি প্রচণ্ড ক্রিয়াসামর্থ্য লাভ করে, তারও পরিচয় পাওয়া গেল! জড়ের ধারণাই বদ্‌লে গেল। প্রত্যেকটি জড় পরমাণু শক্তিময়, শক্তিই জড়ের উপাদান, আধুনিক বিজ্ঞান এটা

প্রতিপন্ন করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, শক্তি জড়ের ধর্ম্ম নয়। জড় বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতেই যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা নয়, যা জড় বলে প্রতীয়মান হয়, তা শক্তিরই অবস্থাবিশেষ, পরিণামবিশেষ, সমন্বয়-বিশেষ।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সূক্ষ্ম গণিত ও যুক্তি-বিচারের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসন্দেহেই প্রতিপাদন করেছে যে, বিশ্বজগতের সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শক্তিরই বিচিত্র খেলা চলছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রেও যেমন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তেমনি। গতিশীল ও ক্রিয়াশীল পদার্থগুলির মধ্যেও যেমন, আপাততঃ স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যেও তেমনি। বহির্জগতেও যেমন, আমাদের অন্তর্জগতেও তেমনি, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা শক্তিরই বিচিত্র পরিণাম, বিচিত্র অভিব্যক্তি, বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ। শক্তি ছাড়া কোন বস্তুর কোন যথার্থ পরিচয় আমরা পাই না। সুতরাং বস্তুর শক্তি, একদা বলা নিরর্থক। ক্রিয়ার মধ্যে যেমন শক্তির পরিচয়, বস্তুর মধ্যেও তেমনি শক্তিরই পরিচয়। প্রত্যেকটি বস্তু একটি শক্তিকেন্দ্র ছাড়া বা শক্তির সমন্বিত অবস্থাবিশেষ ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখে শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করি, যথা—বিদ্যুৎশক্তি, আলোকশক্তি, উত্তাপ-শক্তি, চুম্বকশক্তি, রাসায়নিকশক্তি, পারমাণবিকশক্তি ইত্যাদি। তদতিরিক্ত জীবজগতে আমরা প্রাণশক্তির বিচিত্র খেলা দেখি। মনোরাজ্যে মনঃশক্তির বিচিত্র বিলাস দেখি, বুদ্ধিরাজ্যে বুদ্ধিশক্তির বিচিত্র পরিচয় পাই। এই সব শক্তি যে শুধু পরস্পরের সহিত বিচিত্র

সম্বন্ধে মিলিত হয় ও সংঘর্ষ করে, সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে, তাই নয়, এক শক্তি অন্য শক্তিরূপে পরিণত রূপান্তরিতও হয়। প্রকৃতিরাজ্যে এক শক্তির অন্য শক্তিতে পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই চলছে; আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়েও এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে থাকি। সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় ক্রিয়ার অভিব্যক্তির মধ্যে শক্তি বহুবিধ ব'লে প্রতীয়মান হলেও, সব শক্তিই যে মূলতঃ এক, এতে কি সন্দেহ করা চলে? একই মূল শক্তি বিচিত্র ক্রিয়ার ভিতরে বিচিত্র আকার ও উপাধি গ্রহণ করে, বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, ইহাই কি প্রতিপন্ন হচ্ছে না?

প্রকৃতিরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে শক্তির যে সব বিচিত্র পরিণাম, বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিচিত্র রূপ-রূপান্তর গ্রহণ, বিচিত্র গতিবিধি ও কার্য্যোৎপাদন আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, তার মধ্যে প্রায়শঃ আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিচয় পাই। সব ক্ষেত্রেই শক্তির যেন সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি আছে। বিজ্ঞান এরূপ অনেক নিয়ম আবিষ্কার করেছে ও করছে। এগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলি এবং প্রায়শঃ অখণ্ডনীয় ব'লে গণ্য করি। কিন্তু সূক্ষ্মতর অনুসন্ধানে দেখতে পাই যে, সব ক্ষেত্রেই যে শক্তি এই সব নিয়মের বন্ধন মেনে চলে তা নয়। আমাদের আবিষ্কৃত নিয়মশৃঙ্খলাকে উল্লঙ্ঘন করেও শক্তি অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে এবং আপনার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। শক্তিকে আমরা সর্ব্বতোভাবে নিয়মাধীন বলতে পারি না। শক্তির কার্য্য দেখেই আমরা নিয়ম আবিষ্কার করি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রেও শক্তি কার্য্য করে। শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে স্থূল জগতে আমরা এক জাতীয় নিয়ম দেখি, সূক্ষ্ম জগতে অন্য-

প্রকার ; জড় জগতে একপ্রকার, জীবজগতে কখনও কখনও তার বিপরীত। সুতরাং শক্তি যে শুধু নিজের সত্তায় সত্তাবতী, তা নয় ; কার্য্যজগতে আপনাকে বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও আছে—এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যে এত বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন প্রকারের শক্তিপরিণাম দেখি, এত অভিনব সৃষ্টি ও আকস্মিক ধ্বংস দেখি, এত নিয়মের বাঁধন ও তার সাথে এত নিয়মের ব্যভিচার দেখি, এর মধ্যেও আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অসংখ্য সৌরমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডল বিশিষ্ট, অশেষ জটিলতা-সমাকীর্ণ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ একটা রহস্যময় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এর একটা আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র আছে, এর সর্ব্বাবয়বে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। একটা প্রাণশক্তি যেন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে বিধৃত ক'রে রয়েছে। এটা যেন কারো একটা বিরাট দেহ ; একথাটা শুধু কবিকল্পনা মনে হয় না।

এই বিরাট বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমাদের পৃথিবী। এই পৃথিবীর ক্রম-বিকাশের ইতিহাসও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কি আকস্মিক-ভাবে সূর্য্যের একটা টুকরা খ'সে এসে একটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল, কি অদ্ভুতভাবে একটা প্রচণ্ড তাপ-বিশিষ্ট অগ্নিগোলকের অবস্থা থেকে শক্তি-পরিণামের ভিতর দিয়ে সূর্যের এই টুকরাটি আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, পর্ব্বতে, অরণ্যে, অগ্নি, বিদ্যুদাদিতে বিভক্ত হ'য়ে এ সকলের সুন্দর সমাবেশে কালক্রমে জীববসতির যোগ্যতা লাভ করল, কি রহস্যময় প্রণালীতে এই জড় পিণ্ডের মধ্যে প্রাণের অভ্যুদয় হ'ল, প্রাণের মধ্যে আবার মনের

বিকাশ হ'ল, মনের মধ্যে বুদ্ধির উদয় হ'ল, এবং ক্রমে এই পৃথিবী মনুষ্য-সভ্যতার লীলাভূমি হ'ল। এই বিবর্তনের মধ্যে কতবার কত প্রকার ভাঙ্গাগড়া হয়েছে, কত সৃষ্টি প্রলয় ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এসবই তো শক্তিরই খেলা। প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সবই ত এক শক্তিরই বিচিত্র রূপ। সূর্য্য শক্তিময়, নক্ষত্রাদিও শক্তিময়, পৃথিবীও শক্তিময়ী। কত সৃষ্টি ও ধ্বংসের সমাবেশে কী অদ্ভুত সংগঠন!

বিজ্ঞান আমাদের সামনে যে সব তথ্য উপস্থাপিত করেছে, তা থেকে আমরা অক্লেশেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অশেষ বৈচিত্র্যসমাকুল ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হ'লেও এবং এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্ব্বদা সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা চললেও, এর সমস্ত অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের মধ্যে একটা একত্ব আছে, একটা যোগযুক্ত সংঘবদ্ধ ভাব আছে, সুতরাং নিশ্চয়ই এর একটা প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই অনন্ত শক্তির আধার, স্বসত্তায় সত্তাবান্, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংক্রিয় ও স্বতন্ত্র। সেই প্রাণকেন্দ্র থেকেই চিরকাল অসংখ্য প্রকার শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে, অসংখ্য প্রকার রূপরূপান্তরের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই প্রাণকেন্দ্রই স্বীয় অসীম শক্তিতে বিশ্বের সকল অংশকে, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিধৃত ক'রে, সংঘবদ্ধ ক'রে, যোগযুক্ত ক'রে ধ'রে রেখেছে, সেই প্রাণকেন্দ্রই বিশ্বের সকল ব্যষ্টি ও সমষ্টি সত্তার অফুরন্ত উৎস, আশ্রয় ও নিয়ামক। শুধু বহির্বিশ্ব নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধিও এই বিশ্বপ্রপঞ্চেরই অন্তর্গত এবং সেই একই মহান্ শক্তিকেন্দ্র হ'তেই অভিব্যক্ত ও তদ্দ্বারাই বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শক্তিময় বিশ্বের সকল শক্তির মূলীভূত ও আশ্রয়-স্বরূপ এই মহাশক্তিকে আমরা জড় বলতে পারি

না, কারণ তিনি স্বরাট্, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, স্বয়ংক্রিয়। ইহাই ত চৈতন্যের লক্ষণ। এই মহাশক্তির বিচিত্র আত্মপ্রকাশকে আমরা তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছা ব'লে অভিহিত করতে পারি। সুতরাং সর্ব্বকারণ-কারণ পরম সত্তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চৈতন্যময়ী ও ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি ব'লে স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তাঁকে স্বেচ্ছাময় অনন্তশক্তিমান্ চেতনা-পুরুষ বলতেও আপত্তি নাই। তাঁকেই ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ পরমেশ্বর ব'লে বর্ণনা করেন ও উপাসনা করেন। ঈশ্বর ও ঐশীশক্তির মধ্যে কোন ভেদকল্পনা ঠিক নয়।

ধ্যানযোগীর দেবাত্মশক্তি সাক্ষাৎকার

আধুনিক বিজ্ঞান-সাধকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিই জড়ের ও বহুত্বের মোহ থেকে নিজেদের বুদ্ধিকে মুক্ত ক'রে অশেষ বৈচিত্র-সমন্বিত নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির একাত্মত্বের সন্ধান পেয়েছেন এবং ইহার প্রাণকেন্দ্রে এক স্বতন্ত্র, স্বপ্রতিষ্ঠ স্বপ্রকাশ স্বেচ্ছাময়, অনন্ত শক্তিমান্ চেতন পুরুষ বা চৈতন্যময়ী মহাশক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। ইহাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে তাঁরা আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। তাঁরা জড় জগতের সূক্ষ্ম গবেষণার ভিতর দিয়েই আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে উপনীত হয়েছেন, বিশ্বপ্রপঞ্চের বিশেষ বিশেষ তথ্য ও সত্যের রহস্য অনুধাবন করতে করতেই অখিল বিশ্বের মূলীভূত এক অসীম, অনন্ত চৈতন্যময় শক্তি-সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু এই চৈতন্যময়ী স্বতন্ত্র

মহাশক্তি তাঁদের বিচারমূলক পরোক্ষ জ্ঞানেরই বিষয় হয়েছেন ; কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা বা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা সম্ভব হয় নাই।

ভারতের মহাযোগিগণ—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত ও সর্ব্বানুস্যূত এই চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকে নিজেদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এবং পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে ধ্যান-যোগে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁর আত্মপ্রকাশ ও লীলাবিলাস আস্বাদন করেছেন, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেছেন ও ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন। ভারতের বেদ ও উপনিষৎ, আগম ও তন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস, কাব্য ও উপন্যাস এরূপ অসংখ্য তত্ত্বদর্শী মহাযোগীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দার্শনিক যুক্তিবিচারের অনুসন্ধেয় চরম তত্ত্বকে কেবলমাত্র ধ্যান ও সমাধি যোগে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন নাই, তাঁকে প্রেমভক্তিযোগে বাস্তব জীবনের ব্যবহার ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে, তাঁর সাথে একান্ত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধও অনুভব ও আস্বাদন করেছেন। বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব সেই চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাশক্তিময় পুরুষোত্তমকে তাঁরা সকল শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়-মনোবুদ্ধির সম্মুখে নিতান্ত আপনজনরূপে সমুপস্থাপিত করে, সারা ভারতের চিন্তাধারা, ভাবধারা, জীবনধারাকে জড়ের ও বহুত্বের মোহ থেকে উদ্ধার ক'রে উন্নত আধ্যাত্মিক স্তরে প্রবাহিত করেছেন।

জগতের মূলতত্ত্বকে তাঁরা শুধু "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"—রূপেই

দেখেন নাই—দেখান নাই। তাঁকে তাঁরা স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময় স্বামী, করুণাময় প্রভু, হৃদয়রঞ্জন পুত্র, হৃদয়নন্দিনী কন্যা, খেলার সাথী, রাজরাজেশ্বর, বিপদে রক্ষাকর্ত্তা প্রভৃতি নানারূপে দেখেছেন, নানাভাবে আস্বাদন করেছেন, এবং জনসমাজকে বিচিত্র-ভাবে তাঁর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করতে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই সব জ্ঞানী, ভক্ত, প্রেমিক, মহাযোগীদের সাধনা উপলব্ধি ও প্রচারের প্রভাবে, বিশ্বজগতের মূল কারণ সাধারণ সাধকদের পক্ষেও 'দূরাৎ সুদূরং' নহে। "তদু ইহ অন্তিকে চ।" সকলেই তাঁকে নিজেদের বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করতে অধিকারী।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।" চৈতন্যময় পরমদেবতার স্বরূপভূতা যে মহাশক্তি নিজেরই অনন্ত গুণদ্বারা—নিজেরেই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, বিচিত্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, বিচিত্র জ্ঞান, বল, ক্রিয়া, বিচিত্র লীলাবিলাস দ্বারা—স্বপ্রসূত অশেষবৈচিত্র্য-সমাকীর্ণ বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যে আপনার তাত্ত্বিক স্বরূপ চিরকাল নিজেই রহস্যাবৃত করে রেখেছেন, সেই মহাশক্তিকে তাঁরা (মহাযোগিগণ) ধ্যানযোগে অনুসন্ধানরত হয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন—ধ্যানযোগে চিত্তকে মলবিক্ষেপাবরণ মুক্ত করে তাঁরা নিজেদের অখণ্ড চেতনার মধ্যে সেই চৈতন্যময়ী মহাশক্তির পারমার্থিক স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা ও ইন্দ্রিয়ানুগত মন বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বজগতের যে পরিচয় লাভ করি, তাতে সেই "দেবাত্মশক্তির বিচিত্র গুণেরই পরিচয় প্রাপ্ত হই। সেই শক্তির খণ্ড খণ্ড আত্মপ্রকাশ ও

ক্রিয়াকলাপেরই জ্ঞান লাভ করি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত জ্ঞানের যতই সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা সম্পাদিত হোক, তাতে খণ্ড জ্ঞানই হয়ে থাকে, বিশেষ পরিচ্ছিন্ন বিষয়েরই জ্ঞান হয়ে থাকে। বিশ্বজগতের সমস্ত পরিচ্ছিন্ন, পরিণামশীল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মূল উৎস ও মূল কেন্দ্র যে নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয়া অখণ্ডা চিন্ময়ী মহাশক্তি, তাঁর পরিচয় লাভ সম্ভব হয় না। তার জন্য ধ্যানযোগে চেতনার অখণ্ডত্ব সম্পাদন করা ও তাকে মলবিক্ষেপাবরণ-মুক্ত করা আবশ্যক।

কঠোপনিষদের ঋষি যথার্থই বলেছেন যে, স্বয়ম্ভূ বিশ্ববিধাতা আমাদের সৃষ্টি করার সময় আমাদের জ্ঞানের দরজাগুলিকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) বহির্মুখ ক'রে নির্ম্মাণ করে আমাদের উপর যেন একটা কঠোর দণ্ডবিধান ক'রে রেখেছেন। তার ফলে সব সত্যের (জ্ঞেয় তত্ত্বের) শুধু বহিরাবরণ বা খণ্ডিত সোপাধিক আত্ম-প্রকাশই আমরা দেখে থাকি, কোন তত্ত্বেরই অন্তরাত্মার পরিচয় আমরা পাই না। ধীর ব্যক্তিগণ নিজেদের সাধনা দ্বারা আবৃতচক্ষু হ'য়ে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে অন্তর্ম্মুখ ক'রে প্রত্যাগাত্মার দর্শন লাভ করেন, নিজেদের ও সব জ্ঞেয় বিষয়ের তাত্ত্বিক স্বরূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির স্বাভাবিক বহির্ম্মুখীন বৃত্তিসমূহকে সুদৃঢ় সংকল্প দ্বারা সুসংযত ও নিরুদ্ধ ক'রে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত ক'রে সমগ্র চেতনার অখণ্ডতা অন্তর্ম্মুখীনতা ও আত্মসমাধানের সুনিয়ত অনুশীলনই ধ্যানযোগ। আমাদের চেতনা যখন খণ্ড খণ্ড বিষয়-বিলাসী সদাচঞ্চল ইন্দ্রিয় মনের

অধীনতা থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে স্বীয় নিরাবরণ অচঞ্চল অখণ্ডতায় স্থিতিলাভ করে, তখনই আত্মার স্বরূপ ও বিশ্বপ্রকৃতির তাত্ত্বিক স্বরূপ,—সব শক্তি পরিণামের মূল উৎস ও প্রাণকেন্দ্র—এই বিশুদ্ধ চেতনায় প্রতিফলিত হয়। তখন বস্তুতঃ এই চেতনা এবং চৈতন্যময়ী মহাশক্তি অভিন্নরূপেই অনুভবগোচর হয়। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্"—যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপরসাদির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে স্থিরভাবে অবস্থান করে, মনও বৃত্তিরহিত হ'য়ে নিশ্চলা স্থিতি লাভ করে এবং বুদ্ধিরও ভেদ-বিচারাদি কোন চেষ্টা থাকে না ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যখন দ্বন্দ্বরহিত হয়ে অখণ্ড চেতনায় পর্য্যবসিত হয়, তখনই মানবচেতনার পরমা গতি বা পরমা স্থিতি হয়—তখনই পূর্ণজ্ঞানে পূর্ণ-কল্যাণে পূর্ণ আনন্দে প্রতিষ্ঠালাভ হয়।

নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের চরম ও পরম কারণের অনুসন্ধানে পুরুষকার-সম্পন্ন সাধক যখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বহির্মুখী প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে তীব্র অনুরাগের সহিত নিবিড় ধ্যানযোগ অবলম্বনে আত্মচেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিশুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যের ভূমিতে অধিরূঢ় হয়, তখন সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিতই তার ঐকাত্ম্যানুভূতি হয় এবং নিজের আত্মার মধ্যেই সে বিশ্বজগতের অনন্তশক্তিময় পরম কারণের সাক্ষাৎকার লাভ করে। স্বীয় চেতনার অভেদ ভূমিতেই সে অশেষ বৈচিত্র্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতিরও অভেদভূমি আবিষ্কার করে। ধ্যানযোগের পরিপক্ক অবস্থায় সমাধিতে চৈতন্যময়ী আত্মা ও শক্তিময়ী প্রকৃতির ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়,—দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, চেতন ও জড় সর্ব্বতোভাবেই

একাকার হয়ে প্রকাশ পায়। সেই প্রজ্ঞালোকিত চেতনা যখন আবার প্রাপঞ্চিক ভেদভূমিতে অবতরণ করে, তখন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও তাদের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে বাহ্যিক বৈচিত্র্যের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ ঐক্যও অনুভব করতে থাকে। তখন ভেদের মধ্যেও অভেদ-দর্শন, বহুত্বের মধ্যেও একত্বদর্শন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের মধ্যেও আত্মদর্শন, প্রাকৃতিক নব কার্য্যকলাপের মধ্যেও আত্মাভিন্ন এক চৈতন্যময়ী মহাশক্তির দর্শন হয়।

ভারতের এক চিরস্মরণীয়া মহাযোগিনী নারী,—অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্‌দেবী, এইরূপে ধ্যানযোগে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঐকাত্ম্য অনুভব ক'রে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সেই অনুভূতির যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহাই ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্ত বা 'বাক্‌সূক্ত' নামে লিপিবদ্ধ হয়ে আজ পর্য্যন্তও তত্ত্বপিপাসু হিন্দুগণের নিত্যপাঠ্য হয়ে আছে। বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার শক্তির অভিব্যক্তি চলছে, সর্ব্বপ্রকার শক্তি-পরিণামরূপ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অধিষ্ঠাতৃ-রূপে সে সব দেবতা এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সব ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত কচ্ছেন, সকলের মধ্যে তিনি স্বীয় অনন্তশক্ত্যাধার আত্মারই প্রকাশ দেখেছেন। তিনি দেখেছেন ও ঘোষণা করেছেন যে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, সোম, ত্বষ্টা, পূষা, ভগ প্রভৃতি দেবতারূপে আমিই বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণ করি ও বিভিন্ন জাতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করি। এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যেখানে যে কোন শক্তির প্রকাশ,—বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেই হোক বা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রেই হোক—সর্ব্বত্র আমারই শক্তির খেলা। আমার স্বতন্ত্রা লীলাময়ী ইচ্ছাশক্তির বিলাসেই সারা জগতে সর্ব্ববিধ

ব্যাপার সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হচ্ছে। আমি বিশ্বাতীত, আবার বিশ্বের সর্ব্বত্রই আমারই মহিমা প্রকটিত, আমি বিশ্বরূপা।

বিশ্বের মূলীভূতা চৈতন্যময়ী পরমা শক্তির সহিত ঐকাত্ম্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আরো অনেক মহাযোগিনী বাগ্‌দেবীর মতই সারা বিশ্বের যাবতীয় শক্তির খেলা,—আপনারই আত্মার অভিব্যক্তি ব'লে অনুভব ও বর্ণন করেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—যাঁরা যোগযুক্তাত্মা, তাঁরা বিশ্বের সব পদার্থকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সব পদার্থের মধ্যে দর্শন ক'রে সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, সব ব্যাপারে সমরস আস্বাদন করেন। পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ এই মহাযোগের দৃষ্টিতেই বিশ্ববৈচিত্র্যের সর্ব্বত্র আপনারই অনন্ত বিভূতির পরিচয় দিয়েছেন এবং অর্জ্জুনের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত ক'রে আপনার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছেন। আমাদের চেতনা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হয়ে একাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, পরমাত্মাকেই অনন্ত শক্তির মূলাধার উপলব্ধি করে তৎসূত্রে নিজেকেও অনন্ত শক্তির আধার ব'লে অনুভব করে।

মূলতত্ত্ব—চৈতন্যময়ী মহাশক্তি

সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের যে মূল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকগণ পরোক্ষ-ভাবে অনুসন্ধান করেন, দার্শনিকগণ যুক্তিবিচার দ্বারা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেন এবং জ্ঞানী ভক্ত মহাযোগিগণ ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁকে মহাশক্তিময়ী চৈতন্যসত্তা বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে, চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাদেবীও বলা হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে ভেদ নাই। চৈতন্যকে শক্তিমান্ ব'লে শক্তির সহিত একটা অবান্তর ভেদ কল্পনা করে দার্শনিক বিচারের জটিলতা সৃষ্টি করা অনেক দর্শনাচার্য্য আবশ্যক বোধ করতে পারেন, এবং এই ভেদের মধ্যে তাঁদের নিত্যমিলনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁরা ঘর্ম্মাক্তকলেবর হয়ে থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি ও বস্তু—শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ অনেকটা নিরসন ক'রে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। বাস্তবিকপক্ষে শক্তি ও বস্তুর কোন ভেদ নাই। শক্তির ভিতরেই বস্তুর সব পরিচয়। শক্তির ঘনীভূত অবস্থার নামই বস্তু এবং বস্তুর ক্রিয়াহীন অবস্থার নাম শক্তি। বস্তুর তটস্থ লক্ষণ সব বাদ দিলে স্বরূপ লক্ষণ অর্থাৎ শক্তিহীন লক্ষণ শূন্যেই পর্য্যবসিত হয়। বস্তুর ভিতরে যখন স্বপ্রকাশ জ্ঞানশক্তি বা অনুভব শক্তির এবং স্বতন্ত্রা ক্রিয়াশক্তি বা আত্মপরিণামশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তখনই সেই শক্তিকে চৈতন্যশক্তি এবং তদাধার বস্তুকে চৈতন্যস্বরূপ বলা হয়ে থাকে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—ইহা চৈতন্যস্বরূপেরই বাস্তব লক্ষণ।

শক্তিপরিণামময় এই বিশ্বজগতের মূলকারণ বা মূলতত্ত্বকে অভিন্নশক্তি শক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলেও ধারণা করা চলে, কিংবা নিত্যা স্বতন্ত্রা আত্মপ্রকাশ-স্বভাবা চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাদেবী ব'লেও ধারণা করা চলে। পরমাত্মা বা ব্রহ্মই মহাশক্তি, মহাশক্তিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। বৈদিক ও বৈদান্তিক পরিভাষায় এই মূল তত্ত্বকে ব্রহ্মবস্তু বা পরমাত্মা বলে ধারণা, ধ্যান ও উপাসনা করাই সাধারণ নিয়ম, এবং তাঁর স্বরূপভূতা মহাশক্তিকে নিত্য তদাশ্রিতা ব'লে নির্দ্ধারণ করা হয়। আগমিক ও তান্ত্রিক ধারায় এই

একই অদ্বয় মূল তত্ত্বকে চৈতন্যব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি মহাদেবী মহামায়ারূপে ধারণা, ধ্যান ও উপাসনা করা সাধারণ বিধি। সেই মূল তত্ত্বকে বিশ্বজনক বলাও যে কথা, বিশ্বজননী বলাও সেই কথা, কারণ সেখানে লিঙ্গভেদের কোন প্রশ্নই নাই। লিঙ্গভেদ শুধু তৎপ্রসূত প্রাণিজগতে সমগ্র কার্য্যজগতের অভেদভূমি। মূলকারণের স্বরূপে কোন লিঙ্গভেদ অকল্পনীয়; পুরাণাদিতে ও উপাসক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে উভয় ধারারই মিলন হয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্বকেও তারা নানা-রূপে নানা নামে নানাভাবে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অগোচর ভূমি থেকে আমাদের অতি নিকটে হৃদয়ের সামনে নামিয়ে এনে উপস্থিত করেছে; মহাশক্তি সত্ত্বকেও তেমনি করেছে। দার্শনিক যুক্তিতেও তাদের উপাসনা আরাধনা পূজার্চ্চনা ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই।

সর্ব্বকারণ চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাশক্তিময়ী চৈতন্যসত্তার স্বরূপের মধ্যেই দুইটি ভাবের নিত্য যুগলমিলন—একটি আত্ম-সমাহিতভাব ও অপরটি বিচিত্ররূপে লীলায়িত ভাব। আত্মসমাহিত ভাবে তিনি নিত্যই "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বা পরমপুরুষ। লীলায়িতভাবে তিনিই নিত্য সগুণা সক্রিয়া সদাপরিণামিনী বিচিত্র-রূপ-রূপান্তরধারিণী বিচিত্রভাববিলাসিনী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিধাত্রী পরমা প্রকৃতি মহামায়া মহাদেবী। একটি তাঁর দেশকালাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, ভাবাতীত ভাব, আর একটি তাঁর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও ভাববিলাসের মধ্যে নিয়ত অভিবন্দ্যমান ভাব। "তদেজতি তন্নৈজতি"—দুইটি ভাবই তাঁর স্বরূপগত—নিত্যযুগলমূর্ত্তি।

সমস্ত জীব ও জগতের যিনি মূল কারণ, মূল তত্ত্ব, মূল অভেদভূমি, তিনি নিত্য নির্গুণ ও সগুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয় ও নিত্য সক্রিয়, নিত্য আত্মসমাহিত, নিত্য আত্মপরিণামী, নিত্য transcendent ও নিত্য dynamic. এই আপাতবিরোধী দ্বিবিধ ভাবের পরস্পরালিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মিলনই তাঁর যথার্থ স্বরূপ। তাই তিনি সব ভেদের অভেদ-ভূমি, সব দ্বৈতের অদ্বৈত ভূমি। সেই হেতু তত্ত্বদর্শী মহাযোগিগণ তাঁকে দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ ভাবাভাববিনির্মুক্ত প্রভৃতিরূপে বর্ণন করেন। যে সব সাধক জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানযোগে সম্যগ্‌ভাবে যোগযুক্তাত্মা হয়ে সেই পরম তত্ত্বের সহিত ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তাঁরাও অন্তরে বাহিরে তাঁর এই যুগলমূর্ত্তি দর্শন ও আস্বাদন করেন। তাঁরা নিজেরাও অন্তরে আত্মসমাহিত থেকেই বিশ্বজগতে এক অচিন্ত্য-শক্তিময় সচ্চিদানন্দঘন পরম তত্ত্বেরই বিচিত্র রূপ, ভাব, ক্রিয়া ও লীলাবিলাস সম্ভোগ করেন এবং নিজেকেও সেই সকলের ভিতরেই প্রতিফলিত দেখেন।

চৈতন্যময়ী মহাশক্তি যখন ইচ্ছাশূন্য, ক্রিয়াশূন্য, ভাববিলাস-শূন্য আত্মসমাহিত অবস্থায় বিরাজমান থাকেন, তখন বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপে বা নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপেই তাঁর অবস্থিতি হয়। তাঁর শক্তিভাব তখন বিশুদ্ধ চৈতন্যভাবের মধ্যে অন্তর্লীন। তাঁর অনন্ত মহিমার তখন কোন পরিচয় নাই। ক্রিয়ার মাধ্যমেই শক্তির আত্ম-পরিচয়। জ্ঞানবৃত্তিও ক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। যখন কোনরূপ ক্রিয়া না থাকে, তখন চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে জ্ঞানবৃত্তিও থাকে না। আর কতভাবে শক্তির যে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা তাঁর স্বরূপের মধ্যে নিহিত আছে, তার ত কোন পরিচয়ই মেলে না। তিনি যেন তখন নিজেকেও নিজে

জানেন না, তাঁর অনন্তরূপে আত্মাভিব্যক্তির সামর্থ্যের জ্ঞানও যেন তাঁর নাই। তিনি তখন স্বয়ংপূর্ণ বটেন ও সেই হেতু পরমানন্দস্বরূপে বিরাজমানও বটেন। কিন্তু তিনি অদ্বয়স্বরূপে অবস্থিত, তাঁর অনন্ত ভাব, অনন্ত সামর্থ্য, অনন্ত বীর্য্যৈশ্বর্য্য, অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য তাঁর আত্মসমাহিত স্বরূপে অভিন্নরূপে একীভূতরূপে অপ্রকাশিতরূপে বর্ত্তমান।

এই বিশ্বজগৎ দেখেই আমরা সেই অবিচিন্ত্যমহিমময়ী মহাশক্তির পরিচয় লাভ করি। এই নিয়ত পরিণামশীল বিশাল জগতে আমরা সেই মহাদেবীর অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তি, অপূর্ব্ব পালনী ও সামঞ্জস্যবিধায়িনী শক্তি ও তৎসঙ্গে অদ্ভুত সংহারিণী অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সকলের বিলয়কারিণী শক্তির পরিচয় পাই এবং তাঁকে বিশ্বজননী বিশ্বপালিনী ও বিশ্বসংহারিণী আখ্যা দিয়ে থাকি। অনাদি অনন্তকাল এই তিন ভাবে তাঁর অভিব্যক্তি দেখে তাঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র কিংবা ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী শক্তিরূপে বর্ণন করে থাকি। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের বিচিত্র শক্তি পরিণামের মধ্যে অনন্ত প্রকার ঐশ্বর্য্যের ও বীর্য্যের অনন্ত প্রকার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের, অনন্ত প্রকার জ্ঞান, প্রেম ও রস-বিলাসের পরিচয় পেয়ে তাঁকে আমরা অনন্ত বীর্য্যৈশ্বর্য্যময়ী, অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময়ী, অনন্ত জ্ঞানপ্রেমময়ী, অনন্ত রসবিলাসময়ী ভগবতী মহাদেবী বলে ধারণা ও উপাসনা করে থাকি। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর এই স্থূল জগৎই শুধু মহাশক্তিপ্রসূত বিশ্বজগৎ নয়। আরো কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম জগৎ আছে, জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো কত প্রাণজগৎ, মনোজগৎ, বুদ্ধিজগৎ আছে, কত ভাবময় জগৎ, রসময় জগৎ, ধর্ম্মময় জগৎ আছে। সকলের মধ্যেই সেই একই

অদ্বিতীয়া চৈতন্যময়ী মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ, সব জগতেরই তিনি অভেদভূমি ও নিত্য উৎস।

অনন্ত-রস-বিলাসিনী নিয়ত সৃষ্টি-পালন-ধ্বংস-কারিণী ভগবতী মহামায়া তাঁর এই বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশের মধ্যে অনন্ত ভাবের, অনন্ত রসের, অনন্ত ভাঙা-গড়ার খেলা নিত্যকাল খেলে চলেছেন, অথচ অন্তরে তিনি নিত্য আত্মসমাহিত। আত্মসমাহিত পরম শিবের বুকের উপর মহাকালীর বিচিত্র নৃত্য—এই চিত্রটী পরম তত্ত্বের এই স্বরূপটীকেই অদ্ভুতভাবে রূপায়িত করেছে। শিব সেই মহাশক্তিরই আত্মসমাহিত ভাব, তাঁতে নিত্য অধিষ্ঠিত থেকেই মহাশক্তি আপনাকে বিশ্বপ্রপঞ্চে অনন্তভাবে লীলায়িত কচ্ছেন। শিবের বক্ষ থেকে তাঁর চরণ কখনো স্খলিত হয় না, আত্মসমাহিত পরম ভাব থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হন না, অথচ তাঁর এই বিশ্বলীলায় তিনি অনবরত নেচে নেচেই চলেছেন, অবিরাম বিচিত্রভাবে নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে আপনাকে অভিব্যক্ত কচ্ছেন, অবিরাম অসংখ্য প্রকার জীব ও জড়ের —ভোক্তা ও ভোগের সৃষ্টি কচ্ছেন, তাদের সযত্নে পোষণ কচ্ছেন, আবার সংহার ক'রে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছেন। স্ব-স্বরূপে সমাধি ও বিচিত্র রূপে আত্মাভিব্যক্তি, ইহাই বিশ্বজননী মহাশক্তির নিত্য-স্বভাব। ইহাই পরব্রহ্মের ঐশ্বর যোগ—'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।'

এই বিচিত্র দ্বন্দ্বময় জগতে মনুষ্যোচিত বিচার বুদ্ধিতে আমরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, সুন্দর ও কুৎসিতের, শ্রেয় ও অশ্রেয়ের, উপাদেয় ও হেয়ের বিভাগ ক'রে থাকি। যদিও সবই সেই বিশ্বজননী শিবময়ী মহাশক্তিরই আত্মপ্রকাশ, তথাপি যাকে ধর্ম্ম, সুন্দর ও শ্রেয় বোধ

করি, তা আমাদের ঈপ্সিত, এবং যা কিছু অধর্ম্ম অসুন্দর অশ্রেয় বোধ করি, তা আমাদের অনীপ্সিত। মানুষের অন্তরে এই যে বিবেকবোধ, ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ, উচিতানুচিতবোধ, ইহাও মহাশক্তিরই এক বিশেষ খেলা। পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ প্রেমে, পূর্ণ যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বজননী মহাশক্তির সর্ব্বপ্রকার আত্মপ্রকাশ ও লীলা-বিলাসের মধ্যে আমরা 'সমরস' আস্বাদন করতে সমর্থ হই না, তাঁর সকল প্রকার রূপ রূপান্তর পরিগ্রহের মধ্যে তাঁর কল্যাণতম, সুন্দরতম, মাধুর্য্য-মণ্ডিত মুখখানি আমরা দেখতে পাই না। সেই হেতু আমরা তাঁর এক জাতীয় রূপের বা আত্মপ্রকাশের জয় বা প্রাদুর্ভাব প্রার্থনা করি, অপর জাতীয় রূপের বা আত্মপ্রকাশের পরাজয় বা সংকোচ কামনা করি। তাঁর দৈবভাবে আত্মপ্রকাশ আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাঁর আসুর ভাবে আত্মপ্রকাশ আমাদিগকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে। যদিও একই শিবাত্মভূতা মহাশক্তি মহাদেবী ও মহাসুরীরূপে তাঁর বিশ্বলীলায় আত্মপ্রকাশ কচ্ছেন,—যিনি দেবজননী, তিনিই অসুরজননী—তথাপি আমরা আমাদের জীবনাদর্শ অনুসারে তাঁকে দেবপক্ষপাতিনী ও অসুর-বিনাশিনী মূর্ত্তিতেই দেখতে সর্ব্বদা অভিলাষী।

যেখানে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, ভোগলালসা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, সেখানেই অধর্ম্ম ও আসুর ভাব; যেখানে অমানিত্ব অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জব, ত্যাগস্পৃহা, সেবাপ্রবৃত্তি, সেখানেই ধর্ম্ম ও দৈবভাব। চিরকাল এই সংসারে ভগবতী মহামায়া দ্বিবিধ ভাবেরই সৃষ্টি ও পোষণ কচ্ছেন এবং কখনো আসুরভাবকে বাড়িয়ে তোলেন ও দৈবভাবকে নির্য্যাতিত করেন, কখনো বা দৈবভাবকে

প্রবল করে আসুরভাবকে পরাভূত করেন—ইহাই দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের প্রাণ চায় আসুরভাবের বিনাশ ও দৈবভাবের অভ্যুদয়। আসুরভাবের বৃদ্ধিতে জগতে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি, অবিচার ও অত্যাচার প্রবল আকার ধারণ করে, ধর্ম্মের মর্যাদা নষ্ট হয়, পরম তত্ত্বের অনুসন্ধানের দিকে অনুরাগ থাকে না। সুতরাং কল্যাণপিপাসু, ধর্ম্মপিপাসু, শান্তিপিপাসু সাধকগণ সর্ব্বদা আসুরভাবের পরাভব ও দৈবভাবের প্রভাব-বৃদ্ধি আকাজ্ক্ষা করেন এবং বিশ্বজননী মহাশক্তিকে দৈবভাবের আনুকূল্য করার জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হন।

মানুষ বাস্তব জীবনে সাধারণতঃ ধর্ম্ম-অধর্ম্মের—দৈবভাব ও আসুরভাবের সাত্ত্বিক ও রাজস-তামস শক্তিসমূহের—নিয়ত সংঘর্ষের মধ্যেই বাস করে। বিবেকসম্পন্ন তত্ত্বপ্রধান মনুষ্যগণ এই সংঘর্ষে অতিষ্ঠ হয়ে বিশ্বজননী মহাশক্তিকে তাঁদের সম্মুখে অসুরমর্দ্দিনী, ধর্ম্মসংস্থাপিনী, বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী, নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহ-মূর্ত্তি-রূপে আবির্ভূত হবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করেন এবং এই মূর্ত্তিতেই হৃদয়মন্দিরে তাঁর পূজা করেন। আপনাদের পুরুষকার দ্বারা সামর্থ্যানুসারে সব আসুরিক ও তামসিক শক্তিসমূহকে বলি প্রদান করে নিজেদের ভিতরে দৈবশক্তিকে বলবতী করবার জন্যে তাঁরা প্রয়াসী হন। এই সাধনসংগ্রামে জয়ী হ'লে তাঁদের জীবনে সত্ত্বগুণ সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মন, বুদ্ধি, হৃদয় ক্রমশঃ উন্নততর আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরোহণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞানালোকিত হয়। সাধকের চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হ'লেই মহাশক্তির যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি অভিনব রূপলাবণ্য-সমন্বিত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-বীর্য্যৈশ্বর্য-সুশোভিত আকারে দৃষ্টিগোচর

হয়। তখন সাধকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় যে, এই অশেষ বৈচিত্র্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতির মস্তকোপরি (অর্থাৎ জীবনকেন্দ্রে) আত্মসমাহিত স্বয়ংপূর্ণ শিবসুন্দর স্বমহিমায় বিরাজমান, তাঁরই আত্মপ্রকাশরূপা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী মহাদেবী বিচিত্রায়ুধবিশিষ্ট (অনন্ত-শক্তিবিশিষ্ট) সহস্র ভুজ প্রসারিত ক'রে বিশ্বপ্রপঞ্চের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় পদার্থ সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং সৃষ্টিপালনসংহারাদি যাবতীয় ব্যাপার সংসাধিত করেন; তাঁর এই বিশ্বলীলায় যত পাশবিক ও আসুরিক শক্তি, যত রাজস ও তামস প্রকৃতি, যত ধর্ম্মবিরোধী সাম্যশৃঙ্খলা-বিপর্য্যয়কারী অশুভ প্রভাব তিনি প্রসব ও পোষণ করছেন, সব তাঁরই চরণতলে তাঁর খেলার পুতুল হয়ে তাঁরই বিধান অনুসারে তাঁরই প্রেরণায় ও তাঁরই শক্তিতে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন ক'রে তাঁর বিশ্বলীলার নানারূপ গৌরব ও শোভাই বর্দ্ধন করছে, দৈবী সম্পৎসমূহে তাঁর স্নেহপুষ্ট জ্ঞানবীর্য্যসৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট পুত্র-কন্যারূপে তাঁর কোলের কাছে বিশ্বপ্রপঞ্চে খেলা করছে; সারা বিশ্বজগৎ যেন আনন্দে নৃত্য করে চলেছে। বাংলার শারদীয় মহোৎসবে পূজিত আনন্দময়ী মা দুর্গার মহিমময়ী মূর্ত্তির মধ্যে এরূপ একটি তত্ত্বানুভূতির পরিচয় বিদ্যমান।

সাধক যতই জ্ঞান ভক্তি ও যোগের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন, তাঁর চিত্ত যতই মনোবিক্ষেপাবরণমুক্ত, শুদ্ধসত্ত্বময়, জ্ঞানভক্তি-প্রেমোজ্জ্বল হয়, ততই তাঁর দৃষ্টিতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য অধিক মাত্রায় প্রকটিত হ'তে থাকে। সব বীর্য্যৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক ব্যাপারগুলিও সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যেরই অঙ্গীভূত হয়ে আভরণরূপে প্রতিভাত হয় এবং এই বিশ্বজগতের

মূলীভূতা অনন্তবীর্য্যৈশ্বর্য্যময়ী মহাশক্তি তাঁর নিকট বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী, প্রেমানন্দময়ী, আত্মহ্লাদিনী, আত্মবিলাসিনী মহাশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। আগমনিগম পুরাণতন্ত্রাদিতে মহাশক্তির সর্ব্বস্তরের পরিচয় বিদ্যমান।

পরমভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্মার্থদর্শী শ্রীমান্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 'চণ্ডীচিন্তা' গ্রন্থে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের যে চমৎকার তত্ত্ববিশ্লেষণ করেছেন, তা' ভাষার লালিত্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, যুক্তির নৈপুণ্যে, অনুভূতির প্রগাঢ়তায়, সকলেরই হৃদয়াকর্ষক হবে নিঃসন্দেহ। তিনি শুধু আমাকে কিছু গৌরবদান করার জন্যই বোধ হয় তাঁর অমূল্য স্বল্পায়তন গ্রন্থখানির একটি ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছেন। অমানীকে মানদান বৈষ্ণবের ধর্ম। তিনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ও পরম প্রেমাস্পদ। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থেই নিজের অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমার চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত করলাম। ব্রহ্মচারিজীর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভক্তদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হবে, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কবির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস

[প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় (অতি সম্প্রতি স্বর্গত) তাঁর গড়িয়াস্থিত বাসভবন থেকে শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ভাগবত-গঙ্গোত্রী মহারাজকে যে পত্র দেন, তার নির্বাচিত অংশ।]

পরম পূজ্যপাদেষু,

সর্বপ্রথমেই আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি আপনার লেখা যে মহামূল্যবান্ বইগুলি পাঠিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে আপনার "পাঁচটি ভাষণ" পড়ে আমি যুগপৎ বিস্মিত, চমৎকৃত ও উপকৃত হয়েছি। আমাদের দেশের মনীষী ব্যক্তিরা শিক্ষা সম্পর্কে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'ডন' পত্রিকার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিষ্টার নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেরই গঠনমূলক প্রস্তাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদর্শের সমন্বয় ঘেঁষা। এঁদের মধ্যে ডন সোসাইটি ও ডন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতবর্ষের সুমহান্ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সেজন্যই এঁর প্রতিষ্ঠিত Anglo Vedic School ও ভগবতী চতুষ্পাঠীর শিক্ষাদর্শের মধ্যে কোনো আপোষ ছিল না। ভগবতী চতুষ্পাঠীর আচার্য্য ছিলেন মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি আমি একটানা দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ এই চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলাম। পণ্ডিত দুর্গাচরণ আমার শিক্ষাগুরু।

পাঁচটি ভাষণের মধ্যে আপনার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারটি ভাষণে আপনি যে অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য্য ও অনন্যসাধারণ তত্ত্ব-

বিশ্লেষণ করেছেন, সেই বৈপ্লবিক তত্ত্ববিশ্লেষণের ধারে কাছে পূর্বাচার্য্যরা যান নি। তাঁদের প্রত্যেকের লেখার মধ্যে সত্যের, কল্যাণের ও সৌন্দর্য্যের কথা কিছু কিছু থাকলেও তাঁরা সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্‌কে ছাত্র চরিত্র গঠনের ভিত্তি স্বরূপ মনে করেন নি। অথবা আপনি যেভাবে শ্রুতিসিদ্ধ চেতনায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক্ দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেভাবে তাঁরা কেউ সমস্ত বিষয়টিকে দেখেন নি। আপনার মত অধ্যাত্মবিজ্ঞানী মহাসাধকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এই ধরণের মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেওয়া। সচ্চিদানন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার দ্বারা বিরচিত এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে অনাদি-কালের সংযম ও শৃঙ্খলা নিত্যবিদ্যমান, আপনি সুকঠিন তপশ্চর্য্যার দ্বারা সেই ত্রিশক্তিকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই সচ্চিদানন্দ ও সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের এমন অমৃতোপম ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন।

'ব্যাপ্নোতি যঃ চরাচরম্' সেই বিষ্ণু আপনার আত্মজ্যোতির উৎস, হ্লাদিনী সন্ধিনী-সম্বিৎ আপনার উজ্জ্বলনীলমণিনিভ নিত্যশুদ্ধ হৃদয়ে প্রেমৈশ্বর্য্য,—আমার এই ব্যধিক্লিষ্ট দেহটাকে যে মুহূর্ত্তে আপনি আপনার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার শক্তিকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। পবিত্র হয়েছিল আমার দেহ মন! আপনার লেখা পাঁচটি ভাষণ পড়তে পড়তে বারবার আমার বুকের মধ্যে জাগছিল সেই অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ। কৈশোরে যখন আমার শিক্ষাগুরুর কাছে রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনতাম, তখন পণ্ডিতমশাই বলতেন, "শ্রোতব্যম্ মন্তব্যম্ নিদিধ্যাসিতব্যম্"—ছাত্রদের মস্তিষ্কের মধ্যে এই তিনটি প্রবিষ্ট না হলে তাদের মুক্তি নেই।

চারটি ভাষণ আধুনিক শিক্ষাজগতের মাতব্বরদের প্রত্যেককে পড়ানো দরকার। এগুলি ইংরাজীতে ও হিন্দিতে অনুবাদ করে সর্বাগ্রে

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। ভাষণগুলি বারবার পড়ছি এবং যে আমার কাছে আসছে তাকেই পড়ে শোনাচ্ছি। সবাই শুনে চমৎকৃত ও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ভাষণগুলির বহুল প্রচার দরকার। বস্তুবাদীদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে শুনে। জোর ক'রে অর্থাৎ গলার জোরে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়িয়ে দিতে চায় তারাও এই ভাষণগুলি পড়লে ঘাবড়ে যাবে। কোনো যুক্তি দিয়েই আপনার শিক্ষাতত্ত্ব খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

আপনার ভাষার মধ্যে যেন যাদু আছে, পদবিন্যাস মাত্রেই শ্রোতার হৃদয় হরণ করে। সাহিত্যিক হিসাবে আপনি চণ্ডীদাসের মতো সহজিয়া পন্থী। দর্শন বিজ্ঞানের মতো কঠিন বিষয়বস্তুকে আপনি ভাষার প্রাঞ্জলতায় সর্বজনবোধ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ "খাপছাড়া" বইখানা রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লেখেন,

"সহজ কথা কইতে নিতি কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।"

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চারশো বছর আগে চণ্ডীদাস লেখেন,

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ বুঝেছে কে,
তিমির আঁধার যে হয়েছে পার সহজ বুঝেছে সে।"

দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে সহজ হওয়া যায় না! আপনি ত্রিবিধ দুঃখবিজয়ী মহাপ্রেমিক। মহানামের তরী ভাসিয়ে প্রেম-যমুনার জোয়ার অতিক্রম করেছেন গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণকে বুকের মধ্যে রেখে! 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজম্ শ্যামসুন্দরম্' আপনার উপাস্য। বাল্যকাল থেকে এই রূপই আমাকে পাগল করে রেখেছে।

ইতি—

বিমলচন্দ্র ঘোষ

উৎসর্গ

চণ্ডীচিন্তায় মায়ের রূপ ভাবনার আবর্তে
ধ্যান জাগিল, মাতৃত্বের জীবন্ত দর্শন পেয়েছি কোথা মর্ত্যে।
অন্তরাকাশে ফুটিল দুইখানি দেবী-মার মূর্ত্তি,
দুই চিন্ময়ী প্রতিমা, প্রেম আর ভক্তি।
বন্ধুসুন্দরের অগ্রজা, দুইটি স্নেহরসের খনি,
দেবী দিগম্বরী, দেবী গোলোকমণি।
পুরে যোগমায়া, পুরীতে সুভদ্রা, পুরুষোত্তমের লীলায়।
দিগম্বরী আঙিনায়, গোলোকমণি পাবনায়, শ্রীহরিপুরুষের খেলায়।
একজন দেখিলেন তুলসী পরিক্রমায়
বৃন্দারাণীর বিম্ব জগৎসুন্দরের চরণে,
অপর দেখিলেন বস্ত্রাবরণ মুক্ত হওয়ায়,
ভৃগুপদলাঞ্ছন জগদ্বন্ধুর শ্রীবক্ষ মাঝে,
তবুও ভ্রাতৃবাৎসল্যে "মঙ্গলচণ্ডী" পূজিতেন তাঁর মাঙ্গল্যে
রামানুজের যেরূপ বলরাম সাজ,
আজ অনুজাদের সেরূপ অগ্রজার কাঁচ,
স্নেহধারা রাখিলেন যাহা ধরিয়া,
প্রাণ ভরিয়া, দিলেন উজাড় করিয়া,
বর্ষায় যেমন গিরিগাত্রে বারি বয়,
উদ্বেলিত বাৎসল্যধারা দু'জনার অন্তর-বাহিরময়।
সন্নিধানে যে আসিত ভাসিত মধুপ্লাবনে।
জীবাধম আমিও কত ভাসিয়াছি, তাই তো দিতে আসিয়াছি
এই ক্ষুদ্র ডালি তাঁদের উদার করে
নতজানু যুক্তকরে নিবেদন করুণ স্বরে
গ্রহণ করুন, আশিস ক'রে
সিক্ত করুন ভক্তিবরে।

স্নেহাভিভূত মহানামব্রত

—সূচীপত্র—

চণ্ডীচিন্তা

অর্জ্জুনের দুর্গাস্তব

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে দুর্যোধনের বিপুল সৈন্যসমাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের হিতের নিমিত্ত, 'হিতার্থায়' বলিলেন—"পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়" (মহাভাঃ ভীষ্মঃ-২৩।২)—শত্রুগণের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তব কর। রথ হইতে অবতরণ করিয়া অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া শ্রীশ্রীদুর্গাস্তুতি আরম্ভ করিলেন—

'অর্জ্জুন উবাচ'

অর্জ্জুন বলিলেন। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২৩।৪-১৬)

[১]

"নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি!।
কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে!॥"

"সিদ্ধসেনানি! হে আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! আপনাকে নমস্কার করি॥"

[২]

"ভদ্রকালি! নমস্তুভ্যং মহাকালি! নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তুভ্যং তারিণি! বরবর্ণিনি!॥"

"হে ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার, মহাকালি! আপনাকে নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার॥"

[৩]

"কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে!।
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে! ॥"

"কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে!, ময়ূরপুচ্ছের ধ্বজধারিণি! নানাভরণভূষিতে! আপনাকে নমস্কার ॥"

[৪]

"অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি!।
গোপেন্দ্রস্যানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে! ॥"

"মহাশূলাস্ত্রে! খড়্গ ও মুদ্গরধারিণি! কৃষ্ণানুজে! জগৎপ্রাচীনে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে! আপনাকে নমস্কার ॥"

[৫]

"মহিষাসৃক্‌প্রিয়ে! নিত্যং কৌশিকি! পীতবাসিনি!।
অট্টহাসে! কাকমুখি! নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে! ॥"

"সর্বদা মহিষরক্তপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবসনে! অট্টহাসে! কাকবদনে! রণপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার ॥"

[৬]

"উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি!।
হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! সুধূম্রাক্ষি! নমোঽস্তু তে! ॥"

"উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি! পীতনয়নে! বিরূপাক্ষি! অতিধূম্রনয়নে! আপনাকে নমস্কার ॥"

[৭]

"বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে! ব্রহ্মণ্যে! জাতবেদসি!।
জম্বু-কটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে! ॥"

"বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে! দেবহিতে! প্রাচীনস্থানে! সর্বদা জম্বু-দ্বীপস্থ দুর্গাদেবতালয়বাসিনি! আপনাকে নমস্কার॥"

[৮]

"ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি! দুর্গে! কান্তারবাসিনি!॥"

"কার্ত্তিকেয়জননি! ভগবতি! দুর্গে! মহারণ্যবাসিনি! আপনি বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাণিগণের মহানিদ্রা॥"

[৯]

"স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে॥"

"জ্ঞানীরা আপনাকে স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা গায়ত্রী এবং উপনিষৎ বলিয়া থাকেন॥"

[১০]

"স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে॥"

"মহাদেবি! আমি পবিত্র চিত্তে আপনার স্তব করিলাম। আপনার অনুগ্রহে সমরাঙ্গণে সর্ব্বদাই যেন আমার জয় হয়॥"

[১১]

"কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্॥"

"আপনি সর্ব্বদাই মহারণ্যে, ভয়স্থানে, দুর্গমদেশে, ভক্তগণের গৃহে এবং পাতালে বাস করেন, আর যুদ্ধে দানবদিগকে জয় করিয়া থাকেন॥"

[১২]

"ত্বং জৃম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥"

"আপনি রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, দীপ্তি, সাবিত্রী ও জগতের জননীস্বরূপা ॥"

[১৩]

"তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্দ্ধিনী।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥"

দেবি! আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্র ও সূর্য্যের উজ্জ্বলতাকারিণী দীপ্তি এবং সম্পন্নদিগের সম্পৎ। যোগিগণ ও পরিব্রাজকগণ ধ্যানে আপনাকেই দেখিয়া থাকেন ॥

অর্জ্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী "অন্তরিক্ষগতোবাচ"—আকাশমার্গে অবস্থান করিয়া বলিলেন—

"স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব!"

—হে পাণ্ডব! অচিরেই তুমি শত্রুগণকে জয় করিবে। এই কথা বলিয়া বরপ্রদা দেবী সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন—

"ইত্যেবমুক্‌্বা বরদা তত্রৈবান্তরধীয়ত।"

তন্ত্রবিজ্ঞান

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে দুইটি ধারা বিদ্যমান আছে, বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ ও উপনিষদ্। তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি অগণিত তন্ত্রগ্রন্থ। বৈদিক ধারার পূর্ণতা ভগবদ্গীতায়। তান্ত্রির ধারার চরম পরিণতি সপ্তশতী চণ্ডীতে।

বেদের অপর নাম নিগম, আর তন্ত্রের অপর নাম আগম। নিগম ও আগম শব্দ-দুইটির অর্থ একই, যাহা হইতে সকল জ্ঞান নির্গত হইয়াছে বা আসিয়াছে। উভয়ই নিখিল জ্ঞান ভাণ্ডার। ঋষির দৃষ্টিতে উভয়ই অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে। ঋষিগণের অনুভব এই যে, সত্য কখনও সৃষ্ট হইতে পারে না। যাহা কোন সময়ে সৃষ্ট, বা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অনিত্য ও অসত্য। যাহা সত্য তাহা চিরকালই বিদ্যমান, তাহার অভাব ত্রিকালে কখনও হয় না। শ্রীগীতাও একথা বলিয়াছেন :—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬)—অসতের বিদ্যমানতা নাই ও সদ্‌বস্তুর কখনও অভাব হয় না। সত্যের স্রষ্টা নাই, থাকিতে পারে না। সত্যের আছে দ্রষ্টা বা স্মর্ত্তা, সত্যের দর্শন হয়, সত্যের স্মরণ হয়, সত্য সৃষ্ট হয় না কখনও। যেহেতু তন্ত্র ও বেদ উভয়ই সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেই কারণেই তাহারা অপৌরুষেয়। অধিকাংশ তন্ত্রেরই শিব বক্তা এবং পার্ব্বতী শ্রোতা। আদি পিতা বলিতেছেন ও আদি মাতা শ্রবণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অপৌরুষেয় তত্ত্বই স্থাপিত হইয়াছে। যাহা অপৌরুষেয়, তাহার উৎপত্তিকাল বা বয়স নির্দ্ধারণের চেষ্টা অর্থহীন। বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বয়স নির্দ্ধারণের প্রভূত চেষ্টা

বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয়। আর্য্য-ঋষির দৃষ্টিতে ইহা নিরর্থক। গাছ হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে গাছের জন্ম। গাছ আগে না বীজ আগে এই প্রশ্নের যেমন সমাধান নাই, সত্যের স্রষ্টা কে বা কবে সৃষ্ট হইল তাহারও সেইরূপ সমাধান নাই।

জ্ঞান দ্বিবিধ—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের মধ্যে দুইটি বস্তু আছে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা এবং যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা জ্ঞেয়। দর্শনের কার্য্য জ্ঞাতার তত্ত্বানুসন্ধান। বিজ্ঞানের কার্য্য জ্ঞেয়বস্তুর তথ্যানুসন্ধান। আমি ফুলটি দেখিতেছি। 'আমি কে' —ইহা লইয়া গবেষণা দার্শনিকের কার্য্য। আর ফুলটির উপাদান কি, ইহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য।

দর্শন সংশ্লেষাত্মক (synthetic), আর বিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক (analytic)। দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ডের দিকে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি খণ্ডিত জগতের দিকে। দর্শন দেখে সামগ্রিকভাবে, বিজ্ঞান দেখে খণ্ড খণ্ড ভাবে। সমস্ত বাগানটি একসঙ্গে দেখা দার্শনিক দৃষ্টি, আর প্রত্যেকটি গাছ আলাদা করিয়া দেখা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচায়ক।

তান্ত্রিকগণ বৈজ্ঞানিক ভাব ও দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহাদের সাধনার ফলে ভারতে বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের দান যে কতদূর উন্নততর ছিল তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "History of Hindu Chemistry" ও মহামনীষী ব্রজেন শীল মহাশয়ের "Positive Science of Hindus" গ্রন্থদ্বয়ে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তন্ত্রশব্দের অর্থ যে কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ সুসমঞ্জস তথ্যনিরূপণ (systematic scientific study)। যেমন শল্যতন্ত্র বা Surgery হইতেছে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির

ব্যবহার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা। দেহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সুশ্রুতসংহিতার দান পাশ্চাত্ত্য দেশীয় অধুনাতম গ্রে সাহেবের Anatomy হইতে কোন অংশে হীন নহে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান এখনও তন্ত্রাচার্য্যগণের সূক্ষ্মদেহ-বিষয়ক গভীর বিশ্লেষণের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ইড়া পিঙ্গলা. সুষুম্না, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার প্রভৃতি তত্ত্ব এখনও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের স্বপ্নের অতীত।

ভূতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, খগোল বা আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তন্ত্রের বহু অবদান রহিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানের যে দান, উহারও মূল তন্ত্রশাস্ত্রই।

পরিবর্তনশীল যাহা তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রের বিচার্য্য। যাহা অপরিবর্তনীয় তাহা বেদবেদান্তের আলোচ্য। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল, সুতরাং জাগতিক বস্তুমাত্রই তন্ত্রের আলোচনার বিষয়। সাধারণ মানবের নিকট মল, মূত্র, থুৎকারাদি ঘৃণার বস্তু। কিন্তু একজন বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকের নিকট উহার মূল্য কম নয় কারণ উহা ব্যাধির বিষয়ে সত্যনিরূপণে সাহায্য করে। লিঙ্গ, যোনি ইত্যাদির আলোচনা সাধারণের কাছে অশ্লীল, কিন্তু তন্ত্রবিজ্ঞানীর নিকট উহা অমূল্য, কারণ উহা সৃষ্টিরহস্যের গভীর মূলদেশের সংবাদ দেয়।

দর্শনের আলোচনার বিষয় নিত্য শাশ্বত বস্তু। ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বস্তু দেশকালের সীমার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু এই দেশকালাতীত সত্তা কেমন করিয়া দেশকালের মধ্যে ধরা পড়িল ইহা দার্শনিকের ধ্যানের বিষয়। আর দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর মূল রহস্য অনুসন্ধানে

তন্ত্রবিজ্ঞানও দার্শনিক অনুধ্যানের নিকটবর্ত্তী। ইহা অত্যুক্তি হইবে না যে বেদান্তদর্শন জগদতীত তত্ত্ববস্তু লইয়া জগতের মধ্যে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করেন। আর তন্ত্রবিজ্ঞান জাগতিক বহু বস্তুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্বলাভের প্রয়াসী হন। কেবল অখণ্ড বা সামগ্রিক জ্ঞান পূর্ণ নহে, আবার কেবল খণ্ডের বা অংশের জ্ঞানও চরম নহে। জ্ঞান তখনই পূর্ণ হয় যখন উহা খণ্ড ও অখণ্ড উভয় প্রকার অনুভূতি দান করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টি ও তন্ত্রের বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গী এক পূর্ণ সত্যানুভূতির পক্ষে অপরিহার্য্য। একটি পাখীর ডানার মত যেন এক অখণ্ড সত্যের দুইটি দিক্। তন্ত্র ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক।

তন্ত্রবিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য তত্ত্ব সিদ্ধান্তকে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে রূপদান করা। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বহু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই প্রয়াস। বহুবিধ অনুষ্ঠানাদির আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্র পূর্ণ। সত্যকে জীবনের মধ্যে আনিতে হইলে অনুষ্ঠান চাই। কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরই ইহার সব কিছু নহে। চিত্তের আবেগ, অভীপ্সা, সহৃদয় আকূতি প্রভৃতি ভাবময় বস্তুও অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্লীন। তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য কেবল বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কতকগুলি হৃদয়াবেগ ও গভীর সংকেত ইহার সহিত যুক্ত আছে যাহা বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। ক্রোড়স্থিত শিশুর গণ্ডে স্নেহময়ী জননীর একটি চুম্বনের মাধুর্য্য যেমন মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের বিশ্লেষণ দ্বারা লাভ করা যায় না, তদ্রূপ ভক্তিপূতচিত্তে ইষ্টদেবের চরণে একটি সচন্দন পুষ্প নিবেদন কেবল উপচারগুলির বিশ্লেষণে পর্য্যাপ্ত হয় না। তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রাচীন কাল হইতে বেদের

দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করিতেছে। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞ ও পূজা উভয়ই অপরিহার্য্য। যজ্ঞ বেদের দান, আর পূজা তন্ত্রের। বেদ ও তন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

পাশ্চাত্ত্যদেশে বৈজ্ঞানিকগণ দার্শনিক আলোচনার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহারা সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে একত্র করিয়া ও বিজ্ঞানগুলিকে একত্র করিয়া একটি দার্শনিক দৃষ্টিলাভের প্রয়াসী (unity of the sciences)। প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, কারণ বর্ত্তমান বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্যদর্শনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। অধ্যাত্মদর্শনে বাইবেলের সিদ্ধান্ত, যেমন ছয় দিনে ভগবান্ এই বিশ্বরচনা করিয়াছেন; আদম ও ইভ আদি-মানবমানবী, ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে চায় না। কারণ বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে—এই বিশ্বসৃষ্টি হইতে বহু কোটি বর্ষ লাগিয়াছে; ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি অনুসারে (theory of evolution) বানর হইতে মানুষের জন্ম, আদম ও ইভ হইতে নহে ইত্যাদি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই অসামঞ্জস্য পাশ্চাত্ত্য দেশের সংস্কৃতিকে দুর্ব্বল করিতেছে। ইহাদের মিলনের একটা ভিত্তি রচনা চাই-ই চাই। তাহারই প্রয়াসের ফলস্বরূপ বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতা (philosophy of the scientists) প্রভৃতি আন্দোলন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে গড়িয়া উঠিতেছে। স্যর জেম্‌স্ জিন্‌স্ সাহেবের "The Mysterious Universe","The Universe Around Us",এডিংটন সাহেবের "The Nature of the Physical World" এবং আইনস্টাইন সাহেবের

God প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতার ফল বলা যায়। শুধু খণ্ডের আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সকল খণ্ড মিলিয়া কোন অখণ্ডের সংবাদ বহন করিয়া আনে কিনা, তাহা বুঝিবার প্রয়াসই এই বৈজ্ঞানিকের দার্শনিকতা।

ভারতীয় তন্ত্রবিজ্ঞান প্রাচীনকালে অনুরূপ কার্য্য করিয়াছে। প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক হইলেও, বস্তু-বিশ্লেষণে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকিলেও সব মিলিয়া একটা একত্বের বা অখণ্ড সত্তার সন্ধান মিলে কিনা তাহাই জানিবার চেষ্টা করিয়াছে তন্ত্রবিজ্ঞান। ফলে তন্ত্রের একটা নিজস্ব দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্ত্রদর্শন বেদান্তদর্শনের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। একের মধ্যে অপরে পূর্ণতার সন্ধান পাইয়াছে। ছোটখাট বিরোধ ও বিভেদ ঘটিলেও উহা জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয় নাই।

বেদান্তের সিদ্ধান্তের নাম ব্রহ্মবাদ, তন্ত্রের চরমতত্ত্ব শক্তি। এত-দুভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও পরিণামে ইহারা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছে। বেদ ও তন্ত্রের এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন জাতির জীবনে মহা গৌরবের দ্যোতক। পাশ্চাত্যদেশে যে বহুবিধ অশান্তি, যাহার প্রভাবে প্রাচ্যও আজ বিড়ম্বিত, তাহার বাহ্যিক কারণ যাহাই হউক পরমার্থিক কারণ দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মদর্শন দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর ও আত্মার তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বরহস্য তন্ন তন্ন করিয়াও জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোন সন্ধান পায় নাই। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বহির্ভূত উহাতে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন অবৈজ্ঞানিক ও

অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন আজ ম্রিয়মাণ। কিন্তু ভারতীয় ঋষি, বেদ ও তন্ত্রের, দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব মিলন ঘটাইয়া সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে অমৃতের সন্ধান দিয়াছেন উহা আজও অমর হইয়া আছে। যুগে যুগে শত সহস্র আঘাত ও বিপর্য্যয় হইতে ইহা জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করিয়াছে।

শক্তিবাদ

বাংলার বিশেষ সম্পদ্ শক্তির উপাসনা। গৌড়ীয়া বিদ্যা তন্ত্রের আর এক নাম। বর্ত্তমানে তন্ত্রবিষয়ে গবেষণা বা আলোচনা নাই বলিলেই হয়। আত্মভোলা বাঙালী জাতি নিজ সম্পদ্ সম্বন্ধে যদিও একেবারে উদাসীন, তাহা সত্ত্বেও তন্ত্রের সাধনার ধারা একেবারে মৃত নহে। আমাদের স্মরণকালের মধ্যেই রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তন্ত্রধারায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই সাধনাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের বিরাট দান। দার্শনিক দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের মত শক্তিবাদ একটা মতবাদ নহে। কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি তর্ক, বিচার ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষিত সত্য (**experimental truth**)। অনুভূতি দুই প্রকার—ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সার্বজনীন অনুভূতি। কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির

সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিচার, তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হয়। যাহা সার্বজনীন তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া উহা অখণ্ডনীয়। শক্তিবাদ অনুরূপ একটি অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত।

শক্তিবাদের প্রথম সিদ্ধান্ত—শক্তি আছে। ইহা সকলের অনুভববেদ্য। ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বর আছেন ইহা সাধারণের অনুভবের অতীত, যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থাপন করিতে হয়—তীক্ষ্ণতর যুক্তির দ্বারা আবার উহা খণ্ডিতও হইতে পারে। শক্তিবাদ সেরূপ নহে, ইহা অখণ্ডনীয়। শক্তি নাই বলিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। শক্তি অস্বীকার করিতেও শক্তির প্রয়োজন। শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে বুদ্ধিশক্তি, বিচারশক্তি, বাক্‌শক্তির দ্বারস্থ হইতে হইবে। ভগবান্ আছেন আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু শক্তি আছে ইহাতে আপত্তি করা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া যে বস্তুর আশ্রয় লইতে হইতেছে তাহাও শক্তি। অতএব উহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য।

শক্তি আছে, ইহা শক্তিবাদের চরম কথা নহে। শক্তিবাদের অন্তরের কথা, একমাত্র শক্তিই আছে, নিখিল বিশ্বে শক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুই শক্তির সমবায় (conglomeration of energy)। বস্তুমাত্রই শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এক একটি বস্তু, শক্তির এক এক ধরণের প্রকাশ। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—দেবী মহাশক্তি সর্বভূতে শক্তিরূপেই বিরাজিতা —ইহাই তন্ত্রের মহতী ঘোষণা। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সহিত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিউটন

সাহেবের সময় হইতে তিনশত বর্ষের জয়যাত্রার মধ্য দিয়া আজ বৈজ্ঞানিকেরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন উহা একান্তভাবে তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। পারমাণবিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে বস্তু (matter) সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই যে শক্তির সমবায় উহাতে এখন আর কাহারও সংশয় নাই।

শক্তিবাদের তৃতীয় কথা, সর্ব্বভূতে অর্থাৎ এই নিখিল বিশ্বচরাচরে একটি মাত্র শক্তিই আছে। বহু যে দেখি—তাপ (heat), আলো (light), বৈদ্যুতিক শক্তি (electricity)—উহা দৃষ্টির ভ্রমবশতঃই; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া দেখিলে সবই একই শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও পরমাণু (atom) জগতের মূল কারণ—বিজ্ঞানের এইরূপ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আজ এই মতের পরিবর্তন হইয়াছে। সকল বস্তুই যে এক শক্তির পরিণতি ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মূলে যে একটিমাত্র শক্তি বিদ্যমান, ইহা আজ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বহুকালের গবেষণার পর পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—বিশ্বের মূলে একই শক্তি কাজ করিতেছে, ইহা ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র বহু পূর্ব্বেই দ্বিধাহীনকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিকগণ আজ শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাদের শাক্ত আখ্যা দেওয়া যায় না। শক্তি মানিলেই শাক্ত হয় না, শক্তির পূজারী হওয়া চাই। ভারতবর্ষে শক্তির যেরূপ পূজা হয়, পাশ্চাত্ত্যদেশে তদ্রূপ হয় না। কারণ শক্তিবিষয়ে উভয় দেশের

দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য আছে। তন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এবার বৈসাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে, পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান কেন শক্তির পূজারী নয়।

বিশ্বের মূল শক্তি এক ও অদ্বিতীয়, এ বিষয়ে বিরোধ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই শক্তি জড় অর্থাৎ প্রাণ বা চৈতন্যবিহীন। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কখনও জড় নহে। ইহা সর্বতোভাবে চৈতন্যময়ী "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে"—সর্বভূতে চৈতন্যস্বরূপে বিরাজিতা দেবী মহাশক্তিই।

জড়বস্তু আকারে যতই বড় হউক সম্মানের দাবি করে না। সুবৃহৎ হিমালয় পর্বতের উপর হাটিয়া যাইতে কাহারও উদ্বেগ হয় না। কিন্তু চেতনসত্তাসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও তদ্রূপ উপেক্ষা করা যায় না। চেতনা মর্যাদার দাবি রাখে। চৈতন্যময়ী বলিয়া জানিলে পাশ্চাত্ত্যে শক্তিপূজার প্রবর্তন হইতেও পারে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আজ শক্তির কেবল স্বীকৃতিই হয় নাই, উহা চৈতন্যের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানী বিশ্বের মূল শক্তিকে মনঃসত্ত্বা (mind stuff) এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্যর জেম্‌স্ জিন্‌স্ সাহেবের মতে বিশ্বের মুল সত্তার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান অনুমিত হয়। নচেৎ এই বৈচিত্র্যময় বিরাট সৃষ্টি কখনও এত নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারিত না। তাঁহার মতে এই বিশ্বের কোথাও এতটুকু অঙ্কের ভুল দৃষ্ট হয় না। অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর করে। আর বিচারশক্তি চেতনার উপর নির্ভরশীল। মূলশক্তি অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন (mathematical) বলাতে, শক্তির

চৈতন্যসত্ত্বা একপ্রকার স্বীকার করাই হইল। ইহা ছাড়া পদার্থ-বিজ্ঞানের আরও তুই একটি রহস্যের কথা বলিতেছি।

বর্ত্তমান পদার্থ বিদ্যার (modern physics) একটি নীতি হইতেছে অনির্দ্দেশ্যবাদ (Law of Indeterminacy)। একটা সৌরজগৎ যেরূপ—মধ্যে সূর্য্য চারিপাশে ঘূর্ণায়মান গ্রহগণের অবস্থিতি—সেইরূপ একটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহের ন্যায় ইলেক্ট্রনগুলি ঘুরিতেছে। সৌরমণ্ডল পরমাণুমণ্ডলের পার্থক্য এই যে, সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া সূর্য্যকে পরিক্রমা করে। কিন্তু পরমাণুমণ্ডলের মধ্যে ইলেকট্রনগুলি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের কক্ষ পরিত্যাগ করে। এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে চলিয়া যায়। চলার ভঙ্গি দৌড় নহে, লম্ফন (jump)। লম্ফনের মধ্যে বৈচিত্র্য এই যে, এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময় মাঝখানে কোথাও থামে না। কখন কোন্ ইলেক্ট্রন এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবে এবং কি তাহার গতিবেগ (velocity), তাহা নির্দ্ধারণের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাহার স্থিতিস্থান (position) ও গতিবেগ (velocity) এই তুইয়ের একই কালে শুদ্ধ নির্দ্ধারণ কিছুতেই সম্ভব নয়। কোন মুহূর্ত্তে ইলেকট্রনের স্থিতি নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইলেও তাহার গতি জানা যায় না। আবার ইলেক্ট্রনের গতি নিশ্চিতরূপে জানিলেও সেই মুহূর্ত্তে তাহার স্থিতি নির্ভুলভাবে জানা যায় না। ইহাই হাইসেনবার্গ সাহেবের অনির্দ্দেশ্যবাদ। ইহাতে ইলেক্ট্রনের স্বাধীনতা অনুমিত হয়।

১৯ ৭ সালে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন সাহেব ইউরেনিয়ম, রেডিয়ম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ত

(spontaneous) বিস্ফোরণ ইত্যাদি হইতে প্রমাণিত করিলেন যে বিজলিবাতির তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর ইলেকট্রন তেজ ও উত্তাপের তাড়না ও প্রভাব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কক্ষত্যাগ করিয়া যায়।

ইলেকট্রনের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া এডিংটন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুর আভ্যন্তরিক শক্তির মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব অনুমান করেন। কারণ চেতনা ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা সম্ভব নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে উন্নত বিজ্ঞান, চেতনার স্বীকৃতির সীমানায় পৌঁছিয়াছে। শক্তি যে চেতনাসম্পন্ন ইহা আজ বিজ্ঞানের অনুমিতি। পরীক্ষায় নিরীক্ষায় অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে শক্তি যে চেতনাময়ী ইহা তন্ত্রাচার্য্যগণের অনুমিতি নহে, অনুভূতি বটে। গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া সত্য নহে - তপস্যা দ্বারা উপলব্ধ সত্য।

তবে জড়বস্তুর মাধ্যমে চেতনার অনুসন্ধান দ্বারা চৈতন্যময়ী মহাশক্তির তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন কখনও সম্ভব হইবে না। চেতনার মূর্ত-বিগ্রহস্বরূপিণী শক্তিকে জানিতে হইলে আত্মস্থ হওয়া দরকার। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেইরূপ প্রচেষ্টাও লক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

তন্ত্রের মহাশক্তি এক, অদ্বিতীয়া ও চৈতন্যরূপিণী। ইহাই চরম কথা নহে। চৈতন্যময়ী দেবীর স্বরূপে অসীম করুণা নিহিত আছে। করুণারূপ মহাসম্পদের খবর তাঁহার কৃপাতেই কেবল জানা যায়। বাহ্য আচরণের কাঠিন্যের মধ্যেও মহাকরুণাই লুক্কায়িত আছে "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা"। যুদ্ধে অসুর-নিধনরূপ কার্য দ্বারা তাঁহার অপরিসীম করুণার পরিমাপ করা যায় না। করুণার স্বরূপ প্রকাশ

করাও একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তন্ত্রবিজ্ঞান বলিয়াছেন—ইনি মাতৃরূপা। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র এই মাতৃত্ব বিদ্যমান।—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" বিশ্বের সকল মাতৃহৃদয়ের স্নেহকরুণা একত্র করিলেও দেবী মহামায়ার মাতৃত্বের সমান হয় না।

সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই যে, আমাদের সূর্য্য হইতে বৃহত্তর এক সূর্য্য কোন্ অজানা কারণে ইহার নিকট দিয়া বেগে চলিয়া যায়। সেই বৃহত্তর সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সূর্য্যের অঙ্গহানি ঘটে। নয়টি অংশ ছুটিয়া বাহির হয় ইহার দেহ হইতে। কিন্তু এই অংশ বা গ্রহগুলি একেবারে হারাইয়া যায় নাই। সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া ইহারা সূর্য্যকেই পরিক্রমা করিতেছে। সূর্য্য যেমন গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, হারাইয়া যাইতে দেয় নাই, এই বিশ্বও মহামায়া হইতে আসিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে স্থিত আছে। আমরা না বুঝিলেও মাতৃবৎ করুণা যে আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে ও ধ্বংস হইতে দেয় নাই, ইহা তন্ত্রের কল্যাণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ করুণা দেখা যায় না, হৃদয়বৃত্তির সম্প্রসারণে তার অনুভবই হয়। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মাথা আছে, হৃদয় নাই। তন্ত্রবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়াবেগ যুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু জড়বিজ্ঞান যাহা দেখিতে অসমর্থ, তাহা তন্ত্র-বিজ্ঞান দেখিতে পাইয়াছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি জড়, তাই উহাকে সংহত বা অধীন (control) করিয়া মানবের সুখসুবিধার্থে নিয়োগ করা বৈজ্ঞানিকের চেষ্টা। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞান শক্তির চৈতন্যস্বরূপে বিশ্বাসী বলিয়া, শক্তিকে অধীন করিয়া নিজ সুখবিধানার্থে প্রয়োগের পক্ষপাতী নহে।

২

চেতনবস্তু অধীন হইতে চাহে না। তাহাকে অধীন (control) করিতে চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয় না। একটি বালকও যদি বুঝিতে পারে যে তাহাকে অধীন করিয়া যথেচ্ছ চালিত করিবার কেহ চেষ্টা করিতেছে, সে তখন আর উহা অম্লানবদনে মানিয়া লয় না। তন্ত্রমতে বিশ্বের মূল যে শক্তি, যাহা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, তাহাকে অধীন করিয়া ভোগ করিতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। সেই শক্তিরূপা দেবীকে জানিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পূজা করিলে, তাঁহার কৃপাতেই বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়।

চণ্ডীগ্রন্থে উক্ত আছে, রূপলাবণ্যবতী মাতৃদেবীর মহাশক্তির কথা শুনিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ তাঁহাকে বিবাহ অর্থাৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে পরিণামে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শক্তি ভোগের বস্তু নহে। তিনি মাতৃরূপা ও বিশ্বের সকল দেব ও মানবের পূজ্যা। মায়ের আরাধনাতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির দ্বারা সাধক শান্তির অধিকারী হন। পক্ষান্তরে সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ হইলে, ও শক্তিরূপিণী মাকে ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে, ফল শুভ হয় না। তন্ত্রমতে ইহা আসুরিক প্রয়াস। রাবণ দেবশক্তিকে জয় করিয়া উহা নিজ সুখভোগে নিয়োজিত করেন। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ রাবণের আজ্ঞাবহ দাসের মত সেবা করিতেন। কিন্তু আড়ালে তাঁহারা রাবণের বিনাশের জন্য সর্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অভিলাষ পূরণ করেন। মানব-সভ্যতা যখন কেবল ভোগোপকরণের সমৃদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখপরায়ণ হইয়া উঠে এবং আধ্যাত্মিক নীতি ও মানবতার শ্রেষ্ঠ অবদানসকল পদদলিত করিয়া চলে, তখন সেই আসুরিক সভ্যতা যে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না।

পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার ধ্বংসের রূপ ও মানবের ধ্বংসমূলক কার্য্যে উহার নিয়োগ ও প্রস্তুতির প্রয়াস দেখিয়া সারা বিশ্বে আজ ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে। নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সমুন্নত ও মানবের কল্যাণকামী কোন বিশ্বমানব-সংস্থার (World board) উপর এই পারমাণবিক শক্তির পরিচালনার ভার ন্যস্ত না হইলে মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। তন্ত্রবিজ্ঞানের এই অভিমত।

মহাশক্তির সহিত যুক্ত হইলেই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। যুক্ততা নষ্ট হইলে আসে দুঃখ ও অশান্তি। জীবনে দুঃখ আসিলে বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-জীবন মায়ের নিকট হইতে বিযুক্ত,, শক্তিহীন হইয়াছে। তন্ত্রমতে মহাশক্তির সহিত যোগসূত্র স্থাপনের উপায় পূজা। পূজার তত্ত্ব পরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

দেবীসূক্ত

বৈদিক ও তান্ত্রিক দ্বিবিধ চিন্তাপ্রবাহের কথা প্রারম্ভেই বলিয়াছি। এই দুইটি ধারার মিলন-সূত্র হইল দেবীসূক্ত। শ্রীচণ্ডী পাঠের প্রথমেই দেবীসূক্ত পাঠের বিধি। এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য এই সূক্তটি জপ করিয়া মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। "স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।" (চণ্ডী ১৩।১০)

এই বৈদিক সূক্তটির জপদ্বারা তন্ত্র-প্রতিপাদ্য মহাশক্তির অর্চ্চনা ও

সাক্ষাৎকার হইল। এই জন্য এই সূক্ত, দুইটি ধারার মিলনীসূত্র বলা হইয়াছে।

বৈদিকমন্ত্র ত্রিবিধ, পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক। দেবী-সূক্তের মন্ত্রগুলি আধ্যাত্মিক। ঋষি এখানে নিজেই নিজের স্তুতি করিতেছেন। দ্রষ্টী ঋষি হইলেন অম্ভৃণ-কন্যা ব্রহ্মা-বিদুষী বাক্। দেবতা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। ঋষির নামানুসারে এই সূক্তটিকে বাক্সূক্তও বলা হয়। আত্মস্তুতি বলিয়া সূক্তটি আধ্যাত্মিক।

এই মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে অনুভব হইবে যে তন্ত্রশাস্ত্রে যে মহাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ঋষি-কন্যাকে যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাধ্যমে স্বকীয় পরম-স্বরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থে প্রবেশ করিবার জন্য এই সূক্ত তোরণস্বরূপ। যে সকল তত্ত্ব চণ্ডীগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় তৎসমুদয় বীজাকারে এই দেবীসূক্তে বিরাজমান।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন যে, এই দেবীসূক্তে বাগ্‌দেবী নিজে পরমাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন এবং সেই পরমাত্মার (নিজেরই) স্তুতি করিতেছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার স্তুতিতে তন্ত্র-প্রতিপাদ্য পরাশক্তি স্তুত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে পরমাত্মা ও পরাশক্তি অভিন্নবস্তু। দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা যে একই মহাসত্যের পরিচয়, ইহা দেবীসূক্ত প্রতিপন্ন করিতেছে।

দেবীসূক্তে আটটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটি এই, —

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥

আমি রুদ্র ও বসুরূপে বিচরণ করি। আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব-রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্রাবরুণ (মিত্র ও বরুণ), ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

এই মন্ত্রে রুদ্র ও বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেব, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারযুগল, এই অষ্ট বৈদিক দেবতার কথা বলা আছে।

রুদ্র একাত্মাভিমুখী শক্তি—বসু বহুত্বাভিমুখী শক্তি। আমি রুদ্র, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আমি একত্বের দিকে লইয়া যাই, সকল বহুত্বের বিলোপ সাধন করিয়া। আমি বসু বহুত্ব-প্রকাশক শক্তিরূপে আমি নানা বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎ ব্যক্ত করি।

আদিত্য একত্বের ধারক, বিশ্বদেব বহুত্বের ধারক। ব্যক্ত বহুত্বকে আমি আদিত্যরূপে একক স্বরূপে ধারণ করি। আমি বিশ্বদেব, বহু হইয়াও প্রত্যেকটি বস্তুতে পূর্ণরূপে বিরাজ করি।

মিত্র ও বরুণ, নীতি ও শৃঙ্খলার দেবতা। মিত্র বহির্জগতের শৃঙ্খলাকারী, বরুণ অন্তর্জগতের শৃঙ্খলাকারক। আমি মিত্র ও বরুণরূপে বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের শৃঙ্খলা সাধন করি। জড় ও চিৎ জগৎ আমার শক্তিতেই সুনিয়ন্ত্রিত আছে।

যে শক্তি বিরাজিত বা স্থিত আছে তাহা ইন্দ্র। যে শক্তি গতিমান্ হইয়া কার্য্য সাধন করে তাহা অগ্নি। আমি স্থিতিমান্ ও গতিমান্ (static & dynamic) উভয়বিধ শক্তিরূপে বিদ্যমান। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সূর্য্যমার্গ ও চন্দ্রমার্গের বিধানকর্ত্তা। তাঁহারা দিবা ও রাত্রি-স্বরূপ, ঈড়া ও পিঙ্গলাস্বরূপ। জগতের আলো অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, শুভ-শুভ আমার শক্তিতেই বিধৃত।

চণ্ডীতেও দেবী বলিয়াছেন, "অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা"

(১০।৮),. অর্থাৎ আমি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বহু মূর্ত্তিতে অবস্থান করি। এই তত্ত্ব, গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগে বিশেষভাবেই কথিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুন এক স্থানে সকল দেবতা দর্শন করিয়াছেন। একই মহাশক্তি বহু দৈবশক্তিরূপে জগতে ক্রিয়াশীলা। দেবীসূক্তের প্রথম মন্ত্র এই সংবাদই বহন করিতেছে। দ্বিতীয় মন্ত্র এই—

অহং সোমমাহনসং বিভর্মি
অহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২॥

আমি শত্রুনাশক সোমকে ধরিয়া আছি, আমি ত্বষ্টা, পূষা ও ভগদেবকে ধারণ করি। যে যজমানের প্রচুর হবি আছে ও যাহা তিনি দেবোদ্দেশে অর্পণ করেন ও যিনি বিধিমত সোমাভিষেক করেন, তাঁহাকে আমি যজ্ঞের ফল দান করি।

জীব ও জগতের মধ্যে নিরন্তর একটী ক্ষয় লাগিয়া আছে। এই ক্ষয়রূপ শত্রু হইতে রক্ষা করিয়া যে শক্তি সর্ব্বদা পুষ্টি বিধান করেন তিনি সোম। চিজ্জগতের পোষণকারী সোম, জড়জগতের পোষক পূষা। প্রত্যেক ছোট বড় বস্তুকে যিনি তৎ তৎ রূপ দান করেন তিনি ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা। ভগদেব জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি সাধককে সাধনার যোগ্যফল প্রদান করেন।

এই সংসারে কাহারও হয়ত সম্পদ্ আছে, দাতৃত্ব নাই। কাহারও বা দানশীলতা স্বভাব, কিন্তু তিনি দরিদ্র। যাহার আছেও প্রচুর এবং জগৎ-কল্যাণে দানও করেন প্রচুর, তাঁহারই সার্থক জন্ম। সেইরূপ, যে-

যজমান নিত্য বিধিমত ওজঃশক্তি সাধনা করেন তাঁহাকে আমি তাঁহার প্রয়োজন অনুরূপ সম্পদ্ দান করি। যজমান যদি ভোগার্থী হয় তাহাকে ভোগ দেই। যদি স্বর্গার্থী হয় স্বর্গ দেই, যদি মোক্ষার্থী হয় তবে মোক্ষই প্রদান করিয়া থাকি। চণ্ডীগ্রন্থেও বলা হইয়াছে—

"আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥" ১১।৫

এই দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইল যে, সেই মহাশক্তি কল্যাণময়ী মাতার মত সন্তানকে ক্ষয় হইতে রক্ষা করিয়া পোষণ করেন। তিনি সকল বস্তুকে রূপদান করেন ও যোগ্য সাধককে যথাযোগ্য ফল দান করেন। এক তিনি বহু রূপ ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারে নিজেকেই নিজে পোষণ করেন।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রে বলা যাইতেছে—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥

আমি রাষ্ট্রী, রাষ্ট্রের অধীশ্বরী। রাজ্যরক্ষার্থ যে সম্পদের প্রয়োজন, আমি তাহার বিধানকর্ত্রী। সংসারে শান্তিলাভের জন্য যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজন, আমি তাহাই জানি (চিকিতুষী)। আমি এক হইয়াও বহুরূপা। সর্বজীবে আমি বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। দৈবী সম্পৎশালী দেবতাগণ যাহা সাধন করেন সকলই আমার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়।

"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।"

আকাশ হইতে পতিত বর্ষাধারা যেমন শেষ পর্যন্ত সকলই সাগরে গমন করে, সেইরূপে সকল দেবতার অর্চ্চনাই এক পরম দেবতায়

পর্য্যবসিত হয়। গীতাতেও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত যে দেবতার অর্চ্চনাই করুক, আমারই পূজা হয়। তবে সকলই একই পরমস্বরূপের প্রকাশ, ইহা জানিলে অর্চনা যথাবিধি-হয় – না জানিলে অবিধিপূর্বক হয়।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইল যে, একই মহাশক্তি রাষ্ট্রশক্তিরূপে, ধনদাত্রী-রূপে ও ব্রহ্মজ্ঞানরূপে বিরাজমানা। বহুরূপে তিনি প্রকাশমানা। এই তত্ত্ব জানিয়া যেখানেই মস্তক অবনত করি, তাঁহার সমীপেই পৌঁছানো যায়। চতুর্থ মন্ত্র—

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥

যে অন্নাহার করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে বাক্য শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি আমাদ্বারাই ঐ সকল কর্ম সাধন করিয়া থাকে। আমার ঈদৃশ স্বরূপতত্ত্ব যাহারা জানে না তাহারা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। শোন হে যশস্বী বন্ধু! বহু সাধনালব্ধ যে বার্ত্তা তাহা তোমাকে বলিতেছি।

মনুষ্যদেহে যে সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় তাহা সকলই এক মহা-শক্তির কার্য্য। দেখাশুনা, আহার, প্রাণরক্ষা, যাবতীয় কার্য্যই একটি মহাশক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। চণ্ডীতেও বলা হইয়াছে তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি (ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ৫।৭৭)। দেহেন্দ্রিয়ের সকল শক্তির মূলাধাররূপে তাঁহাকে যাহারা জানে না, তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাহারা জানেন তাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হন।

হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা থাকিলে এই তত্ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলা হইতেছে, ইহা নিবিষ্টভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইল যে, কেবল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যই যে তিনি করিতেছেন তাহা নহে; তোমার-আমার ক্ষুদ্র এই দেহভাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার সেই একই মহাশক্তি দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চালক ও আমার ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক যে একই মহাশক্তি, ইহা যিনি জানেন না তিনি দিনের পর দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইহা জানাই কর্ত্তব্য।

পঞ্চম মন্ত্র—

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥

আমিই নিজে সেই কথা বলিতেছি, যাহা দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলে জানিবার জন্য যত্নপরায়ণ। যে যেমন কামনা করে তাহাকে তেমনটি আমিই করিয়া থাকি। ব্রহ্মাও আমি করি, ঋষিও আমি করি, জ্ঞানীও আমারই সৃষ্টি।

যে জ্ঞান লাভ না হইলে শান্তিলাভের উপায় নাই সেই জ্ঞান লাভের জন্য দেবতা ও মনুষ্য সকলেই সর্ব্বদা চেষ্টারত। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে সকলেই ব্রহ্মানুসন্ধান করে। সাধনফলে তাহারা আমাকে জানে। জানিয়া আমার কথা বলে। আজ আমার স্বরূপকথা আমি নিজেই বলিতেছি। ইহা আমার সাধনালব্ধ কথা নয়—আমার নিজস্ব স্বরূপ কথা। সুতরাং মনঃসংযোগ-সহকারে শ্রবণ করা উচিত।

যে যেরূপ কামনা করে সে সেরূপ ফল লাভ করে। কামনা বলিতে শুধু ইচ্ছা নহে, ইচ্ছার সহিত প্রযত্ন বুঝাইবে—Wish নহে, will ; যে যাহা পাইবার জন্য সাধনশীল, সে যে তাহা পায়—ইহা কেবল সাধনার ফল নয়, আমি কৃপা করিয়া দেই বলিয়া পায়। চেষ্টা করিবার ইচ্ছা ও শক্তিও আমি দেই, আবার ফলও আমিই দেই। সুতরাং আমিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহাকে যাহা করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাই করি। ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ঋষির ঋষিত্ব, মেধাবীর মেধা, সকলই আমার কল্যাণী ইচ্ছার ফল।

পঞ্চম মন্ত্রে বলিলেন, জীবনের যাহা কিছু লভ্য সকলই মহাশক্তির প্রসাদে হইয়া থাকে। চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে—"সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না" (৪।৫)। মা প্রসন্না হইলে সকল প্রকার অভ্যুদয় দান করেন। সেই মহাশক্তির কাছে আত্ম-নিবেদনেই জীবের কল্যাণ। তাঁহার মহতী ইচ্ছার সঙ্গে ক্ষুদ্র ইচ্ছা মিলাইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি মানুষের কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ মন্ত্র—

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোমি
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

আমি রুদ্রের ধনুক জ্যা-যুক্ত করিয়া বিস্তার করি, যাহারা ব্রহ্মদ্বেষী তাহাদের নাশের জন্য। সজ্জনের রক্ষার্থ আমি যুদ্ধ করি। স্বর্গে মর্ত্তে সর্ব্বত্র আমি সংপ্রবিষ্ট হইয়া আছি।

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করে তাহাদের পথের

যাবতীয় বাধা আমি দূর করিয়া দেই। লয়কারী রুদ্রের ধনুকে জ্যা আরোপ করিয়া আমি সাধকের সাধনপথের অশেষ অনর্থ অপনোদন করি। যাহারা সাধক তাহাদের কল্যাণ করাই আমার ব্রত। এই মহাকল্যাণ শক্তিরূপে আমি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমানা আছি।

ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইল যে, মহামঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপে তিনি সর্ব্বত্র আছেন। ভক্ত তাঁহার দিকে যাত্রা করিলে পথের সকল বাধা তিনি দূর করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন। সুর-বিরোধী আসুরিক-শক্তি দমনে তিনি সর্ব্বদাই রত।

সপ্তম মন্ত্র—

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা
উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বোপরি যে জগতের পিতা তাঁহাকেও আমি প্রসব করিয়াছি; পরম জ্ঞান-সমুদ্রের অভ্যন্তরে আমার যোনিস্থান। সর্ব্বভুবনে আমি অনুপ্রবিষ্ট। ভূলোকের উর্দ্ধে যে দ্যুলোক আছে, তাহাও স্থির আছে আমি স্পর্শ করিয়া আছি বলিয়া।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে প্রাধানিক রহস্য প্রকরণে উক্ত আছে—মহালক্ষ্মী হইতে ব্রহ্মা ও শ্রী, মহাকালী হইতে রুদ্র ও ত্রয়ী এবং মহাসরস্বতী হইতে বিষ্ণু ও গৌরী উৎপন্না হইয়াছেন। পরে মহাশক্তি ব্রহ্মাকে ত্রয়ী, রুদ্রকে গৌরী ও বিষ্ণুকে শ্রী, পত্নীরূপে অর্পণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ত্রয়ীং।
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্ ॥

এই সিদ্ধান্তে, প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবও মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন। তাই দেবীসূক্ত বলিতেছেন, জগতের যে পিতা তাঁহাকেও আমি প্রসব করিয়াছি।

মায়ের যেটি জননস্থান, মূল গৌরীপীঠ, সেটি কোথায় তাই বলিতেছেন, "অপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে", জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরে গূঢ়ভাবে নিহিত। উপনিষদ্ তাহাকে গূঢ়াত্মা বলিয়াছেন।

সেই গূঢ়বস্তুকে স্থূল বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় না। কঠোপনিষদের মন্ত্রে আছে—

"দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।" ৩।১২ ।।

সূক্ষ্মদর্শী অতি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মবুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন। সেই গূঢ় যোনিস্থান হইতে অনন্ত বিশ্ব উদ্ভূত। মা যে কেবল প্রসব করিয়াছেন তাহা নহে, প্রসূত সকল বস্তুতে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রুতি মন্ত্রে আছে—

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

ভূলোক হইল স্থূল জগৎ, দ্যুলোক হইল সূক্ষ্মজগৎ; এই দুই স্থিত আছে কারণরূপিণী মহাশক্তি তাঁহার দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া। তিনি ছুঁইয়া আছেন বলিয়াই নিখিল বিশ্ব ক্রিয়াশীল।

সপ্তম মন্ত্রে বলা হইল যে, মহাশক্তি সকল কারণের কারণস্বরূপিণী। তাঁহার কৃপাস্পর্শে নিখিল বিশ্ব জীবন্ত। মাতৃ অঙ্কে জগৎ সংসার বিধৃত। অষ্টম মন্ত্র—

অহমেব বাত ইব প্রবামি
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা
এতাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮ ॥

ভূলোক ভুবর্লোকাদি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিতে করিতে আমি তাহার উপর বায়ুর মত প্রবাহিত হই। মূলতঃ আমি ভূলোক দ্যুলোক সকলের উৰ্দ্ধে। আমি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাতীত, তথাপি নিজ মহিমায় জগন্ময়ী এই বিশ্বরূপধারিণী হইয়া আছি।

তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বগ। একই কালে Transcendent ও Immanent, জগদতীত হইয়াও জগদ্রূপে সম্ভূত। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"মৎস্থানি সর্বভূতানি" আবার "ন চ মৎস্থানি ভূতানি।" কাহারও সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই—তবুও সকল সৃষ্টি করিয়া সকলের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। দেবীসূক্তের অষ্টম মন্ত্রের ইহাই বার্ত্তা। সমগ্র দেবীসূক্ত এই সংবাদ দিল যে, উপনিষদের পরাৎপর ব্রহ্ম ও তন্ত্রশাস্ত্রের মহাশক্তি একই বস্তু।

রাত্রিসূক্ত

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশত সাতাইশ সংখ্যক সূক্তটির নাম রাত্রিসূক্ত। এই সূক্তের দ্রষ্ট্রী ঋষি ভরদ্বাজ-কন্যা রাত্রি (কাহারও মতে সৌভরি-মুনির পুত্র কুশিক)। এই মন্ত্রের স্তুতা দেবতা রাত্রিদেবী। ইহার ছন্দ গায়ত্রী। এই সূক্তে আটটি মন্ত্র

আছে। দুর্গাদেবীর প্রীত্যর্থে চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে এই সূক্ত পাঠের বিধি আছে। রাত্রি একটি দেবী। বিশ্বজননীর ইনি এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। ইহার মহিমা বর্ণন করিয়া ঋষি অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন।

১। বহুস্থানে বহুদেশে (পুরুত্রা) দীপ্তিশালিনী (দেবী)' রাত্রিদেবী আসিতে আসিতে (আয়তী) নক্ষত্ররূপ চক্ষুগুলি খুলিয়া (অক্ষভিঃ) আমাদিগকে বিশেষভাবে দর্শন করিতেছেন (ব্যখ্যৎ)। ইনি অশেষ প্রকার শোভা (শ্রিয়ঃ) ধারণ করিয়াছেন (অধিত)।

২। মরণধর্ম-রহিতা (অমর্ত্ত্যা) অমৃতময়ী রাত্রিদেবীর খেলা দেখ। ইনি প্রথমে বিস্তীর্ণ (উরু) গগনমণ্ডলকে অন্ধকার দ্বারা (তমসা) পরিপূর্ণ করেন (অপ্রাঃ)। তারপর নীচের (নিবতঃ) তৃণগুল্মগুলিকে, তারপর উচ্চে উত্থিত (উদ্‌বতঃ) বৃক্ষাদিকে, নিজের অন্ধকারস্বরূপ শক্তিদ্বারা আবরণ করেন। তারপর আবার চন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্রগণের (জ্যোতিষা) কিরণ দ্বারা সেই অন্ধকারকে (তমঃ) দূর করেন (বাধতে)।

অন্ধকার দিয়া তিনিই বিশ্ব ছাইয়া ফেলেন, আবার উহা দূর করিবার উপায়ও তিনিই করেন।

৩। ক্রীড়াময়ী রাত্রিদেবী যাইবার সময় ভগিনী (স্বসারম্) উষাদেবীকে সম্পাদন করেন (অস্কৃত), তারপর ভগিনী আসিয়া রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া দেন।

যিনি অন্ধকার করেন তিনিই আলোর সৃষ্টি করেন। আঁধাররূপে ঢাকেন। আলোরূপে উন্মোচন করেন। রাত্রিদেবী ও উষাদেবী দুই ভগিনী।

৪। অন্ধকার যে কেবল দুঃখদায়ক তাহা নহে—রাত্রিদেবী

উপস্থিত হইলে পক্ষীরা বৃক্ষস্থিত বাসায় যেরূপ সুখে থাকে, আমরাও গৃহে সেইরূপ সুখে থাকি। রাত্রিদেবতা প্রসন্না হইলেই জীবন সুখময় হয়। হে দেবি, প্রসন্না হউন।

৫। রাত্রিদেবী আসিলে গ্রামবাসী ও নরনারী (গ্রামাসঃ) গো-মহিষাদি পশুগণ (পদ্বন্তঃ), পক্ষিগণ এবং বেগশালী (অর্থিনঃ) শ্যেন পাখীরা সকলেই শয়ন সুখ ভোগ করে (অবিক্ষত)।

দেবীর কাহারও উপর পক্ষপাতিত্ব নাই। সকলকেই সুখ দেন। সকলকেই দেখেন।

৬। হে রাত্রিদেবী, (উর্ম্যে), বৃক ও বৃকীর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। দম্ভ, মোহ, মদ, লোভ এরা হইল বৃক, আর ঈর্ষা, হিংসা, অসূয়া, নির্দ্দয়তা এরা হইল বৃকী। ইহাদের হস্ত হইতে আমাদের বাঁচাও। আর চোরকে দূর কর। কাম, ক্রোধ, বিষয়ানুরাগ এরা হইল তস্কর। ইহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে দূরে রাখ। এই ভাবে আমাদের সুখের কারণ (সুতরা) হও।

রাত্রির নিদ্রার একদিক্ যেমন শান্তি, অপর দিক্ তেমন সকল ভুলিয়া যাওয়া-রূপ অজ্ঞানতা। শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করার জন্য উষাদেবীকে বলিতেছেন—

৭। হে উষাদেবী, ঐ সকল বস্তুতে সংলগ্ন (পেপিশৎ) কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে (ব্যক্তমস্থিত), ঋণের ন্যায় তুমি তাহাকে দূর করিয়া দেও (ঋণেব যাতয়)।

ঋণ যেমন পীড়াদায়ক, শোধ হইলেই শান্তি, অজ্ঞানান্ধকারও সেইরূপ বেদনাদায়ক, দূর হইলেই শান্তি।

৮। আবার রাত্রিদেবীকে বলিতেছেন—হে সূর্য্যকন্যা (দুহিতুর্দিবঃ),

হে পরমাত্মার শান্তিরূপী দুহিতা, আমরা তোমার স্তব করিতেছি। গাভী দোহনকারী ব্যক্তি যে প্রকার গাত্রকণ্ডূয়নাদি দ্বারা তাকে দোহনাভিমুখী করে, সেইরূপ আমরা স্তব স্তুতি দ্বারা তোমাকে আমাদের অভিমুখী করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমরা শত্রু জয় করিতে ইচ্ছুক (জিগ্যুষে), আমাদের ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কল্যাণের পক্ষে যাহা বাধা তাহাকে আমরা জয় করিতে অভিলাষী। তুমি আমাদের স্তব গ্রহণ কর। অগ্নিতে হবি দিলে সে যেমন তাহা গ্রহণ করে সেইরূপ তুমি আমাদের স্তব গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হও (বৃণীষ্ব)।

রাত্রি আমাদের শ্রান্তি দূর করিয়া শান্তি আনে, আবার মোহগ্রস্ত করিয়া কামাদি রিপুর বশীভূত করে। রাত্রিদেবীর এই দুই বিরুদ্ধ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সূক্তটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি গানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই পদের ভাব লইয়া সূক্তটি আস্বাদনীয়।

"শ্রান্তি নিবারিণী নিদ্রে কেন শ্রান্তি কর দূর।
প্রবেশিয়ে জীব হৃদে কেন হান মোহ শর।
কেন ওলো মনোরমে
বিভাবরী সমাগমে
শ্রান্ত মানবের তরে অবারিত তব ক্রোড়।
কহ ওলো নিশি সখী
স্বরূপ কহলো মোরে
কে তোমারে প্রদানিল এহেন মোহন বর।"

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু

(সংকীর্ত্তন পদামৃত ১২৪ পৃষ্ঠা)

মহামায়া কে ?

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে সুরথ রাজা মেধাঃ (মেধস্) ঋষির নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছেন—

"ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥" ১।৫৪ ৫৫

—ভগবন্ ! আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন সেই দেবী কে ? তিনি কিরূপে উৎপন্না হইয়াছেন ? তাঁহার কর্ম্মই বা কি ? তাঁহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ স্বরূপ, যেরূপে উৎপত্তি, হে বেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ ! আপনার নিকট হইতে সেই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ।

প্রথম প্রশ্ন বস্তুবিষয়ক—তিনি কে, দ্বিতীয় প্রশ্ন উৎপত্তি প্রকরণের—কি প্রকারে তিনি উৎপন্না হন, তৃতীয় প্রশ্ন কর্ম্মবিষয়ে—তাঁহার কার্য কি, চতুর্থ প্রশ্ন নিত্যানিত্যত্ব বিষয়ে—কি তাঁহার স্বভাব, পঞ্চম প্রশ্ন শ্রীমূর্তি বিষয়ে—কি তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ আকৃতি, ষষ্ঠ প্রশ্ন পিত্রাদির সম্বন্ধে—কোথা হইতে উৎপত্তি ।

ঋষি প্রথমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন । "নিত্যৈব সা" অর্থাৎ তিনি নিত্যা । নিত্যা বলিয়াই উৎপত্তিরহিতা । ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর । নিত্যা বলিয়াই অনিত্যত্বস্পর্শরহিতা । ইহাতে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে । কিরূপে উৎপন্না ও স্বভাব কিরূপ, এক

কথায় ইহার উত্তর দিয়া ঋষি মহাদেবীর স্বরূপ বা আকৃতি বিষয়ে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"জগন্মূর্ত্তিঃ" অর্থাৎ এই জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি।

তাঁহার ক্রিয়াবিষয়ে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"তয়া সর্ব্বমিদং ততম্" অর্থাৎ তাঁহা দ্বারা সমগ্র জগৎ বিস্তারিত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। জগদ্বিস্তারই তাঁহার কর্ম্ম। তাঁহার উৎপত্তির কথা ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার জন্মাদি নাই, তথাপি দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন তখন তাঁহাকে সকলে উৎপন্না বলেন, যথা—

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥" ১।৬৫

প্রথম প্রশ্ন ব্যতীত আর সকল প্রশ্নের উত্তর হইল। প্রথম প্রশ্নের উত্তর সমগ্র গ্রন্থমধ্যে ছড়াইয়া আছে, অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে।

"তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।" ১৪-৯৫০

মহামায়া দেবী ভগবতী। তিনি জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা। তিনি এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখেন। তিনি জ্ঞানিগণের চিত্তও মুগ্ধ করেন। বস্তুতত্ত্বের তিনটি পরিচয় পাওয়া গেল। ১ম, শ্রীহরির যোগনিদ্রা—হরিকে নিদ্রায় অভিভূত করেন, মোহিত করেন। ২য়, জগৎকে মুগ্ধ করেন। ৩য়, জ্ঞানীদেরও মোহিত করেন। প্রথমটি যোগনিদ্রা, দ্বিতীয়টি অবিদ্যা ও তৃতীয়টি বিদ্যা।

যোগনিদ্রার অপর নাম আত্মমায়া বা যোগমায়া। এই মহাশক্তি অবলম্বনে শ্রীহরি আবির্ভূত হন—"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" (গীতা ৪-৬)। ইহা দ্বারা নিজে আবৃত হন। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ" (গীতা ৭।২৫), তিনি যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না। এই যোগমায়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলংকৃতম্ ।।"

(ভাঃ ১০।২।৬৭)

শ্রীভগবান্ যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পরমভক্ত যাদবগণ কংস কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছেন, তখন তিনি তাঁহাদের দুঃখমোচন করিবার মানসে তাঁহার নিজশক্তি যোগমায়াকে ব্রজে যাইতে আদেশ করিলেন।

তিনি যে ব্রজে নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভসম্ভবা হইয়া আবির্ভূতা হইবেন ইহা চণ্ডীতেও উক্ত আছে—"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদা-গর্ভসম্ভবা" (চণ্ডী ১১।৪১)। শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভে দেখা যায় তিনি প্রেমবতী গোপবালাগণের মধুর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া যোগমায়াশক্তির পূর্ণ বিকাশ করেন।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ।। (ভাঃ ১০।২৯।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতিতেও যোগমায়াশক্তির উল্লেখ দেখা যায়—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥" (১০-১৪-২১)

হে যোগেশ্বর, হে পরমাত্মন্, ত্রিলোকে কাহারও পক্ষে আপনার নিত্যলীলার তত্ত্ব বুঝা সম্ভব নয়। কেন না, আপনি কবে কোথায় কি প্রকারে যোগমায়াশক্তির বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। এই যোগমায়া-শক্তি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের আত্মবিমোহনকারিণী নহেন, ভক্তবিমোহিনীও বটেন। মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে পতিপুত্রাদিতে মমতা-মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারা তাঁহাকে বিমুগ্ধ করেন—

'ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥" (১০।৮।৪৩)

এই বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মা যশোদা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া গেলেন না। বরং তাঁহার পুত্রস্নেহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল—"প্রবৃদ্ধস্নেহ-কলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা" (১০।৮।৪৪)। তিনি কিয়ৎপূর্ব্বে দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মুখবিবরে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে কোলে লইয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। যোগমায়ার এই কার্য্যকে উন্মুখ-মোহিনী-শক্তি বলে।

ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎসাদি অপহৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপবালক ও গোবৎসের রূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ লীলা করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসীর যে মমতাধিক্য ছিল, সকল

গোপবালক ও বৎসে এখন তিনি স্বয়ংরূপে বিরাজিত থাকায় মূল কৃষ্ণের প্রতি মমতাধিক্য হ্রাস-প্রায় মনে হইতেছিল। শ্রীবলরাম উহা লক্ষ্য করেন, কিন্তু রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া ব্রজে কোন মায়ার প্রভাব অনুমান করেন। তবে ইহা কোন দেবতা বা অসুর অথবা মানুষের মায়া নহে। শ্রীবলরাম বুঝিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের নিজমায়া। কারণ তাঁহার নিজমায়া ছাড়া অন্য কোন মায়া তাঁহাকে (বলরামকে) মোহিত করিতে পারে না।

"কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥" (১০।১৩।৩৭)

যোগমায়াদেবী যে ভগবান্ ও ভক্ত উভয়কে মোহিত করেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি পয়ারে তাহা অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে।
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ-গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন॥"

(চৈঃ চঃ আদি—৪র্থ অধ্যায়)

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার এই দুই কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণোন্মুখী ভক্তগণকে মুগ্ধ করা। ইহার দ্বারা লীলার ঔজ্জ্বল্য সম্যক্ প্রকটিত হয়। এই যোগমায়া-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা মায়া। কবিরাজ গোস্বামী এই যোগমায়ার পরিচয়ে বলিয়াছেন -

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।"

এই যোগমায়া শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নাও বলা চলে। এই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে "গৌতমীয় কল্পের" বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ
যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"

ইহা দ্বারা চিচ্ছক্তিরূপিণী দুর্গা ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ অভেদই স্থাপিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিধিমতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবার সময় কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে এই দুর্গার স্মরণ ও হৃদয়ে ন্যাস করিতে হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ নীতি অনুসারে অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নই।

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

(চৈঃ চঃ আদি—৪র্থ অধ্যায়)

শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় রাসলীলার প্রথম শ্লোকে যোগমায়াশব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"যোগমায়া পরাখ্যা অচিন্ত্যশক্তিঃ॥ যত্র যত্র বিহরতি তত্র তত্রৈব সূর্য্যঃ স্বদীধিতিমিব সদাপ্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিকতাদৃশশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতম্।" অর্থাৎ সূর্য্য এবং তাহার কিরণ যেমন সর্ব্বত্রই একত্র থাকে, সেইরূপ যেখানে শ্রীহরি বিহার করেন সেইখানেই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তিস্বরূপা যোগমায়া সহযুক্ত হইয়াই থাকেন। শ্রীসনাতন অর্থ করিয়াছেন—

"শ্লেষেণ যোগঃ সংযোগঃ, তদর্থং মায়া কৃপা, মায়া দম্ভে কৃপায়াং চ ইতি বিশ্বঃ।" বিশ্বকোষ অভিধানে 'মায়া' শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কৃপা। শ্রীহরির সহিত যুক্ত হইবার কারণে তাঁহার যে কৃপা তাহাই যোগমায়া। এই অর্থে যোগমায়া কৃপাশক্তিরই নামান্তর। এই কৃপাশক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া, শ্রীচণ্ডী বলিয়াছেন—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥"

—তিনি বিদ্যাস্বরূপা। তিনি সনাতনী, প্রসন্না হইলে জীবের মুক্তির হেতুভূতা।· নারদপঞ্চরাত্র এই শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—"অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ।" মহামায়ার এই শক্তি গুণাতীতা।

মহামায়ার আর একটি আবরিকা শক্তি আছে। তাহা ত্রিগুণময়ী —"যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ" (নারদপঞ্চরাত্র)। শ্রীভাগবত এই মায়ার পরিচয় দিয়াছেন—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।" শ্রীগীতা এই আবরিকা মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" (গীতা-৭।১৪)

এই মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কষ্টকর। এই মায়ার কার্য্য যিনি ভগবদ্‌বিমুখ, তাঁহাকে মুগ্ধ করা। ইনি বিমুখ-মোহিনী। ভগবদ্‌বহির্মুখ করিয়া জীবকে দুঃখ দেওয়াই ইহার কাজ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" চৈঃ চঃ (মধ্য-২০)

এই মায়া পার হইতে না পারিলে বিষয়ানুরাগ কাটে না। জীবের সংসার বন্ধন দূর হয় না। এই মায়া অতিক্রম করা যায় কেবলমাত্র শরণাগতির দ্বারা। আর অন্য উপায় নাই।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

আমার গুণময়ী মায়ার সাগর কিছুতেই পার হওয়া যায় না। একমাত্র আমার কাছে যিনি প্রপন্ন হন অর্থাৎ সর্বতোভাবে আমাকেই আশ্রয় করেন, তিনিই কেবল এই দুস্তর মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

এই মায়াকে বহিরঙ্গা মায়া বা গুণময়ী মায়াও বলে। সুতরাং চণ্ডী, ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে এই সিদ্ধান্ত করা চলে—মহামায়া হইতেছেন শ্রীহরির অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। তাঁহার দুই প্রকাশ—একটি গুণাতীত অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি ও অপরটি গুণময়ী বহিরঙ্গা তমঃশক্তি। প্রথমটির কার্য্য ভক্ত-বিমোহন ও হরি-বিমোহন—তাহার ফল শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময়ী লীলার প্রকটন ও ভক্তদের পরমানন্দের আস্বাদ দান। দ্বিতীয়টির কার্য্য হরিবিমুখজন-মোহন। সত্যকে আবরণ পূর্বক বিমুখ জীবকে বিষয়জনিত (সুখাভাস) আপাতসুখ অর্থাৎ দুঃখ দান। এই সকলই এক মহামায়ার বিবিধ কার্য (Function)।

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, তিনি "জগন্মূর্ত্তিঃ" এবং "তয়া সর্বমিদং ততম্।" এই দুই বিশেষণে তিনি যে বিশ্বের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ উভয়ই, তাহা বলা হইল। শ্রুতিতে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি' ইত্যাদি মন্ত্রে যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং বেদান্তসূত্রে 'জন্মাদ্যস্য

ষতঃ' প্রভৃতির দ্বারা যাহার স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, মহামায়া তত্ত্বতঃ সেই পরব্রহ্মবস্তুই। এই জন্যই তাঁহাকে "সংসারস্থিতিকারিণঃ" বলা হইয়াছে। মহাশক্তি মহামায়া পরব্রহ্মের পট্টমহিষীরূপেও কথিত হইয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া, তত্ত্বতঃ ও কার্য্যতঃ মহামায়াও পরব্রহ্মই। কার্য্যতঃ ব্রহ্ম যেমন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, মহামায়াও তেমনি। যথা—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥ (চণ্ডী ১।৭৬)

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য বস্তুতত্ত্বও তিনি, কার্য্যব্রহ্মরূপে জগন্ময়ও তিনি, আবার তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ভূত "মহাবিদ্যা"ও তিনি। এইরূপ সর্বরূপা, গুণময়ী হইয়াও গুণাতীতা। নারায়ণী শক্তিস্বরূপিণী মহামায়া দেবীর কৃপালাভার্থ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত করি।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ (চণ্ডী—১১।১১)

চণ্ডীর ত্রিমূর্তি

বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে একটি সূত্র আছে "কম্পনাৎ"। পরব্রহ্ম শ্রীহরিপুরুষের ভয়ে বিশ্বজগৎ প্রকম্পিত। কঠ শ্রুতিতে আছে, "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্", উদ্যত বজ্রের মত তিনি মহাভয়ঙ্কর। তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উঠে, অগ্নি জ্বলে, বাতাস বয়, যম পর্য্যন্ত কাঁপে।

ব্রহ্মের এই ভয়ঙ্করী শক্তিই চণ্ডী। চড়ি ধাতুর অর্থ কোপ করা। চণ্ডী অর্থ কোপময়ী। শরণাগত ভক্তকে আসুরিক আঘাত হইতে রক্ষার জন্য ব্রহ্মশক্তি যখন ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরেন তখন তিনি চণ্ডিকা।

চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকা অন্যরূপ বলিয়াছেন। "চণ্ডী নাম পরব্রহ্মণঃ পট্টমহিষী দেবতা", চণ্ডী পরব্রহ্মের পট্টমহিষী দেবী। দেবী বলিতে পরমদেবের প্রধানা শক্তি উদ্দিষ্ট। ব্রহ্ম শক্তিমান্, চণ্ডী শক্তি। সৃষ্টির প্রারম্ভে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম দুই রূপ হইয়াছেন ব্রহ্মধর্মী, চণ্ডীধর্মী।

ব্রহ্মের শক্তি তিনটি। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ", জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই প্রকাশ একই অখণ্ড শক্তির। সেই অখণ্ড শক্তির নামই চণ্ডী। আর ঐ ত্রিবিধ প্রকাশময়ী মূর্তির নাম মহাকালিকা, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী।

তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা বলেন, মহাসরস্বতী চিদ্‌রূপা, মহালক্ষ্মী সদ্‌রূপা, মহাকালী আনন্দরূপা। এই ত্রিতয়ের সমষ্টি শক্তিভূতা সচ্চিদানন্দময়ী চণ্ডিকা।

চণ্ডী গ্রন্থের তিনটি ভাগ—প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর চরিত। প্রথম চরিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাকালিকা, মধ্যম চরিতে

মহালক্ষ্মী, আর মহাসরস্বতী হইলেন উত্তর চরিতের প্রতিপাদ্য দেবতা। শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা মধুকৈটভ-বধার্থ যাহার স্তব করিয়াছেন, তিনি হইলেন মহাকালী। তিনিই সৃষ্টির আদিতত্ত্ব। সংহিতা গ্রন্থে মনু বলিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে কিছু ছিল না, ছিল কেবল অন্ধকার "আসীদিদম্ তমোভূতম্"। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত প্রশ্ন তুলিয়াছেন— যখন কিছু ছিল না, তখন কি ছিল? যখন পৃথিবী ছিল না, আকাশ ছিল না, রাত্রি দিনের প্রভেদ ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ," তখন কি ছিল?

বৈদিকঋষির এই অনন্তজিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন বেদ নিজেই পুরুষসূক্তে। যখন কিছু ছিল না, তখন "পুরুষ" ছিলেন "পুরুষ এবেদং সর্বং।" যাহা কিছু ছিল বা থাকিবে, সকলই সে পুরুষ হইতে— "যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং।" তন্ত্রশাস্ত্র এই উত্তরে তৃপ্ত নয়। তান্ত্রিক আচার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, যখন পুরুষ ছিল না, তখন কে ছিল? নিগমশাস্ত্র বেদ বলেন, পুরুষ ছিল না, এমন কখনও হয় না। আগমশাস্ত্র তন্ত্র তাহা মানিয়াও মানিতেছেন না। বলেন, পুরুষ যখন থাকিয়াও নাই, তখন কে আছেন?

থাকিয়াও নাই কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। বাড়ীর দরজায় "In" দেখিয়া আপনি আছেন জানিয়া প্রবেশ করিলাম। পরে নিদ্রিত আছেন দেখিয়া আলাপ না করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আপনি বাড়ীতে থাকিয়াও নাই। পুরুষ যখন নিদ্রিত আছেন তখন কে আছেন, আগম তাহা জানিতে চায়। নিগম উত্তর দিতে পারে না। আগমশাস্ত্রের নির্যাস চণ্ডী উত্তর দিতেছেন। কল্পান্তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কারণসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে, "জগত্যেকার্ণবীকৃতে।" অনন্তশয়নে

ব্রহ্মপুরুষ মহাবিষ্ণু নিদ্রিত। পুরুষের সহিত অনন্ত জগৎ সুপ্ত। তখন জাগিয়া আছেন একমাত্র যোগনিদ্রা। ইনি মহানিদ্রা, মোহনিদ্রা, মহারাত্রি, মহাদেবী, মহাকালিকা। ইনিই শ্রীহরির নেত্রে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, "হরিনেত্রকৃতালয়াম্।" নেত্র শব্দ সকল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ। হরির সর্ব ইন্দ্রিয় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন এই মহাতামসী মহাশক্তি দেবী।

তন্ত্রমতে ইনিই সৃষ্টির আদি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ইঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন। দর্শনের কাহিনী বলিতেছি। নিদ্রিত পুরুষের নাভিকমলে, ব্রহ্মা সৃষ্টি-শক্তি, নূতন সৃষ্টির ধ্যানে মগ্ন। সৃষ্টি ক্রিয়াটি স্পন্দনময়ী। স্পন্দনের মূলে গতিবেগ। বাধা ছাড়া গতি নাই, Frictionless motion হয় না। সৃষ্টি শক্তির বাধা উপস্থিত হইল। বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ দুই অসুর—বেদান্ত দর্শনের আবরণ ও বিক্ষেপ, সাংখ্যের রজঃ ও তমঃ গুণ। তাহারাই তন্ত্রশাস্ত্রের মধু ও কৈটভ। তাহারা ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল, "হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।" ভীত ব্রহ্মা নিদ্রামগ্ন হরির জাগরণের নিমিত্ত তাঁহার নয়নাশ্রিতা মহানিদ্রাস্বরূপিণী মহাকালিকার স্তব করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "মাতঃ! তোমার শক্তিতে ভগবান্ হরিও যখন নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান, তখন ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে তোমার স্তুতি করিতে সমর্থ? তুমি দয়া করিয়া জগৎপতি বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ কর, "প্রবোধঞ্চ জগৎ-স্বামী নীয়তাম্", অসুরদ্বয়কে মোহিত কর, "মোহয়", উহাদের বিনাশের নিমিত্ত হরিকে প্রবৃত্তি দাও, "বোধশ্চ ক্রিয়তাং হন্তুম্"। হরিকে প্রবুদ্ধ করিয়া অসুরবধে প্রবৃত্তি জন্মাইবার ও অসুরকে মুগ্ধ করিবার সকল সামর্থ্য তোমাতেই বিরাজমান।"

ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাকালিকা পরিতুষ্ট হইলেন। মধুকৈটভের বধার্থ বিষ্ণুর জাগরণ ইচ্ছা করিলেন। জাগাইতে হইলে ইন্দ্রিয়ের আবরণ উন্মোচন প্রয়োজন। মহাবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-শক্তিকে মহানিদ্রা নিজেই তো আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ধীরে সে আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ নিজেকে সরাইয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন, বদন, নাসিকা, বাহু, বক্ষস্থল এই সকল স্থান হইতে, "নেত্রাস্য-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ" আপনি উত্থিতা হইলেন। তখন ব্রহ্মার দর্শনে তিনি স্থির হইলেন—"দর্শনে তস্থৌ।" তিনি দেখা না দিলে দেখিবার সামর্থ্য কার?

মহাকালিকা সে আবরণ সরাইয়া লইলে মহাবিষ্ণু জাগিয়া উঠিলেন। মধুকৈটভের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বধ সাধন করিলেন।

মহানিদ্রারূপিণী মহাকালিকাকে ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন স্পষ্টভাবে। তাই ব্রহ্মা ঋষি, দ্রষ্টা। ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব আমরাও তাঁহাকে দেখি, দেখি নিত্য সুষুপ্তিকালে। ধরিতে পারি না, বুঝিতে পারি না কাহার শান্তিময় শীতল ক্রোড়ে গিয়া দিবসের ক্লান্তি মুছিয়া যায় নূতন দিনের জন্য নবশক্তির জাগরণে। সকলের ব্যষ্টি নিদ্রার সমষ্টিভূত রূপই মহানিদ্রা। সাধারণ মানুষ মায়ের ক্রোড়ে উঠে, চেনে না, ধ্যানযোগীরা চেনে, দেখে না। ঋষি ব্রহ্মা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন।

মহাকালিকা ঘোরা অন্ধকারময়ী। সকল বর্ণ সেখানে সুপ্ত। বর্ণমালা অপ্রকাশিত। বর্ণনা চলে না। মহালক্ষ্মীতে অসংখ্য বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রকটিত। মূল বীজ ফল-ফুল-সমাকীর্ণ মহাবৃক্ষে পরিণত। এই মহালক্ষ্মী প্রকাশিতা হইয়াছেন মধ্যম চরিতে।

শতবর্ষব্যাপী দেবাসুরের যুদ্ধ। দেবতারা পরাভূত। মর্ত্যের মতো মর্তে বিচরণশীল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের দ্বারস্থ হইয়া দেবগণ নিজেদের স্বর্গভ্রষ্টতার কাহিনী করুণ সুরে গাহিলেন। শুনিয়া বিষ্ণু ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। বিষ্ণুর সর্ব অঙ্গ আলোড়ন করিয়া বৈষ্ণবী তেজ বহির্গত হইল। একপ্রাণতার শৈবী ও ব্রহ্মাণী শক্তিও নির্গত হইল। সহানুভূতিবশতঃ বিমোহিত ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দৈব তেজ সমুজ্জ্বলভাবে বাহিরে অভিব্যক্ত হইল। সমগ্র তেজোরাশি মিলিয়া একত্রীভূত হইল। এক মহীয়সী নারী মূর্তিতে বিশ্বব্যাপী মহাশক্তি প্রকটিতা হইলেন। ইনিই তন্ত্রের মহালক্ষ্মী।

মহালক্ষ্মী দর্শন মূলতঃ বিশ্বরূপ দর্শনই। বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুগুলিকে একস্থ দর্শন। বিভিন্ন বস্তুসমূহকে নানাবস্তুরূপে দেখাই ভ্রান্তদৃষ্টি। অবিভক্তভাবে দেখাই অখণ্ড দৃষ্টি, "অবিভক্তং বিভক্তেষু।" গীতোক্ত অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন তন্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীর দর্শন হইতে ভিন্ন কিছু নয়। মহালক্ষ্মীতে বিভিন্ন দেবতাশক্তি একই মাতৃদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

মায়ের মুখখানি মঙ্গলময় শম্ভু, বাহুগুলি ধারণী শক্তি বিষ্ণু, গতিময় চরণে সৃজনীশক্তি ব্রহ্মা, নয়নাগ্নিতে পাবক, স্তনযুগলে স্নিগ্ধশীতল চন্দ্রমা, কৃষ্ণকেশে অন্তক যম, ক্রোড়ে ধরণী, সর্বাঙ্গে রবিরশ্মি। শূলীর শূল, চক্রীর চক্র, কালের দণ্ড, ইন্দ্রের বজ্র সবলই মহালক্ষ্মীর শ্রীহস্তে স্থিত। অনন্ত বৈচিত্র্যময় বহুত্বের একত্র দর্শন মূর্তিমতী মহালক্ষ্মী।

মাতা হুঙ্কার করিলেন। সারাবিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল। অসুররাজ মহিষাসুর যুদ্ধের আহ্বান মনে করিয়া সৈন্য লইয়া সাজিয়া আসিল।

যুদ্ধও হইল ভীষণ। ফলে সগোষ্ঠী অসুররাজ কালকবলিত। মহিষাসুর জীবের আত্মকেন্দ্রিক কর্মোদ্যমের প্রতীক। নিখিল বিশ্বের একত্বানুভূতি ছাড়া আত্মকেন্দ্রিকতার বিনাশ হয় না। এই মহালক্ষ্মীর হস্তেই মহিষাসুরের জীবনাবসান। তখন পরম উল্লাসে দেবতাগণ মহালক্ষ্মীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা করিলেন, যখনই স্মরণ করিব তখনই মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, "সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ।"

চণ্ডীগ্রন্থের উত্তর চরিতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাসরস্বতী, ইনি মহাশক্তি চণ্ডিকার জ্ঞানশক্তির প্রকট প্রতিমা। ইনি পঞ্চাশৎ বর্ণমালা। আচার্য শঙ্কর প্রপঞ্চসারতন্ত্রে সরস্বতীর ধ্যানে বলিয়াছেন—

পঞ্চাশটি বর্ণমালা দ্বারা সরস্বতীর মুখ, বাহু, পদ, কুক্ষি ও বক্ষোদেশ বিহিত। তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ, সরস্বতীকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে চিন্তা করিতে বলিয়াছেন, "আত্মাভেদেন ধ্যাত্বৈবং।"

মহাসরস্বতী "ত্রিজগদাধারভূতা গৌরীদেহসমুদ্ভবা"। ইনি শুম্ভাদি দৈত্যের বিনাশকারী। দেবতাগণের স্তুতির পরে পার্বতীর শরীরকোষ হইতে ইঁহার আবির্ভাব। শুম্ভ অসুরবধ প্রসঙ্গে স্বরূপের পরিচয়।

দশম অধ্যায়ে শুম্ভবধ-প্রসঙ্গ, অষ্টম অধ্যায়ে হইয়াছে মহাসুর রক্তবীজের পতন। রক্তবীজের প্রতি ফোঁটা রক্ত হইতে তৎ-তুল্য একটি অসুর আবির্ভূত হইত। তাই তাহাকে বধ করিতে মা অন্যান্য শক্তিগণের সাহায্য লইয়াছেন। বারাহী, নারসিংহী, চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, কৌমারী, শিবদূতী, বৈষ্ণব-শক্তি প্রভৃতি মাতৃগণ মিলিয়া ক্রোধের মূর্তি রক্তবীজের বধ সাধন করিয়াছেন। পূর্ব অধ্যায়ে নিশুম্ভ-বধ হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতার মৃত্যুতে কাতর হইয়া প্রবল

ক্রোধান্বিত শুম্ভ যুদ্ধে আসিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শুম্ভ দেখিল পার্ব্বতীর পক্ষে অগণিত দেবীমূর্তি যুদ্ধরতা।

দেখিয়া সে কুপিত হইল। চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে বলগর্ব্বে দুর্বিনীতে দুর্গে! আমার সৈন্যসামন্ত বধ করিয়া কিসের গর্ব করিস? তোর সঙ্গে কথাই ছিল, যে যুদ্ধে পরাভূত করিবে, তুই তার বশীভূতা হবি। এতগুলি লোক ভাড়া করিয়া আনিবার তো কোন সর্ত ছিল না। ধারকরা শক্তি লইয়া যুদ্ধ করিয়া আবার উঁচু মুখে গর্ব।' 'অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী'!

অসুররাজের ক্ষিপ্ত হইবারই কথা। তাহার সমগ্র সৈন্যবল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে! ভাগিনেয় রক্তবীজ গিয়াছে, ভাই নিশুম্ভ গিয়াছে। রহিয়াছে সে শুধু একা। অপরপক্ষে চণ্ডিকার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় নাই। তিনি বহু দেবীগণ সঙ্গে পূর্ণশক্তিতে বিরাজমানা। এমতাবস্থায় রোষে ক্ষিপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে কে? অসুর তাই 'মা' সংগ্রাম-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া, ক্রোধভরে জবাবদিহি চাহিল।

অসুরের কথা শুনিয়া দেবী গম্ভীর নাদে উত্তর করিলেন, 'ওরে দুষ্ট! এ জগতে আমি তো একাই আছি। অনন্তবিশ্বে আমার দ্বিতীয় তো কেহ নাই।' "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

অসুর আরও রাগিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রত্যক্ষে দেখা যাইতেছে যে, সে বহুশক্তিপরিবৃতা, তবুও মুখের জোরে 'আমি একাই' বলিয়া আস্ফালন করিতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানের সত্তা

স্বীকার করিলে সে আর অসুর হইবে কেন? তত্ত্বজ্ঞানের অস্বীকৃতিতেই তো অসুরত্বের গরিমা।

অসুর মূর্ত অজ্ঞান, জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানকে বধ করিতে হইবে। মহাসরস্বতী ছাড়া এই অজ্ঞানের হননকর্ত্রী আর কে আছে? ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই শ্রুতিবাণীই সরস্বতী। কিন্তু এই বাণীমাত্রেই অজ্ঞান মরে না। অজ্ঞানের চিরমরণ ঘটাইতে চাই মহাসরস্বতী। মহাসরস্বতী শাশ্বত বাণীর মূর্ত-বিগ্রহ।

শ্রুতিবাণীর প্রকট-প্রতিমা মা বলিলেন, দুষ্ট! আমি দ্বিতীয়-রহিতা। ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছিস না? এই দেখ্ "পশ্যৈতা দুষ্ট!" এরা সব আমারই বিভূতি; আমাতেই প্রবেশ করিবে "ময্যেব বিশন্ত্যঃ"।

মা এই কথা বলিতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রকটিত হইল। প্রত্যেকটি মাতৃকাশক্তি মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ("তনৌ জগ্মুঃ")। সর্বশেষে অম্বিকা একাই বিরাজমানা রহিলেন, "একৈবাসীৎ তদাম্বিকা"।

বলিলেন, "এই দেখ্! আমি বিভূতি দ্বারা বহু মূর্তিতে অবস্থান করিতেছিলাম, এই তাহা প্রত্যাহার করিলাম (তৎ সংহৃতং ময়া)। এখন একাই আছি", (একৈব তিষ্ঠামি)।

অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপিণী চণ্ডিকার বিভূতি-সকল তাঁহারই লীলাবিলাস মাত্র। ইঁহাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। আসুরিক বুদ্ধি এই মহাতত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ। মাতাই অপরোক্ষানুভূতিতে প্রত্যক্ষ করাইয়া দেখাইলেন। মাকড়শা যেমন স্বদেহ হইতে সূত্র উৎপাদন করে, আবার তাহা স্বদেহেই লয় করে, এও সেইরূপ। ইচ্ছাশক্তির বিলাসে বিভূতি

প্রকাশ। ইচ্ছা মাত্রে স্বীয়.সত্তার সংহরণ। এই মহাতত্ত্বের মূর্তি দর্শনের অজ্ঞানতা অসুরের মৃত্যু, পরবর্তী যুদ্ধ বহিরঙ্গ খেলা মাত্র।

মহাকালিকা অন্ধকারবর্ণা। সকল তত্ত্ব সেথায় অব্যক্ত। মহালক্ষ্মী বৈচিত্র্যময়ী, নিখিল তত্ত্ব সেথায় সুপরিস্ফুট। মহাসরস্বতী শুভ্র জ্যোৎস্না-ধবল, নিখিল বৈচিত্র্যের পরম একত্বে পর্যবসান। তন্ত্রের তত্ত্বের এই ছক (formula) বিরাটের সামগ্রিক জীবনে যেরূপ সত্য, অণুচৈতন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনেও সেইরূপ সত্য।

দীর্ঘ ইতিহাসের অন্ধকার হইতে মানুষ বৈচিত্র্যময় জগতে আসিয়াছে। এই বৈচিত্র্যমধ্যে একত্বের দর্শনেই তাহার জীবনের সার্থকতা। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে যেখানে যত দ্বন্দ্ব, তাহার সমাধান হয় সরস্বতী-সাক্ষাৎকারে। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা তখনই কল্যাণকর। দুর্দমনীয় তাণ্ডবে মানব-সমাজ আজ বিপর্য্যস্ত। এই শারদীয় মহাপূজায় আমাদের জীবনমণ্ডপে মহাসরস্বতীর আবির্ভাবে বিপদের ঘোরঘনঘটা বিলীন হইয়া যাউক, মহামাতৃকার প্রাণমন্ত্রে বাংলা তথা ভারতের নরনারী প্রেমসমৃদ্ধ জীবনের পবিত্র জ্যোৎস্নালোকে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক।

শ্রীশ্রীকালিকার স্বরূপ

কালী মহাকালের শক্তি-মূর্ত্তি। যাহা কিছু কালে ছিল, আছে এবং থাকিবে—সকলই মহাকালীতে চিরবিদ্যমান। অনন্ত অতীত, অনন্ত ভবিষ্যৎ একটি নিত্য মূর্ত্তির মধ্যে শাশ্বতভাবে বিরাজিত।

সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ, একই মহাশক্তির পরস্পর-সাপেক্ষ বিবিধ বিকাশ। বীজ-ধ্বংসে বৃক্ষের জন্ম, বাল্যের ধ্বংসে যৌবনের উদয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতত্বের আস্বাদন। ভারতীয় ঋষিদের ইহা অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। ধ্বংসের মধ্যে তাঁহারা অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সেই করুণাময়ী সৌন্দর্য্যময়ী ধ্বংসের মহাশক্তির বিগ্রহমূর্ত্তিই কালিকা। কেবল ধ্বংসের নহে, বিশ্বের সৃজন, পালন, বিনাশকারী যাবতীয় শক্তিই কালিকাতে বিরাজিত। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যতগুলি ভাব অভিব্যক্ত হয় মানুষের কাছে, শ্রীকালিকাতে সে সকলই বিরাজমান। মহাপ্রকৃতির পরিপূর্ণ চিত্র কালিকা। এই স্বরূপ ভক্তের ধ্যাননেত্রে দর্শনীয়।

কালীর হস্ত চারিখানি। দুই হাতে পালন করেন, দুই হাতে নিধন করেন। বাম দিকের খড়্গ এবং মুণ্ড ভীষণ ধ্বংসের চিহ্ন। দক্ষিণ দিকের দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রায় পরম কল্যাণ প্রকটিত। এক হাতে আঘাত, আর এক হাতে সান্ত্বনা। এক হাতে ভীতি-প্রদর্শন অপর হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ। এমন বিরুদ্ধতার অপূর্ব্ব সমন্বয়, সামগ্রিকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি—সমগ্র প্রাকৃতির শক্তির এমন পূর্ণতম

প্রতীক সারা বিশ্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। দেবীর গলদেশ মুণ্ড-মালায় বিভূষিত। মুণ্ড হইতেছে জ্ঞান-শক্তির আধার। জ্ঞানরূপ মুণ্ডমালায় মহাশক্তির কণ্ঠ বিভূষিত। মুণ্ডসংখ্যা পঞ্চাশৎ। ইহা পঞ্চাশটি সংস্কৃত বর্ণমালার প্রতীক। বর্ণমালা শব্দ-ব্রহ্মের বহিরঙ্গ প্রকাশ। আর্য ঋষি শব্দব্রহ্ম (Logos) তত্ত্বের গভীর তলদেশে বিচরণ করতঃ মহাশক্তির রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। কালিকার কণ্ঠে নরমুণ্ড সুগভীর মন্ত্রশক্তির প্রতীক চিহ্ন।

মায়ের পশ্চাতে আলুলায়িত কেশরাশি যেন একটি যবনিকা। পিছনটা ও মধ্যটা আমাদিগকে দেখিতে দিবেন না। "যামেন চাভবৎ কেশঃ" যমের শক্তি হইতে কেশ হইয়াছে। জীবনকে রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছেন মৃত্যুর আবরণ দ্বারা। কোন বৈচিত্র্যময় জগতের চরম তত্ত্বকে রহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

কালিকা দেবীর অঙ্গবর্ণ কৃষ্ণ। সর্ব্ববর্ণের বিলয়-ভূমি কৃষ্ণই। অনন্ত অন্ধকারই কালীর যথার্থ রূপ। ঋগ্বেদ গাহিয়াছেন, "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে", আদিতে অন্ধকার গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত ছিল। আদিতে ছিলেন বলিয়াই তো তিনি আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি বলিয়াই তিনি অন্ধকার-বর্ণা। পরমহংসদেব বলিতেন—"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো। আকাশ দূরে তাই নীল, কাছে রং নাই। সমুদ্রের জল দূর হইতে নীল দেখায়, হাতে তোলো কোন রং নাই"। মহাশক্তি নিরাকার তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। কালী দিগম্বরী। দিক্ দেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বিবসনা। দেশকালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নহে; অসীম তিনি, ইহা বুঝাইতেই দিগ্বসনা মূর্ত্তি।

মৃত ব্যক্তির ছিন্ন হস্ত দ্বারা একটি মেখলা। হস্ত কর্ম্মশক্তির

আধার। জীবগণের কর্ম্মফল মহাকালের অবিদ্যার অংশে আশ্রয় লয়। ঐ কর্ম্মফলবশতঃই তাহাদের আবার জন্ম হইবে। জীবের অভুক্ত কর্ম্মফল প্রলয়ে মহাপ্রকৃতির গর্ভে নিহিত থাকে, পরবর্ত্তী কল্পে ভোগের নিমিত্ত। তাই মহামায়ার কটিতে নৃ-করমালা দোদুল্যমান।

জননী ত্রিনয়না। ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি, অন্ধকারবিধ্বংসী এই তিন শক্তির বিকাশ। তিন নয়নে মাতা তিন কাল দেখেন। সত্য শিব ও সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করান। মায়ের বক্ষস্থিত উন্নত স্তন ক্ষীর-পরিপূর্ণ। এক স্তন দ্বারা জগৎ পালন করেন আর এক স্তন-ধারায় সাধকগণকে পরমা মুক্তির অমৃতাস্বাদন করান।

জননীর রক্তবর্ণ জিহ্বা রজোগুণের সূচক। শুভ্রতা সত্ত্বগুণের প্রতীক। শুভ্র দন্তের দ্বারা রসনা দংশন করিয়া সাধকদিগকে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে সংহত রাখিতে শিক্ষা দিতেছেন।

ব্রহ্মপুরুষ শিব চরণতলে থাকিয়া তিনিও যে মহাশক্তির অধীন তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। পুরুষ শুধু অধ্যক্ষ বা দ্রষ্টা বা ঈক্ষণকারী। মহাপ্রকৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডময় নিয়ত নৃত্যশীলা বা ক্রীড়াপরায়ণা। মহাশক্তির বাসস্থান শ্মশান। শ্মশান বলিতে শবের শয়নস্থান। কর্ম্মফল-ভোগান্তে জীবের শেষ বিশ্রামস্থান শ্মশান। সেই শ্মশানে কালী বাস করেন। কল্পান্তে তাঁহার আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম পায়। আমাদের প্রাত্যহিক প্রলয়ে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালেও আমরা যোগনিদ্রারূপিণী ঐ কালিকার স্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে শান্তিলাভ করি। ব্যাধি, সন্তাপ, বিরহ, বেদনা, উদ্বেগ সর্ব্বতোভাবে মুছাইয়া দেন ঐ শ্মশানবাসিনী জননী কালিকা। জননীকে বলা হইয়াছে ভীষণবদনা—

"করালবদনাং ঘোরাং"—বিকট করালদংষ্ট্রাসমন্বিতা। দেখিলেই মহাভীতির উদয় হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে—"সুখ-প্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্"—সুখাতিশয্য হেতু সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডল। মুখপদ্মে মৃদুহাসি শোভমান।

একই কালে বিরুদ্ধতার নিরুপম সমাবেশ। আসুরিক শক্তির সহিত যুদ্ধের সময়—"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা"—এক অনির্ব্বচনীয় ভাব। কালিকারূপিণী এই মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় নর-নারীর পরমা জননী। ইনি প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালয়িত্রী। ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট—জীবেশ্বরের এই সম্বন্ধই পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে পাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরে পিতৃস্বরূপের ভাবও জানাইয়াছে। একমাত্র হিন্দু ঋষি ঈশ্বরে পরম মাতৃত্বের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। পিতা অপেক্ষা মাতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ নিবিড়তর। মাতৃ-সম্বোধন অধিকতর প্রাণস্পর্শী এবং সান্ত্বনাদায়ক। ক্রীড়াক্লান্ত শিশু মাতৃবক্ষে আরাম ও বিশ্রান্তি লাভ করে। আর্যঋষি পরমকারণকে কেবল মা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—বিশ্বের সর্ব্বভূতে এ মাতৃত্বের প্রকাশ দেখিয়াছেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"। মায়ের মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিসম্পাত করিয়া ভক্ত সাধক দেখেন বজ্রকঠোর পুষ্পকোমল শাসন, গর্জন, পালন, পোষণ—অতি সৌম্য, অতি রৌদ্র ব্রহ্মময়ী শক্তির এক করুণাস্নিগ্ধ বিরাট মাতৃত্ব। ইহাকেই অর্চ্চনা করি। ইঁহারই চরণে ক্ষুদ্র আমিত্ব জলাঞ্জলি দিয়া, ইঁহারই ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া হিন্দু ভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করে। সর্ব্বভূতে মাতৃত্বের দর্শনে সাধক কামজিৎ হন। কামের বিনাশে প্রেমের উদয়। প্রেম আসিলে ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়। মানবজাতির ঐক্য দৃঢ়তর হয়। আজ সমাজে

সর্ব্বাধিক প্রয়োজন জাতীয় একতার। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাই প্রার্থনায় কালীমাকে বলিয়াছেন—

"এস মা পাগলা কালী—
লয়ে প্রেমের ডালি—"

অষ্টশক্তি

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"

অনন্ত বিশ্বজগতের মূলে আছেন একটি মহাশক্তি। তাঁহা হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, তাঁহার অঙ্গেই স্থিতি, আবার তাঁহার অঙ্গেই শেষ পরিণতি লাভ। এক হইয়াও তিনি আপনাকে ব্যক্ত করেন নানারূপে। বহুত্বের মধ্য দিয়াই তাঁহার একত্বের বিকাশ।

ভারত-সমর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন এই মহাশক্তির স্তব করিতে। চণ্ডীগ্রন্থ এই মহাশক্তিকেই জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা কহিয়াছেন। স্তবে অর্জ্জুন মহাশক্তিকে কৌমারী, কালী, কপালিনী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি বহু নামে অভিহিতা করিয়াছেন।

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন আপনার আটটি প্রকৃতির কথা। ভূমি, অপ্, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। শকুন্তলা নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে কবি কালিদাস শ্রীশিবের অষ্ট মূর্তির কথা বলিয়াছেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য

ও যজমান। অষ্ট প্রকৃতি ও অষ্ট মূর্তির মধ্যে সাদৃশ্য অনেক। ইহারা জগৎসৃষ্টির উপাদানভূতা।

অর্গলা-স্তোত্র বলিয়াছেন দশটি মূর্তির কথা—জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধা। এই দশরূপে দশদিক্ প্রতিপালন করেন। দেবীকবচ নবদুর্গা নামে নয়টি মূর্ত্তির সন্ধান দিয়াছেন—শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। ইঁহারা সকলে বিশ্বের রক্ষয়িত্রী শক্তি।

চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টশক্তির কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহারা আসিলেন রক্তবীজবধে মা দুর্গাকে সাহায্য করিতে। চণ্ড ও মুণ্ড দুই মহাসুরের পতন হইয়াছে। অসুররাজ রাগিয়া আগুন। আদেশ দিলেন তিনি অগণিত সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া নির্গত হইতে। দুর্গাকে হয় বধ করিতে হইবে, না হয় কেশাকর্ষণে গৃহে আনিতে হইবে।

শত্রুসৈন্য আসিতে দেখিয়া মহাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দিলেন ধনুকে টঙ্কার। বাজাইয়া দিলেন মহাঘণ্টা। সিংহ করিল হুঙ্কার। কালিকাদেবী করিলেন মহাশব্দ। তাহাতে দিঙ্‌মণ্ডল গেল পূর্ণ হইয়া। দেবতারা হইলেন ভীষণ চিন্তিত। রক্তবীজ চলিয়াছেন সেনাপতি হইয়া। ওঁর এক ফোঁটা রক্ত যদি মাটিতে পড়ে প্রতি ফোঁটা হইতে ওঁর মত শক্তিশালী আর একটা রক্তবীজ জন্মাইবে। এমন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ সহজসাধ্য নয়।

উদ্বেগের আধিক্যে দেবতাদের অঙ্গ হইতে বিনির্গত হইলেন তাঁহাদের শক্তিগণ। তাঁহারা মহাদেবীরই শক্তি, ছিলেন তাঁহারা

দেবগণের মধ্যে। দেবগণের মধ্যে থাকাকালেও তাঁহারা মহাদেবী হইতে অভিন্না হইয়া, অখণ্ডরূপে ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা প্রকটিতা হইলেন। মনে হয় যেন পৃথক্ পৃথক্। ইঁহারা কিন্তু বাস্তবে একই স্বরূপ। ইঁহাদের পরম একত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশ হইবে সেই সময়, যে সময় মাতৃকাশক্তিগণ আবার মিশিয়া এক হইয়া যাইবেন মহাদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

অষ্টশক্তি আসিলেন। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, যজ্ঞবারাহী, নারসিংহী ও চণ্ডিকা। প্রথমোক্ত সাত মূর্তি আসিলেন, অষ্টম চণ্ডিকা দেবী ব্যক্ত হইলেন মহাদেবীর দেহ হইতে। ইনি যেন শক্তিরও শক্তি। ইঁহার অপর নাম অপরাজিতা ও শিবদূতী।

যে দেবতার যে রূপ তাঁহার শক্তিরও সেই রূপ। যে দেবতার যে কার্য, তাঁহার শক্তিরও সেই কার্য্য। অথবা তন্ত্রের দৃষ্টিতে কথাটাকে আরও সত্য করিয়া বলিলে বলিতে হয়—ঐ ঐ শক্তির অন্তঃপ্রবেশে ঐ ঐ দেবতারও ঐ ঐ রূপ কার্য্য হইয়াছে। শক্তি হইতেই তো শক্তিমানের প্রকাশ। বিষ্ণুকে বিষ্ণুত্ব দিয়াছেন যে শক্তি, তিনিই বৈষ্ণবী শক্তি। নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন কিসের বলে? অবশ্যই শক্তির বলে। ঐ শক্তি সেই কালে ছিল নরসিংহে অমূর্ত। আজ মূর্ত হইয়া প্রকটিতা হইলেন নারসিংহীরূপে। বরাহ দন্তাগ্রে ধরণী তুলিয়াছেন যে শক্তির বলে তিনিই বারাহী শক্তি। তখন ছিলেন বরাহের অন্তরে অমূর্ত। আজ মূর্তি ধরিয়া আসিলেন রণক্ষেত্রে মহাদেবীর সহায়ক হইতে। অঙ্গীরই অঙ্গ। অঙ্গের কার্য হইল অঙ্গীকে রক্ষা করা: হস্তপদ যেমন করে

দেহকে। শক্তিগণ মূর্ত হইয়া আসিলেন মহাশক্তিকে সেবা করিতে।

শক্তিগণের রূপ, ভূষণ, বাহন ও কার্য সবই শক্তিমানের অনুরূপ। শক্তিমানে ত শক্তিরই প্রকাশ। প্রথমে আসিলেন ব্রহ্মাণী। ইনি ব্রহ্মার মূলীভূত শক্তি। ইনি সৃষ্টিশক্তি, নাদ ও শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী। ইনি আসিলেন হংস-চালিত বিমানে—'হংস' হইলেন 'অহং সঃ', 'সোঽহং' এই ব্রহ্মৈকাত্মজ্ঞানের স্বরূপ। এই জ্ঞানের শিখরেই শব্দব্রহ্ম বিরাজমান। আসিলেন তিনি হাতে লইয়া অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। অক্ষমালায় মন্ত্রশক্তি প্রকাশ আর কমণ্ডলুতে অমৃতবারি। উহা ছিটাইয়া তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন, অভক্তকে নাশ করেন। বস্তুতঃ নাশ কাহাকেও করেন না—অভক্তের অভক্তিকে নাশ করিয়া জ্ঞানে সঞ্জীবিত করেন। ব্রহ্মাণীর পরে আসিলেন মাহেশ্বরী। ইনি মহেশ্বর বা রুদ্রের শক্তি। ইঁহার প্রধান কার্য হইল সংহারাত্মক। শব্দব্রহ্মের পশ্চাতেই ইনি থাকেন। ইনি ধ্বংস করিয়া দিলে শব্দব্রহ্ম সৃজনকর্ম করিবেন। শঙ্করী ভাঙ্গিলে ব্রহ্মাণী গড়েন। একটি কর্মেরই এপিঠ ওপিঠ।

মাহেশ্বরী বৃষভারূঢ়া। করে ত্রিশূল, মস্তকে চন্দ্রকলা। দুই বাহুতে বলয়াকার দুই মহাসর্প। বৃষ ধর্মের প্রতীক। ত্রিশূল ত্রিগুণনাশকারী নির্গুণ-তত্ত্বের জ্ঞানশূল। চন্দ্রকলায় করুণামাখা স্নিগ্ধতার সঙ্কেত। সামরিক নিষ্ঠুরতার মধ্যেও করুণা-ধারা। সর্পদ্বয় অনন্ত ও বাসুকী, আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি। একবার ছাড়িয়া দেন আর একবার টানিয়া তোলেন। মহারাত্রিতে সব অবশ হইয়া তাহাতেই ঘুমায়। ধ্বংস করেন ইনি নিষ্ঠুরভাবে অসুরের আসুরিকতা।

মাহেশ্বরীর পশ্চাতে কৌমারী। দেব-সেনাপতি কুমারের ইনি সমগ্র শক্তি। ইনি ক্ষত্রশক্তির মূর্তি। ক্ষত হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া ক্ষত্র। কোথাও ক্ষত, আঘাত দেখিলে ইনি প্রতিকার না করিয়া ছাড়েন না। ইহার এক বিশেষণ গুহরূপিণী। ইনি গোপন করেন স্বকীয় সৈন্যদল শত্রুর দৃষ্টি হইতে। সুতরাং ইনি যুদ্ধ-কৌশলিনী। ময়ূরবাহনা, শক্তিহস্তা। ময়ূর কামভোগ করে না, রিপুজয়ী। কালসর্প খায়, তাই কালজয়ী। তাহার উপরে স্থিতা দেবী, করেতে ধরেন শক্তি। শক্তি একপ্রকার লৌহনির্মিত বর্শা। দুই পার্শ্বে তীক্ষ্ণ, হস্তক্ষেপ্য। কৌমারী-শক্তি চিরকুমারী, কখনও দেখা দেয় না বার্ধক্য ইঁহার স্বরূপে। ইনি আত্মরক্ষা, সত্যরক্ষা, রণ-নৈপুণ্য ও চিরকৌমার্য্যের প্রকট মূর্তি।

তারপর আসিলেন বৈষ্ণবী-শক্তি। সর্ব-নরের যিনি আশ্রয় সেই নারায়ণের ইনি শক্তি। এই শক্তিবলেই নারায়ণ জগৎ পালন-রক্ষণ করেন। ইনি গরুড়াসনা। চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শৃঙ্গের হাতলযুক্ত এক খড়্গ। যুদ্ধ করিবেন কি না, তাই পদ্মের পরিবর্তে আনিয়াছেন খড়্গ। গরুড় সত্ত্বগুণ-প্রধান, ঊর্দ্ধগতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি ইঁহার দুই বৈশিষ্ট্য। শঙ্খে প্রণবনাদ, চক্রে কর্মপ্রবাহ, গদায় ন্যায়দণ্ড, খড়্গে তত্ত্বজ্ঞান। ইঁহারা জগৎকে স্থিত রাখেন। সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে মন্ত্র-শক্তির উদ্বোধন, জ্ঞানাসি দ্বারা দ্বন্দ্ব ও অনৃতকে ছেদন, একত্ব ও ঋত স্থাপনে জগতের রক্ষা, ও আসুরিকভাবের ভূমিতে সত্য-ধর্ম সংস্থাপনে এই বৈষ্ণবী-শক্তি নিত্য নিরত।

তারপর আসিলেন যজ্ঞবরাহের শক্তি বারাহী। ইনি বরাহরূপিণী। ইনি বসুন্ধরাকে দন্তে তুলিয়াছেন। ইনি যজ্ঞময়ী। ধরণী যখন পাপে

অধোগামী হয়, তখন যজ্ঞই তাহাকে তুলিয়া ধরে। বরাহ হিরণ্যাক্ষ অসুরকে বধ করিয়াছেন। হিরণ্যের প্রতিই যার অক্ষি অর্থাৎ যার লোলুপদৃষ্টি কেবল সুবর্ণের দিকে, সেই ভোগসর্বস্ব জীবনই হিরণ্যাক্ষ। তাহার বিনাশ ঘটে যজ্ঞের মাধ্যমে। ত্যাগ দ্বারাই ভোগের ক্ষয়। তাই বারাহী সিংহবাহিনী। ইঁহার দুই করে গদা ও চক্র, কর্মের চক্র ও ধর্মের গদা ইঁহার সহায়। ইঁহার মস্তকের চারিদিকে জয়লক্ষ্মী-চামরের সুন্দর শোভা।

অতঃপর নারসিংহী শক্তির আগমন। ইহা ঠিক নরসিংহের তুল্য দেহধারিণী। কেশর সঞ্চালনে গগনের নক্ষত্ররাজিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে এই ভীষণা শক্তির আবির্ভাব। দৈত্যরাজ হিরণকশিপুর বধের জন্য ইনি আবির্ভূতা। ইঁহার মূর্তি অর্দ্ধমানবী অর্দ্ধসিংহী। চক্ষু দুইটি তপ্ত লৌহের মত, মুখে চোখে ভীষণ ভ্রূকুটি-ভরা। বিশাল বক্ষ, ক্ষীণকটি, শ্রীবদনে অপূর্ব উজ্জ্বলতা। শরীরের সর্বাংশে চন্দ্রকিরণ-সদৃশ স্নিগ্ধ লোমরাজি বিরাজিত। ইনিই শ্রীহরির রৌদ্র ও বীভৎস রসের মূর্তি। অতঃপর ঐন্দ্রী শক্তির প্রকাশ। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি। যে শক্তিবলে দেবরাজ রাজশক্তি পরিচালনা করেন সেই শক্তি। ইনি সম্রাজ্ঞীর মত তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, দিব্যাভরণভূষিতা, গজবাহনা। গজকুম্ভোপরি উপবিষ্টা, হস্তে রাজদণ্ড-তুল্য বজ্র। ঐন্দ্রী সকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সঙ্গে বিশ্বের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের নিবিড় সম্বন্ধ। ইহার নিয়ন্ত্রণকারিণী শক্তিই ঐন্দ্রী শক্তি। বাহিরে মেঘাদি প্রাকৃতিক শক্তির উপরে, অন্তরে মননাদি শক্তির উপরে ইঁহার অধিকার

ইঁহারা সকলে আসিলেন স্বর্গ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে। আর চণ্ডিকা বহির্গতা হইলেন মহাদেবীর শ্রীঅঙ্গ হইতে। ইঁহার অপর নাম অপরাজিতা। ইনি অতি ভয়ঙ্করী, শতশিবা-বেষ্টিতা। ইনি ভয়ানক-রসের মূর্তি। সাক্ষাৎ শিবকে দূত করিয়াছিলেন বলিয়াই চণ্ডিকার অপর নাম শিবদূতী। ইনি শিবকে কহিয়াছিলেন—"আপনি গর্বিত দানব শুম্ভ-নিশুম্ভকে বলুন ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য করিবে, দেবগণ যজ্ঞের আহুতি ভোগ করিবে—আর তোমরা যদি বাঁচিতে চাও তবে পাতালপুরী প্রস্থান কর—আর এই কথা গ্রাহ্য না করিয়া যদি বলগর্বে যুদ্ধ অভিলাষ কর তাহা হইলে আইস, আমার শৃগালগণ দানবমাংসে তৃপ্তি লাভ করুক।"

চণ্ডিকা মহাকালের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি। গীতায় যিনি "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার প্রকট মূর্তিই চণ্ডিকা। অনন্ত বিশ্বে সকলেই কালাধীন, সুতরাং ইঁহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না— তাই অপরাজিতা নাম। ইঁহার বর্ণ সিন্দূরের মত। ইনি শূল, চক্র, পাশ ও বর্মধারিণী। ইনি শিব ও শবপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা। এত ভয়ঙ্করী হইয়াও ইনি শিবদূতী, কল্যাণময় শিবকে ইনি দূত পাঠান। মহাধ্বংসের মুখেও অনন্ত কল্যাণ অন্তর্নিহিত। ভীষণভাবে বিনাশ করেন, নবীনভাবে বিকাশের জন্য।

এই অষ্টশক্তি আমাদের বিষয়বাসনারূপী রক্তবীজ বিনাশ করিয়া বিশ্বময় মাতৃভাবের উদ্দীপনা বিকশিত করুন।

॥ নবদুর্গা ॥

মা দুর্গার নয়টি নামকরণ করিয়াছেন পিতামহ ব্রহ্মা। . নয়টি নামে নয়টি রূপভেদ ও ভাবভেদ। ইঁহারা দেবীর নয়টি কায়ব্যূহ মূর্তি। নবদুর্গা নামে ইঁহাদের খ্যাতি। সংবাদ পাওয়া যায় ইঁহাদের দেবীকবচ স্তোত্রে ঃ

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শৈলপুত্রী

নবদুর্গার প্রথম নাম শৈলপুত্রী। শৈল অর্থে পর্বত। এখানে শৈল বলিতে হিমাচল-নামক গিরিবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবীকে দুহিতা-রূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন গিরিরাজ হিমালয়। তার ফলস্বরূপ লাভ করেন পুত্রী।

দক্ষরাজের শিবহীন যজ্ঞে যোগবলে দেহত্যাগ করেন সতী, স্বামীর নিন্দা শ্রবণে। মহেশ্বর নাচিয়া বেড়ান উন্মাদের মত সারা বিশ্বে সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া। একান্ন খণ্ডে দেহকে কাটিয়া ফেলেন চক্রদ্বারা বিষ্ণু স্বয়ং। দেহ স্কন্ধে নাই দেখিয়া ভোলানাথ হন তপস্যামগ্ন। শক্তি লাভের জন্য শিবের তপস্যা।

অসুরের অত্যাচারে দেবকুল বিপর্য্যস্ত। বারংবার হারিয়া যান তাঁহারা অসুরের হাতে। ইহার হেতু হইল সেনাপতির অভাব। পরামর্শ দিলেন ব্রহ্মা দেবতাদের, দেবসৈন্যের যোগ্য সেনাপতি হইবে সেই কুমার, যে জন্মিবে হর-গৌরীর মিলনে। আকুল প্রার্থনা করেন দেবতারা মা দুর্গার পাদপদ্মে, পুনর্বার ধরণীতে আবির্ভূতা হইবার জন্য। তাই আসিলেন দেবী শৈলপুত্রী হইয়া। তাহাতে ফল হইল তিনটি। দেবতার কার্য্যসাধন, হিমালয়ের বাঞ্ছাপূরণ ও শিবের তপস্যার পরিপূর্ত্তি।

ব্রহ্মচারিণী

শৈলপুত্রীর অপর নাম উমা, হৈমবতী। ইনি ব্রহ্মচারিণী। "ব্রহ্ম চারয়িতুং শীলমস্যাঃ।" ব্রহ্মজ্ঞানদান, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করানো যার স্বভাব। দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান ইনি ব্রহ্মচারিণীরূপে। কাহিনীটি শুনাইয়াছেন উপনিষদ্।

দেবাসুরের সংগ্রাম লাগিয়াই আছে—শতবর্ষ ধরিয়া, জীবন ভরিয়া। একবার যুদ্ধে জয় হয় দেবতাদের। ইহাতে খুব গর্ব্ব অনুভব করেন দেবতারা। গর্ব্বের বোধ করেন তাঁরা দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে। 'এবার জয়ের কৃতিত্ব আমারই' মনে মনে ভাবেন অগ্নি, বায়ু ও আর সব দেবতারাই। হইলে কি হইবে দেবতা, গর্ব্বে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন সকল জয়ের উৎস যিনি তাঁহাকেই। মূল কর্ত্তাকে ভুলিলেই আসিবে কর্ত্তৃত্বাভিমান, অহংকার। অহংকারে বিমূঢ় ব্যক্তিই ভাবে আমি কর্ত্তা। এ বাণী আছে গীতাতেও।

একদিন সমবেত হইয়া বসিয়াছেন দেবতারা এক স্থানে। প্রত্যেকেই করিতেছেন আত্মম্ভরিতা। তখন অদূরে দেখিলেন তাঁহারা এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। ইন্দ্র অগ্নিকে আদেশ করিলেন "যাও তো অগ্নি, জানিয়া এসো, ঐ জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটি কি বা কে ?"

"আপনি কে ?" নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অগ্নি। উত্তরের পরিবর্ত্তে আসিল প্রতিজিজ্ঞাসা "আপনি কে ?" "অগ্নি আমি" উত্তর করিলেন অগ্নি। "কী কার্য্য করিতে পারেন আপনি ?" প্রশ্ন করিলেন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা। "ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারি আমি", গর্ব্বিত কণ্ঠে জবাব দিলেন জাতবেদা।

"বটে ! তবে দগ্ধ কর তো এই তৃণগাছি।" অগ্নির সম্মুখে একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ রাখিয়া এই কথা বলিলেন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন বহ্নিদেবতা। কিন্তু কী আশ্চর্য্য ! সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সক্ষম হইলেন না তুচ্ছ তৃণখণ্ড দগ্ধীভূত করিতে। ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেন অহংকারী অগ্নিদেবতা।

অগ্নি ফিরিলেন না দেখিয়া বায়ুকে আদেশ করিলেন দেবরাজ জ্যোতির্ম্ময় দেবতার পরিচয় জানিতে। চলিলেন পবনদেব। "আপনি কে ?" পবনের প্রশ্নে প্রতি-প্রশ্ন আসিল, "আপনি কে ?" "বায়ু দেবতা আমি", উত্তর দিলেন বায়ু। "কী করিতে পারেন আপনি ?" গম্ভীর কণ্ঠে সুধাইলেন জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ। "যা কিছু আছে বিশ্বে উড়াইয়া ফেলিতে পারি সব", গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে উত্তর দেন সদাগতি। "বটে ! তবে এই তৃণগাছি উড়াও তো", বলিয়া একগাছি তৃণ রাখিলেন বায়ু-দেবতার সমীপে সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্তি।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন পবনদেব। প্রয়োগ করিলেন সবখানি তাঁহার সামর্থ্য, কিন্তু পারিলেন না একটুও নড়াইতে তৃণ-খণ্ডটিকে। চূর্ণিতগর্ব্ব পবনদেব ভয়ে বিস্ময়ে পলায়নপর হইলেন। দুই বীর পুরুষ রণে ভঙ্গ দিলেন দেখিয়া অগ্রসর হইলেন দেবরাজ স্বয়ং। তাঁর মনে গর্ব্ব, হাতের মুঠোয় ধরিয়া ফেলিবেন জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে। কিন্তু সম্ভব হইল না তাহা কোনমতেই।

জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ অন্তর্হিত হইলেন, দেবরাজ নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেই। হতবাক্ ইন্দ্র চাহিলেন ঊর্দ্ধ দিকে। বিস্ময়ে দেখিলেন ব্রহ্মচারিণী উমা হৈমবতীকে। তিনি তখন কৃপা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন ইন্দ্রকে।

ব্রহ্মচারিণী বুঝাইয়া দিলেন ইন্দ্রকে ব্রহ্মের তত্ত্বটি। সংসারে কাহারো ক্ষমতা নাই কোনও কার্য্য করিতে। সকল শক্তির উৎস পরব্রহ্ম। তিনিই উদিত হইয়াছিলেন গর্ব্বিত দেবতাগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে। ব্রহ্মচারিণী ঐ দেবী মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মজ্ঞান। তাঁহার দর্শনে ও কৃপাবর্ষণে ইন্দ্রের হইয়াছিল সত্যস্বরূপ ব্রহ্মানুভূতি।

চণ্ডঘণ্টা

মহিষাসুর-বধের জন্য প্রকটিতা হন মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী দুর্গাদেবী নিখিল দেবগণের অঙ্গজ্যোতি অবলম্বনে। দেবীর হাতে অস্ত্রোপহার দিলেন দেবতাগণ নিজ নিজ অস্ত্র হইতে অপর এক একটি অস্ত্র প্রকাশ করিয়া। ঘণ্টা দিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। বুঝি বা যে ব্রহ্মজ্ঞান নিজে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন উহা বিশ্বে বিঘোষণা করিবার জন্য।

ঐ ঘণ্টার মধ্যে গজরাজ ঐরাবতের মহাশক্তি "দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ"। অতি প্রচণ্ড তাই ঐ ঘণ্টার ধ্বনি। পণ্ডিতেরা বলেন ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী। সকল বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির সমষ্টি হইল ঘণ্টা। মহাবিশ্বের মূলে যে শব্দব্রহ্ম বা নাদ-ব্রহ্ম তাহাই ঐ মহাঘণ্টার ধ্বনি হইতেই উদ্ভূত। যখন সাধনপথে মায়ের দিকে অগ্রসর হন সাধকেরা, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন দেবীর নিকটবর্ত্তিতা ঐ ঘণ্টারবের মাধ্যমে। যাহারা ভোগাসক্ত তাহারাও মৃত্যুকালে ঐ ধ্বনি শোনে—ভয়ে কাঁপে যমবাহন মহিষের গলঘণ্টা ভাবিয়া। যাহারা মাতৃসেবাসক্ত তাঁহারা শুনেন ধ্বনি মাতৃকরস্থিত ঘণ্টার মঙ্গল আহ্বান-রূপে। উল্লাসে তাঁহারা আনন্দে মাতিয়া উঠেন। ভোগীরা কম্পমান দেহে যায় নিরয়ে, যোগীরা চণ্ডঘণ্টা ধ্বনি অনুসারে ধায় জননীর শান্তিময় অঙ্কে।

কুষ্মাণ্ডা

নবদুর্গার চতুর্থ মূর্ত্তি কুষ্মাণ্ডা। উষ্মা শব্দে বুঝায় তাপ। কুৎসিত তাপের নাম কুষ্মা। এই মরণশীল জগতে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে ত্রিবিধ তাপ। এই দুর্ব্বিষহ ত্রিতাপই কুষ্মা। অণ্ড শব্দে উদর। কুষ্মা বহন করেন যিনি উদরে তিনিই কুষ্মাণ্ডা।

শ্রীকৃষ্ণ পান করিয়াছিলেন দাবানল, ব্রজের ভক্তদের রক্ষার জন্য। জননী উদরস্থ করেন ত্রিতাপ, পদাশ্রিত জনকে শান্তি দিতে। যারা আশ্রয় করে না অভয়ার পদ, তারা প্রতিনিয়ত জ্বলে তাপে।

আর যারা করেন আত্মার্পণ ঐ রাঙা পদে, তাঁদের কু-কাম কালিমা ও তাপত্রয় আপনি উদরস্থ করেন জননী। লাভ করেন তাঁরা পরাশান্তি, মায়ের শান্তিপ্রদ অঙ্কদেশ। কুষ্মাণ্ডা সন্তানতাপহারিণী কল্যাণময়ী জননী।

স্কন্দমাতা

দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম স্কন্দ। ইঁহার জন্মের উপক্রমণিকা শৈলপুত্রীর পরিচয়ে বলা হইয়াছে। দেবতাদের প্রার্থনায় উমারূপে জন্মিয়াছেন মহাদেবী হিমালয়ের ঘরে, মেনকাদেবীর গর্ভে। উমা যখন কৈশোরে পা দিয়াছেন তখন একদা দেবতাদের পরামর্শে কামদেব গেলেন শিবের ধ্যান ভাঙ্গিতে। ফুলের ধনু তুলিতে না তুলিতে মদনদেব ভস্মীভূত হইয়া গেলেন মহারুদ্রের ক্রোধাগ্নিতে। পার্ব্বতী বুঝিলেন নিজের ভুল। বুঝিলেন কামদেবের সহায়তায় শিবকে টলাইবার চেষ্টা নিছক বিড়ম্বনা।

সাধনা চাই শিবকে পাইতে। তপস্যা চাই শিবপ্রিয়া হইতে। মহাতপস্যায় চলিলেন পর্ব্বত-কন্যা। 'উমা, উমা' অর্থাৎ যেওনা, যেওনা বলিয়া স্নেহময়ী মা মেনকা নিষেধ করিলেন কত। তবু গেলেন দেবী সুকঠোর তপশ্চরণে। শ্রেষ্ঠ তপস্বীরা বৃক্ষের গলিত পর্ণ খান, পার্ব্বতী তাহাও ছাড়িলেন—তাই ঋষিরা নাম দিলেন 'অপর্ণা'।

শক্তির ধ্যানে আছেন শিব, আজ শিবের ধ্যানে বসিলেন শক্তি। ধ্যানের ফলে ঘটিল দুজনার মহামিলন। জন্মিলেন কুমার কার্ত্তিকেয়। ইনিই দেব-সেনানায়ক স্কন্দ। স্কন্দের গৌরব তিনি মদনভস্মকারী

পিতা ও অপর্ণা-মাতার সন্তান। দেবীরও গৌরব, স্কন্দ হেন পুত্রের প্রসূতি তিনি। আমাদেরও গৌরব, স্কন্দ আমাদের ভাই, মা আমাদের স্কন্দমাতা।

কাত্যায়নী

সতীর মহাদেহ মহাদেবের স্কন্ধে। তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন বিষ্ণু নিজ সুদর্শন-চক্রে। সারা ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল মহাদেহের একান্নটি অংশ। তাহাতে হইল একান্ন পীঠস্থান। এক এক পীঠস্থানে এক এক মূর্তিতে আছেন মহাদেবী।

বৃন্দাবন এক মহাপীঠ। দেবী বিরাজিতা সেখানে কাত্যায়নীরূপে। কাত্যায়নী দেবীর একটি কার্য্য আছে অনন্যসাধারণ। সেটি হইল সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তিদান। চণ্ডীতে দেবীর সুখদা ও মোক্ষদা দুইটি স্বরূপের কথা সুস্পষ্ট। সুরথ রাজাকে দিলেন সুখ, সমাধি বৈশ্যকে দিলেন মোক্ষ। কাত্যায়নীরূপে দেবী ভক্তিদা।

ভক্তি-ধন অতীব দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ইহা সাধনলব্ধ বস্তু নহে। কোন সাধনাতেই ভক্তি-সম্পত্তি লাভ করা যায় না। উহা একমাত্র কৃপালব্ধ সামগ্রী। কাত্যায়নী-রূপিণী যোগমায়াদেবীর করুণায় উহা লাভ হয়। তবে যাকে তাকে উহা দেন না দেবী। যারা সুখ ও মোক্ষকে একান্ত-ভাবে তুচ্ছ করিতে পারে, কাম্য যাদের আর কিছুই নাই কৃষ্ণ-সেবা ছাড়া, কাত্যায়নী দেবী দান করেন তাদের ভক্তি-প্রেম মহাসম্পদ্।

ব্রজের গোপবালারা এই কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা

করিয়াছিলেন নন্দ-নন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্য। তাঁদের প্রার্থনার মন্ত্র ভাগবতে দৃষ্ট হয়—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

হে দেবি কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে অঘটন-ঘটনসমর্থে! হে অধীশ্বরী! হে ক্রীড়া-রসাভিজ্ঞে! নন্দ-গোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া দেন আপনি। প্রণাম করি আমরা আপনার পাদপদ্মে।

গোপকুমারীগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া দেবী কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন। ফলও পাইয়াছিলেন। কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করা জননীর একটি প্রধান কার্য। এই কার্য প্রধানতঃ কাত্যায়নীরূপিণী মহাদেবীর।

কালরাত্রি

কালরাত্রি দুর্গার একটি স্বরূপ ও নাম। এমন নামের কারণ আছে অবশ্যই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ঐ সূক্তে ফলতঃ পরমাত্মাকেই বলা হইয়াছে রাত্রি। পরব্রহ্মই রাত্রি। ব্রহ্মময়ী মা ঐ রাত্রিরই শক্তি।

রাত্রিতে জীবজগতের বিরতি হয় সর্ব্বকার্য হইতে। বিশ্রাম লাভ করে সকলে। সকল কর্ম্মক্লান্তি যায় ঘুচিয়া। প্রলয় কালে এই রাত্রিরূপিণী মাতার ক্রোড়ে বিলয় ঘটে সর্ব্ব বিশ্বের। মায়ের অঙ্কে বিশ্রাম লয় নিখিল জীবনিবহ। মহাপ্রলয়ের রাত্রিই মহারাত্রি। দেবী এই রাত্রিরূপা। মহারাত্রি হইতে কালরাত্রি গভীরতরা।

মহারাত্রিতে সংসার লয় হয়। কিন্তু পরমপুরুষ মহাবিষ্ণু জাগিয়া থাকেন। কালরাত্রিতে মহাবিষ্ণুও ঘুমাইয়া পড়েন। অনন্তের অনন্ত শয্যা বিস্তার করিয়া নিদ্রিত ভগবান্ কী করেন? চণ্ডী বলেন, যোগনিদ্রাকে ভজন করেন।

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥

এই যোগনিদ্রাই মহাকালিকা বা কালরাত্রি। প্রত্যহ প্রত্যেক মানুষ যাহার কোলে বিশ্রাম লয় দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্তির পর, আবার প্রভাতে উত্থিত হয় যাহার কোল হইতে নূতন উদ্যম লইয়া, তিনি কালরাত্রি দেবীর অংশভূতা কুণ্ডলিনী কালিকা।

বিশ্বকে, বিশ্বজীবকে, বিশ্বনাথ ও কালশক্তিকে যিনি স্তব্ধ করেন তিনি কালরাত্রি দেবী।

মহাগৌরী

দেবাদিদেব একদিন কালরাত্রি দেবীকে করিলেন উপহাস কালো মেয়ে বলিয়া। দেবী অভিমানিনী হইয়া নিযুক্ত হইলেন কঠিন তপস্যায়।

তপস্যা করিয়া নিজের কালো বরণ দিলেন ভর্ত্তাকে। আর নিজে হইলেন গৌরী। শুধু গৌরী নহেন, মহাগৌরী বিদ্যুদ্বর্ণা। দেবাদিদেব হইলেন নারায়ণ ও দেবী হইলেন শ্রীলক্ষ্মী। চরণতলে বসিলেন সেবায়। মহাকালী ছিলেন সন্তানবৎসলা, মহাগৌরী হইলেন স্বামী-সোহাগিনী।

শক্তি-শক্তিমানে অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য। কত রূপে যে কত খেলা খেলেন কে করিবে তার ইয়ত্তা। অবোধ জীব দ্বন্দ্ব করে—তত্ত্বরসিক যারা তাঁরাই তাহা উপভোগ করেন।

সিদ্ধিদাত্রী

সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিদান করেন যিনি সাধককে তিনি সিদ্ধিদাত্রী। পূর্ব্ববর্ত্তী আটটি নামের মধ্যে তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন শ্রীভগবান্—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, তাহাকে সেই ভাবে তুষ্ট করি। এই তুষ্টিকারিণী শক্তি সিদ্ধিদাত্রী জননী।

গীতা বা মহাভারতের উপনিষৎ-পর্ব্বাধ্যায়, আরম্ভ হইয়াছে ভীষ্ম-পর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োবিংশ (২৩) অধ্যায়ের নাম দুর্গাস্তব-পর্ব্বাধ্যায়। অধ্যায়-প্রারম্ভেই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি মা দুর্গার স্তব কর যুদ্ধ জয়ের জন্য। এই স্তবটি এই গ্রন্থের প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে স্তব করিতে আদেশ করিলেন, তিনি সিদ্ধিদাত্রীস্বরূপিণী। অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছিলেন সিদ্ধিদাত্রী জননীরূপে। কেবল দেখা নহে, অন্তরভরা আশিসও দিয়াছিলেন মা সন্তানকে। বিশ্বের সকল জীব, যোগী, ভোগী, ত্যাগী, সাধক, ভক্ত, গৃহী, বনী, তপস্বী এমন কি ব্রহ্মা, শিব পর্যন্ত সাধনরত।

কোনও না কোন কার্য্যে সিদ্ধি তাঁরা পান এই সিদ্ধিদাত্রী দেবীর করুণায়।

সংসারের সকল জীবে মঙ্গলকর কার্য্যে সিদ্ধিদাত্রী দান করেন পূর্ণসিদ্ধি। সুরথ চাহিয়াছেন সুখ, সমাধি চাহিয়াছেন মোক্ষ, গোপীরা চাহিয়াছেন পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চাহিয়াছেন প্রেম-সুধা, জগজ্জীবকে বিতরণের তরে। মাকেই বলিয়াছেন বিতরণের ভার নিতে—এ অদ্ভুত প্রার্থনা—

"এস হে পাগলা কালী
লয়ে প্রেমের ডালি।"

নবপত্রিকা

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের ইহা একটি মূলমন্ত্র। সর্বভূতে আছেন মহাশক্তি মাতৃরূপে; 'সর্বভূতে' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবল যে তোমার আমার মায়ের মধ্যেই মাতৃরূপে আছেন তাহা নহে, সর্বভূতেই মাতৃরূপে আছেন। বৃক্ষ-লতা, পশুপাখী, স্থাবর-জঙ্গম সকল বস্তুতেই মাতৃরূপিণী বিরাজমানা আছেন। নবপত্রিকার কতিপয় বৃক্ষের চারাগাছের মধ্যে মাতৃত্বের দর্শন, আর্যঋষিগণের গভীর দার্শনিকতার নিদর্শন।

নবপত্রিকা বলিতে নয়টি গাছের চারা বুঝায়। সমষ্টিগতভাবে ইহারা মহাশক্তি মা দুর্গার প্রতিনিধি। শারদীয়া পূজার সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান এই নয়টি গাছের চারাকে শ্বেত অপরাজিতা লতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া কলা-বৌ সাজাইয়া পূজা করা হয়। মা দুর্গার প্রতিভূ-স্বরূপ-ইহাদের অর্চনা—

রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা॥

প্রত্যেকটি চারার এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। কদলীতে আছেন অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ব্রাহ্মণী, কচুতে কালিকা, হরিদ্রাতে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিকী, বেলের অধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা; অশোকের দেবী শোকরহিতা, মানের চামুণ্ডা ও ধানের লক্ষ্মী। ইঁহারা প্রত্যেকেই ভগবতী দুর্গার বিভিন্ন মূর্তি। সমষ্টিগতভাবে ইঁহাদিগকে

নবহুর্গা বলে। দেবীকবচে অপর এক নবহুর্গার কথা আছে। সেই নবহুর্গার নাম ও কার্য প্রায় এক রূপ।

ব্রহ্মাণী কদলীকাণ্ডে দাড়িমে রক্তদন্তিকা।
ধান্যে লক্ষ্মীর্হরিদ্রায়াং দুর্গা মানবপত্রকে।
চামুণ্ডা, কালিকা কচ্চ্যাং শিবা বিল্বে প্রতিষ্ঠিতা।
অশোকে শোকরহিতা জয়ন্ত্যাং কার্ত্তিকী স্মৃতা॥

একই বীজে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে ইঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ অর্চনা করিতে হয়। রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণীকে বলিতে হইবে—

দেবি! তুমি কদলী বৃক্ষে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছ। মূলে তুমি বিষ্ণুবক্ষো-বিলাসিনী। বিষ্ণু পালিনী-শক্তির মূল। বিষ্ণুর বক্ষে যে পালিনী শক্তি সেই শক্তি রহিয়াছে কদলীবৃক্ষে। নবপত্রিকারূপে বিরাজমানা আছ তুমি। তুমি চণ্ডনায়িকা, তুমি দুর্গাদেবী। তুমি পূজার সমীপস্থ হও। কদলীরূপে সর্ব্বত্র শান্তি বিধান কর (রম্ভা-রূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে)।

দাড়িম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকাকে বলিতে হয়—হে মাতঃ, তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি পক্ক দাড়িম্বের বীজের মত সুন্দর। এই জগজ্জীবের অঘ এবং ক্ষুধা বিনাশ করিবার জন্যই তুমি প্রকাশিত হইয়াছ (অঘনাশায় ক্ষুন্নাশায়)। যুদ্ধকালে তুমি রক্তবীজের সম্মুখে উমার কার্য্য করিয়াছিলে (রক্তবীজস্য সম্মুখে উমাকার্যং কৃতম্)। প্রসন্না হইয়া আমাদের বরদায়িনী হও।

ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে নমস্কার করিয়া বলিতে হয়—ধান্যরূপে দেবি, জগতের মঙ্গলের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ব্রহ্মা (জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা)। তুমি দেবী উমার প্রীতিদায়িকা।

আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর (রক্ষ মাং সদা)। দেবি লক্ষ্মি, তোমার চরণে প্রণত হই।

হরিদ্রা বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। স্তব করিয়া তাঁহাকে ভক্ত বলেন, হে হরিদ্রে, তুমি শঙ্করপ্রিয়ে। তুমিই রুদ্ররূপে, শ্রীরূপে সর্ব্ববিধ শান্তি বিধান কর (সর্বশান্তিং প্রযচ্ছ মে)।

মানবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডাকে বলিতে হয়—দেবি, মান্য বৃক্ষগণের মধ্যে তুমি সুরাসুরকর্তৃক মাননীয়া (মান্যেষু বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ সুরাসুরৈঃ)। তোমাতে যে চামুণ্ডা দেবী বিরাজমানা তাঁহাকে আমরা স্নান করাইতেছি। আমাদিগকে মান দাও (মানং দেহি)। মানপত্র শচীদেবীর প্রিয়। পত্রে তিনি বাস করেন। কৃপা করিয়া আমাদের পূজা লও। দেবি চামুণ্ডে, তোমাকে প্রণাম করি।

কচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকাকে বলিতে হয়—দেবী কালিকে, তুমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী উদ্ভিদ্‌রূপে স্থিতা। তুমি স্নানের দ্বারা নির্ম্মল হও। দুর্গারূপে সর্ব্বত্র বিজয় কর তুমি। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে তুমি কচ্চী হইয়া সাহায্য করিয়াছ (মহিষাসুরযুদ্ধে ত্বং কচ্চীভূতাসি সুব্রতে)। আজ তুমি আসিয়াছ, হে হরপ্রিয়ে, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াই আসিয়াছ (মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে)।

বিল্ববৃক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে হয়—হে বিল্ব, তুমি শ্রীফল, তুমি সৌন্দর্যের নিকেতনস্বরূপ, তুমি সর্ব্বদা বিজয় বর্ধন করিয়া থাক (সদা বিজয়বর্ধন)। হে বিল্ব, তুমি মহাদেব, বাসুদেব ও উমা ইঁহাদের প্রিয়কর। হে বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা দেবি, তোমাকে নমস্কার করি।

অশোকাধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতাকে স্তব করিতে হয়,—তুমি

আমাদের হৃদয়ে স্থির হও (স্থিরা ভব)। তুমি শিবদুর্গার প্রীতিকর। তুমি আমাকে সর্ব্বদা শোকরহিত কর (' অশোকং সদা কুরু)।

জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্ত্তিকী-কে বলিতে হয়—হে জগতের জয়দাত্রি, তুমি আমার গৃহে জয় দাও (জয়ং দেহি গৃহে মম)। নিশুম্ভ-শুম্ভবিনাশকারিণী তুমি (নিশুম্ভ-শুম্ভমথনে), হে দেবি কার্ত্তিকে, বরদায়িনী হও (বরদা ভব)।

মন্ত্রের মধ্যের সকল কথার তাৎপর্যানুশীলন করা কঠিন। মহিষাসুর-যুদ্ধে কালিকাদেবী কচু হইয়া সহায়তা করিয়াছেন। রক্তবীজের যুদ্ধকালে রক্তদন্তিকা উমার কার্য্য করিয়াছিলেন—এই সকল কথার অর্থ নির্ণয় করা সুকঠিন। দেবী নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহের ঘনীভূত মূর্ত্তি। অসুর-সঙ্গে যুদ্ধকালে উদ্ভিদ্‌গণ, তরুলতাগণ কে কিভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণই জানেন।

উদ্ভিদ্‌জগতে মাতৃরূপে থাকিয়া দেবী আমাদিগের নিত্য জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের সহায়ক হন। নবপত্রিকা উদ্ভিদ্ জগতের প্রতিনিধি, মা দুর্গার প্রতীক। কোন কোন দেশে কেবলমাত্র এই প্রতীকেই অর্চ্চনা হয়। নিখিল বিশ্বের উদ্ভিদে মহামাতৃকারূপে স্থিতা জগন্মাতাকে নব-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করি—মা! তোমার সেবকের বাহুতে আবার বল দাও।

দশমহাবিদ্যা

বিশ্ব-স্রষ্টাদের যজ্ঞ। বিরাট ব্যাপার। সকল দেবগণ, ঋষিগণ সমুপস্থিত, সভাস্থল পরিপূর্ণ। এমন সময় আসিলেন দক্ষ প্রজাপতি। অভিবাদন করিলেন তাঁহাকে সকল দেবতা, মুনি ঋষিগণ সকলেই দাঁড়াইয়া সম্বর্ধনা জানাইলেন। কেবল দাঁড়াইলেন না ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন জন। দক্ষ ভাবিলেন ব্রহ্মা আমার পিতৃদেব, বিষ্ণু ত্রিজগতের পালনকর্ত্তা। ইঁহারা না দাঁড়াইয়া ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু শিব দাঁড়াইল না কেন? সে হইল আমার কন্যা সতীর বর। শ্বশুরকে দেখিয়া জামাতা সম্মান করিবে না? কুপিত হইলেন দক্ষ প্রজাপতি, নিজেকে অসম্মানিত মনে করিয়া শিবকে নিন্দা করিলেন ক্রুদ্ধ হইয়া। কিন্তু হীন ক্রোধ তাহাতেও দূর হইল না।

গৃহে ফিরিয়া এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিলেন দক্ষ প্রজাপতি। ত্রিলোকের সকলের নিমন্ত্রণ হইল, বাকী রহিলেন শুধু শিব আর সতী। বাপের বাড়ী যজ্ঞের কথা শুনিয়া সতী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যাইবার জন্য। শিব নিষেধ করিলেন। শিব বলিলেন 'বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও যাওয়া উচিত নয়।' সতী বলিলেন 'বাপের বাড়ী যাইতে মেয়ের আবার নিমন্ত্রণ কি? তুমি না হয় না গেলে।' মহাদেব এ যুক্তি মানিলেন না। তিনি সতীকে পিত্রালয় যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন।

সতী প্রথমে দুঃখিতা হইয়া কাঁদিলেন। তারপর ক্রোধে হইলেন অগ্নিমূর্ত্তি। ভয়ানকভাবে অট্টহাস্য করিলেন। ভীষণা মূর্ত্তি দেখিয়া

দেবদেব মহাভীত হইয়া পলায়নপর হইলেন। কিন্তু পলাইবেন কোন দিকে? দেববর যেদিকে পলায়ন করিতে যান, সেই দিকেই এক এক অভিনবা ভীষণা মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ান দেবী। দশদিকে দশ-মূর্ত্তি। শিব দিশাহারা, স্তব্ধ। ভীতিবিহ্বল স্বরে কহিলেন শঙ্কর, "তোমরা কাহাবা? আমার সতী কোথায় গেল?"

এক মূর্ত্তি উত্তর করিলেন—"আমি তোমার সতী। এই যে ভীষণা দশমূর্ত্তি, এসকল আমারই বিভিন্ন প্রকাশ। হে শম্ভো, ভয় পাইও না।"

দশদিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্ত্তয়ঃ।
সর্বা মমৈব মা শম্ভো ভয়ং কুরু মহামতে॥

শিব বলিলেন, তুমিই যদি সতী তাহা হইলে এমন কৃষ্ণবর্ণা কেন? এমন ভয়প্রদা কেন? সতী বলিলেন, আমি সতীই, তবে এখন ভৈরবী মূর্তি ধারণ করিয়াছি।

"তোমার সম্মুখভাগে এই দেখ আমিই রহিয়াছি কালী মূর্ত্তিতে। তোমার ঊর্ধ্বদেশে এই যে আমিই আছি মহাকালস্বরূপিণী তারারূপে। তোমার দক্ষিণ দিকে আমি আছি ছিন্নমস্তকা ছিন্নমস্তারূপে। বামে রহিয়াছি ভুবনেশ্বরীরূপে। শত্রুনাশিনী বগলা-রূপে এই দেখ রহিয়াছি তোমার পশ্চাতে। অগ্নিকোণে আছি বিধবারূপিণী ধূমাবতীরূপে। নৈঋ´তকোণে রহিয়াছি ত্রিপুরা-সুন্দরী কমলারূপে। বায়ুকোণে আছি আমি মাতঙ্গীরূপে। ঈশানকোণে আমিই বিদ্যমানা মহেশ্বরী ষোড়শী-রূপে। আর তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি এই আমি ভীমা ভৈরবীরূপে।"

একই বিশ্বজননীর এই দশবিধ মূর্ত্তির নাম দশমহাবিদ্যা। সিদ্ধ-বিদ্যাও বলে। মূলতঃ ইঁহারা সকলেই এক। বিন্দুমাত্র পৃথক্

বোধ করিলে অপরাধ হয়। ইঁহাদের নাম সাধারণতঃ এইভাবে প্রচলিত—"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥ বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

দশমহাবিদ্যার ধ্যান

কালী

মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা শবশিবারূঢ়া ত্রিনেত্রা পরা
কর্ণালম্বিতবাণযুগ্মলসিতা মুণ্ডাবলীমণ্ডিতা।
বামাধোর্দ্ধ্বকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতিবিমুক্তকেশনিচয়া ধ্যেয়া সদা কালিকা॥

তারা

প্রত্যালীঢ়সমর্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃদ্ ঘোরাট্টহাসা পরা
খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা হূংকারবীজোদ্ভবা।
খর্ব্বানীলবিলাসপিঙ্গলজটাজূটোগ্রনাগৈর্যুতা
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্।

ষোড়শী

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥

ভুবনেশ্বরী

সূর্যকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্ ।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাং ভীতিকরীং প্রভজেদ্ভুবনেশ্বরীম্ ॥

ভৈরবী

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্ ।
হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্ ॥

ছিন্নমস্তা

প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং
দিগ্‌বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা ।
নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং
রত্যাসক্তমনোভবোপরি দৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্ ॥

ধূমাবতী

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা ।
বিমুক্তকুন্তলা রূক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা ॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা ।
সূর্পহস্তাতিরূক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা ॥
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা ।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া ॥

বগলামুখী

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর-বৈরিজিহ্বাম্ ॥

কমলা

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈ রাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্ ॥

দশমহাবিদ্যা

কালী মহামেঘবরণা। শবারূঢ়া। খড়্গমুণ্ডবরাভয়ধারিণী চতুর্ভুজা। সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন যিনি, তিনি মহাকাল। সেই মহাকালকেও কলন বা গ্রাস করেন যিনি, তিনি কালিকা।

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥

তারানাম্নী মহাবিদ্যা। জীবকে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ করাইয়া দেন বলিয়া নাম তারা (তারয়তীতি)। ভীষণ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া অপর নাম উগ্রতারা। ইনি নীলবর্ণা, একজটা, ত্রিনয়না, শিবোপরি আরূঢ়া। ইনি বাক্‌শক্তি প্রদান করেন বলিয়া অপর নাম নীলসরস্বতী। ইনি সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী। ইনি ভয়ঙ্করী কিন্তু বরদা।

ষোড়শী মহাবিদ্যা। ইহার অপর নাম শ্রীবিদ্যা। 'শ্রী'দান করেন বলিয়া এই নাম। ইনি রাজরাজেশ্বরী নামেও খ্যাতা। ইনি রক্তবর্ণা,

ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা। ইনি কুঙ্কুমের মত অরুণবর্ণা। ইহার বদনে সতত সংলগ্ন মধুর হাসি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র ও সদাশিব এই পাঁচজন ষোড়শীদেবীর পর্যঙ্কের পাদরূপে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যা। ইনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণা। পাশ, অঙ্কুশ ও বরাভয় শোভিতা। 'ভুবনানাং পালিকা ত্বং', এই হেতু ভুবনেশ্বরী সার্থক নাম। ইনি দ্বিভুজা। এক হস্তে পান-পাত্র, অপর হস্তে রক্ত-পদ্ম (রূপভেদে চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী দেবীও দৃষ্ট হন)। ইনি ত্রিনয়না, রক্ত-পদ্মোপরি আসীনা।

ভৈববী মহাবিদ্যা। ইনি রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা। কালভৈরবের ভার্যা বলিয়া ভৈরবী নামে বিখ্যাতা। ইনি জীবের যমদুঃখ নাশ করেন। চতুর্ভুজা দেবীর দুই কবে জপমালা ও পুঁথি, অপর দুই করে বরাভয় ও মুদ্রা। উদীয়মান সূর্য্যের মত দেবীর দেহকান্তি। ললাটের উপর অর্ধ-চন্দ্র বিরাজিত।

ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা। ইনি কোকনদবরণা দ্বিভুজা, দিগম্বরী, নিজহাতে নিজমুণ্ড কাটিয়া করতলে ধারণ করিয়াছেন। এক হাতে অসি, অপর হাতে নিজমুণ্ড। কণ্ঠ হইতে দিনরাত রুধির উঠিতেছে। এক ধারা নিজ মুখে, অপর-দুই ধারা দুই পার্শ্বস্থ ডাকিনী, বর্ণিনী নামে দুই সখী পান করিতেছেন। বিপরীতভাবে রতিরত কামদেবের উপর ইনি দণ্ডায়মানা। ইনি অস্থিমালাধারিণী। একটি সর্পকে যজ্ঞোপবীত-রূপে ধারণ করিয়াছেন। ইনি মহাভয়ঙ্করী। মস্তক ছিন্ন বলিয়াই ছিন্নমস্তা নামে প্রসিদ্ধা।

ধূমাবতী মহাবিদ্যা। অতি বৃদ্ধা, বিধবা, ধূম্রবর্ণা দেবী। ইনি বিস্তারবদনা ক্ষুধাকাতরা। দ্বিভুজা। এক হস্ত কম্পমান, অপর

হস্তে কুলা। ধূম্রাসুরকে বধ করিয়া নাম ধরিয়াছেন ধূমাবতী। ইঁহার দেহভঙ্গী কুটিল, দৃষ্টিও কুটিল, ইনি ভয়প্রদা রূক্ষা ও কলহপ্রিয়া।

বগলামুখী মহাবিদ্যা। ইনি পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা। ব-কারে বারুণী দেবী, গ-কারে সিদ্ধিদায়িনী, ল-কারে পৃথিবী। ইহাই ইঁহার নামের নির্বচন। ইঁহার এক হস্তে মুদ্‌গর ও অপর হস্তে ইনি অসুরের জিহ্বা টানিয়া ধরিয়াছেন। বগলামুখীর মন্ত্র স্মরণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। পবনের গতিও স্তব্ধ হয়, অগ্নিও শীতল হয়। গর্বিতের গর্ব যায়, ক্ষিতিপতি শঙ্কিত হন।

মাতঙ্গী মহাবিদ্যা। ইনি শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা। ললাট-ফলকে অর্ধচন্দ্রধারিণী। ইনি সদা হাস্যময়ী। ইঁহাকে আরাধনা করিলে শ্রীলাভ হয়। ইনি মতঙ্গাসুর বধ করিয়া নাম ধরিয়াছেন মাতঙ্গী। ইনি অঙ্কুশ, অসি, পাশ ও খেটকধারিণী।

কমলাত্মিকা মহাবিদ্যা। ইনি স্বর্ণবৎ সমুজ্জ্বলা। শ্বেতবর্ণ চারিটি হস্তীশুণ্ডদ্বারা অমৃতপূর্ণ চারিটি স্বর্ণকুম্ভ ধারণ করিয়া কমলা-দেবীকে অভিষেক করিতেছেন। ইঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র। ইনি পদ্মোপরি অবস্থিতা। ইনি বৈকুণ্ঠে কমলা, পাতালে লক্ষ্মীরূপা। ইনি কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও ষড়্‌ভুজা, কখনও বা অষ্টভুজারূপে বিদ্যমানা আছেন।

কামরূপ-কামাখ্যায় দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। এই দশমূর্তি মূলতঃ একই। ইঁহাদের মধ্যে যাহার মনে ভেদবুদ্ধি থাকে সে নরকাগ্নিতে পচিবে। সম্পূর্ণভাবে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। লীলাভেদে বিভিন্ন-রূপ ধারণ করিলেও তত্ত্বতঃ ইঁহারা এক এবং

অভিন্ন, এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই সাধক সিদ্ধিলাভ করেন।

অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাধয়েন্নরঃ।
ত্রিলোকে স তু সম্পূজ্যঃ স্যাৎ তারাসুত এব সঃ॥

দশমহাবিদ্যার নাম উচ্চারণে সর্ব পাপ দূরীভূত হয়। ইঁহাদের স্মরণে জীব ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

একোচ্চারণমাত্রেণ সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তুতি-চতুষ্টয়

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত তেরটি (৮১ হইতে ৯৩তম) অধ্যায়ে দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১৩টি অধ্যায়ে সাত শত মন্ত্র। এই জন্য ইহাকে সপ্তশতী বলা হয়। চণ্ডীতে তিনটী চরিত আছে। প্রথমচরিতে মধুকৈটভ বধ। ব্রহ্মার আরাধনায় যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালী আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণু মধু-কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করেন। মধ্যমচরিতে মহিষাসুর বধ। কোপিত বিষ্ণুর মুখ হইতে তেজ নির্গত হয়। তৎপর অন্যান্য

দেবতার শরীর হইতেও তেজ নির্গত হয়। সেই তেজঃসমষ্টি হইতে মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া মহিষাসুরকে বধ করেন। এই মহালক্ষ্মী দুর্গানামে শরৎকালে অর্চিতা হন। উত্তর-চরিতে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ। দেবী কৌশিকীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন, ইঁহারই নামান্তর মহাসরস্বতী। ইনি ধূম্রলোচন, রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন।

চণ্ডী-গ্রন্থে তিন প্রকারের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঘটনার বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ও স্তবস্তুতি।

এই স্তবস্তুতিগুলির বিষয় এক্ষণে আলোচিত হইতেছে। চণ্ডীগ্রন্থে মোট চারিটি স্তুতি আছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তুতি। এই স্তুতিকে বিশ্বেশ্বরীস্তুতি বলে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণ-কর্ত্তৃক মহিষাসুর-বধানন্তর উল্লাসপূর্ণ এক স্তুতি। ইহাকে মহিষহন্ত্রী-স্তুতি বলা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তুতি—শুম্ভনিশুম্ভ-বধার্থ। ইহাকে দেবীসূক্ত বলা হয়। একাদশ অধ্যায়ে দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তব, শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধানন্তর দেবগণের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক এই স্তুতি। এই স্তুতিকে নারায়ণীস্তোত্র বলে।

গ্রন্থমধ্যে স্তবগুলির অপূর্বতা সর্বাধিক। ইহার মধ্যে তিনটি বিষয় একত্রীভূত হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্ব, ভক্তিরস ও উচ্চ সাহিত্যের উপাদান এই তিনের মিশ্রণে স্তবগুলি পরম প্রসন্ন-গম্ভীর হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মহাশক্তি সম্বন্ধে যে অনুভূতি, স্তবগুলির মধ্যে তাহা পরিস্ফুট। তন্ত্রবিজ্ঞানের দার্শনিকতা জানিতে হইলে স্তবগুলির আলোচনা অপরিহার্য।

বিশ্বেশ্বরী-স্তোত্র

কারণসমুদ্রে মহাবিষ্ণু নিদ্রিত। নাভিকমলে ব্রহ্মা নূতন সৃষ্টির ধ্যানে নিমগ্ন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দুই অসুর ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণুর জাগরণার্থ তাঁহার নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রাকে স্তব করেন।

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভো॥

বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতি ও সংহারকারিণী অনুপমা। ইনি তেজোময় বিষ্ণুর নিদ্রারূপিণী। ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতেছেন। তন্ত্রমতে দেব-শক্তি মন্ত্রের মধ্যে নিদ্রিত থাকেন। দেবতাকে জাগাইতে হইলে মন্ত্র-চৈতন্য করিতে হয়! ব্রহ্মা তাই প্রথমে মন্ত্ররূপিণী দেবীকে স্মরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন—তুমি ত্রিমাত্রারূপে (অ, উ, ম) অবস্থিত অক্ষর। তুমি গুণাতীতা, অর্ধমাত্রা-গণময় ও গুণাতীতের সংযোগভূমি। হে দেবি, তুমি সাবিত্রী—বিশ্বপ্রসবিত্রী গায়ত্রী মন্ত্রে তুমি উৎকৃষ্টা মাতা। তুমি জগৎ সৃষ্টি কর, তুমি পালন কর, অন্তে তোমাতেই জগতের লয় হয়। কর্ত্রীরূপে সৃষ্টি কর—আবার কর্মরূপে তুমি পালিত হও। অধিকরণরূপা তোমাতেই সব বিলীন হয়।

পরমবিদ্যাস্বরূপ তত্ত্বমসি বাক্যের তুমি মূর্ত্তি—তাই তুমি মহাবিদ্যা। সর্বজনমোহিনী বলিয়া তুমি মহামায়া। বিশ্বের যাবতীয় অর্থের অসাধারণ কর্ত্তা—তুমিই মহামেধা। বেদবিদ্যারূপিণী মহাস্মৃতি তুমি। জীবের ভোগেচ্ছারূপ মহামোহ তোমা হইতেই। মহাদেবশক্তিও তুমি (মহাদেবী)। মহা অসুরী শক্তিও তুমি (মহাসুরী)।

রজস্তমো-রূপিণী তুমি আদি প্রকৃতি। যখন তমোগুণের লয়

হয়—সেই মহারাত্রিও তুমি। সর্বসম্পদ্, সর্বেশ্বরী, বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্ষান্তি, ক্ষমারূপে তুমিই বিরাজমানা। খড়্গধারিণী, মুশলধারিণী, নরমুণ্ডধারিণী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, লৌহকণ্টকাকীর্ণ লগুড় (ভূষণ্ডী)-ধারিণী, শঙ্খধারিণী, ধনুর্বাণধারিণী এই বিভিন্ন মূর্ত্তি তোমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। ঐহিকসুখদাত্রীরূপে তুমি সৌম্যা, স্বর্গসুখদাত্রীরূপে তুমি সৌম্যতরা। মোক্ষসুখদাত্রীরূপে তুমি অশেষ সৌম্যতমা পরমাসুন্দরী। হে সর্ব্বময়ি, যে কোন স্থানে যাহা কিছু উত্তম ও মধ্যম বস্তু আছে—সেই সকলের তুমিই শক্তি। সুতরাং তোমাকে কি স্তব করা যায়? জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্ত্তা যে বিষ্ণু—তাহাকেও তুমি নিদ্রায় বশীভূত করিয়াছ। এহেন তোমাকে জগতে কে স্তব করিতে পারে? বিষ্ণুকে, শিবকে ও আমাকে তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ। সুতরাং তোমাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? তথাপি সাধ্যমত কিছু বলিলাম। কৃপাশক্তি বিস্তার করিয়া মধু ও কৈটভ নামক এই দুর্জয় অসুর দুইটিকে মোহিত কর ও জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে জাগরিত করিয়া দেও এবং ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধি দাও।

মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥

এই স্তবে ব্রহ্মা মন্ত্ররূপিণী মহাকালিকা শক্তির তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন—জগৎপ্রভুকে জাগ্রত করিয়া দাও, অসুর দুইটিকে মোহিত কর ও উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধি দাও। দেবী এই তিনটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছেন।

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে পরমপুরুষ নিদ্রিত আছেন। মহামায়ার কৃপায়

তিনি জাগ্রত হইলে রজস্তমোগুণরূপী অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয় এবং পরম-কল্যাণের পথ খুলিয়া যায়।

মহিষহন্ত্রী-স্তুতি

মহিষহন্ত্রী-স্তুতি চণ্ডীগ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে মহিষাসুর-বধের পর আনন্দোৎফুল্ল ও কৃতজ্ঞ দেবতাগণের স্তব। স্তবে সাতাশটি মন্ত্র আছে। কাব্যাংশে স্তুতিটি নিরুপম। যাহারা স্তব করিতেছেন, তাঁহাদের মনের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা কিভাবে দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে প্রথম মন্ত্রে। দেবতাগণ "প্রণতিনম্রশিরোধরাংসাঃ" এবং 'প্রহর্ষপুলকোদ্‌গমচারুদেহাঃ'। তাঁহারা প্রণতিশীল। তাঁহাদের গ্রীবা ও স্কন্ধ অবনত। আনন্দে তাঁহাদের দেহ রোমাঞ্চিত। পুলকবশতঃ তাঁহাদের দেহের সুকুমারতা যেন অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জগন্মাতার তত্ত্ব ও মহিমা কীর্তন। জননী 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা'—নিখিল দেবগণের তেজ ও শক্তিরাশির সমষ্টিভূতমূর্ত্তি দ্বারা ব্যাপ্তভবনা জগজ্জননী দুর্গা। তিনি নিখিল দেব-মহর্ষিগণের পূজাস্পদ (অখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং)। মায়ের প্রভার অতুলনীয়। অনন্তদেব শিব ব্রহ্মা কেহই বর্ণনা করিতে পারেন না (ভগবানন্তো ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলম্)।

পুণ্যাত্মার গৃহে তুমি লক্ষ্মীরূপা। পাপীর গৃহে অলক্ষ্মীরূপা। নির্ম্মলমতি ব্যক্তিগণের অন্তরে তুমি বুদ্ধিরূপা। সাধুর চিত্তে শ্রদ্ধারূপা। হে মাতঃ, তোমার রূপ অচিন্ত্য। তোমার বীর্যবত্তা অপরিসীম। তুমি ত্রিগুণময়ী হইয়াও রজ-স্তমো-দোষে লিপ্তা নহ। তুমি হরিহরের অজ্ঞেয়। তুমি অব্যক্তা আদ্যা প্রকৃতি। দেবগণের তৃপ্তি

হেতু স্বাহামন্ত্র তুমিই। পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু স্বধামন্ত্রও তুমিই। ঋগ্‌বেদের ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রও তুমি। যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রও তুমি। সামবেদের গীতময় মন্ত্রও তুমিই। তুমি বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, সর্বদুঃখহন্ত্রী। তুমি দুর্গা—দুর্গমভবসাগরের নৌকা (দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌঃ)। তুমি বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মী। শিবের অর্ধাঙ্গভূতা গৌরী।

তোমার বদনমণ্ডল সুন্দর, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সুনির্মল, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ সুবর্ণ-বর্ণ। 'ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-বিম্বানুকারিকনকোত্তম-কান্তিকান্তম্'। ঐ মুখখানি দেখিয়াও ক্রুদ্ধ মহিষাসুর তোমাকে যে প্রহার করিয়াছিল ইহা অতি আশ্চর্য্য। তুমি যখন কোপযুক্ত হইয়াছিলে তখন তোমার ভ্রূকুটিকুটিল বদনখানি উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল (ভ্রূকুটীকরালমুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি)। সেই কুপিত বদন দেখিয়া মহিষাসুর যে তখনই প্রাণত্যাগ করে নাই—ইহাও অতি আশ্চর্য্য। কালান্তক যম দর্শন করিয়াও কি প্রাণ ধারণ করা যায় (কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন)? তুমি কি পারিতে না একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই সকল অসুরকে ভস্মীভূত করিতে? অবশ্যই পারিতে। তবে যে তাহাদের প্রতি এত অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ তাহার অবশ্যই গূঢ় কারণ আছে।

তোমার স্নেহ শত্রুদের উপরও অপরিসীম। শত্রু হইলেও অসুরগণ তোমার সন্তান। তাহারা শস্ত্রস্পর্শে পবিত্র হইয়া (শস্ত্রপূতাঃ) উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক, এইরূপ তাহাদের সম্বন্ধে তোমার অন্তরে শুভেচ্ছা সততই বিরাজমান। তোমার অস্ত্র-শস্ত্রের উজ্জ্বলতা, শূলের অগ্রভাগের চাকচিক্য দেখিয়াও অসুরগণের দৃষ্টিশক্তি যে নষ্ট হয় নাই তাহার কারণ, ঐ সময় তাহারা তোমার কারুণ্যপূর্ণ বদনখানিও দেখিতেছিল

যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নিষ্ঠুরতা ভীষণ। কিন্তু ঐ সময় তোমার চিত্তে কৃপার প্রবাহও অগাধ (চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা), এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব মিলন। একই সময়ে একাধারে নিষ্ঠুরতা ও স্নেহপরায়ণতা একমাত্র তোমাতেই সম্ভব।

তুমি অসুর নাশ করিয়া আমাদের ভয় দূর করিয়াছ, ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছ, আবার যাহাদিগকে নাশ করিয়াছ তাহাদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়াছ (নীতা দিবং রিপুগণাঃ)। অদ্ভুত তোমার কর্ম, তোমাকে নমস্কার। খড়্গ, শূল, গদা—এই সমস্ত অস্ত্র তোমার করপল্লবে বিরাজমান। তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। বেগে ত্রিশূল ঘুরাইয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকের অমঙ্গল নাশ কর। তোমার যত সৌম্য রূপ (সৌম্যানি যানি রূপাণি) ও যত ভয়ঙ্কর মূর্তি (অত্যর্থঘোরাণি) তাহার দ্বারা আমাদিগের ও পৃথিবীবাসী সকলের কল্যাণ বিধান কর।

জগজ্জননীকে সম্মুখে দর্শন করিতে করিতে দেবতাগণ এই স্তুতি করেন। বর্ণনার চমৎকারিতা ও দার্শনিক গভীরতার মিলনে এই স্তুতিটি পরম উপাদেয়। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবী দেবতাগণকে বর দিতে চাহিলেন। দেবগণ বলিলেন, যখন স্মরণ করিব তখনই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিও (সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ)। দেবতারা আরও একটি বর চাহিলেন—যাহারা এই স্তব দ্বারা তোমাকে স্তুতি করিবে, তাহাদের প্রতিও প্রসন্না থাকিও। "তাহাই হইবে" বলিয়া জগজ্জননী অন্তর্হিতা হইলেন।

দেবীসূক্ত (বিষ্ণুমায়া-স্তুতি)

শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাগণ হিমালয়ের

পাদদেশে উপস্থিত হইয়া মহাদেবীকে স্তব করিয়াছিলেন। তন্ত্রমতে এই স্তবটিকে দেবীসূক্ত বলা হয়। মূল গ্রন্থে বিষ্ণুমায়াকে স্তব করিলেন এইরূপে উক্তি আছে (বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ)। এই স্তবটি চণ্ডীগ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে অবস্থিত। এই স্তবে জগন্মাতা সম্মুখে নাই। তাঁহাকে সম্মুখে প্রকটিত করাইবার জন্যই এই আহ্বান। স্তোত্রটি প্রণতি প্রধান। দেবতাগণ পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া জগন্মাতাকে আহ্বান করিতেছেন। ভগবদ্গীতার 'মাং নমস্কুরু' উপদেশের একটি যেন অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত এই স্তবটি।

দেবীকে প্রণাম. মহাদেবীকে প্রণাম, শিবশক্তিকে, মহাপ্রকৃতিকে, মহাকল্যাণকারিণীকে প্রণাম। জ্যোৎস্নারূপিণী সুখকারিণীকে প্রণাম। যিনি কল্যাণ, যিনি বুদ্ধি ও সিদ্ধি, যিনি রাক্ষসদের শক্তি, রাজাদের লক্ষ্মী, যিনি সর্ব্বাণী, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি দুর্গা, দুর্গমে পার করিয়া থাকেন, যিনি সকলের সার ও সকলই করিতে পারেন, যিনি জ্ঞানরূপা, কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা তাঁহাকে নমস্কার। যিনি অতি স্নেহময়ী ও অতি ভয়ঙ্করী (অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ), তাঁহাকে প্রণাম। যিনি জগতের স্থিতিকারিণী ক্রিয়ারূপা—মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি।

যিনি সকল পদার্থে বিষ্ণুমায়া বলিয়া কথিতা, যিনি সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম করি। দেহদ্বারা, বাক্যদ্বারা, মন দ্বারা তিনবার তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণারূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে ও ভ্রান্তিরূপে বিরাজমানা

তাঁহাকে আমরা কায়মনোবাক্যে তিনবার প্রণাম করি—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি সমগ্র প্রাণের ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সর্ব্বভূতে সতত দীপ্তিশালিনী, যিনি জীবাত্মরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই বিশ্বজননীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। পূর্ব্বে বিপদের দিনে আমরা অভীষ্ট লাভের জন্য যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলাম, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমরা স্মরণ করিলেই তৎক্ষণাৎ সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন—সেই মহেশ্বরীকে আজ আমরা শত শত প্রণাম করিয়া আবাহন করিতেছি, দৈত্যগণের উৎপীড়নে অতীব বিপন্ন হইয়া।

স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেবী এক অপূর্ব্বভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। একটি বালিকা যেন স্নানে যাইতেছেন এই ভাবে উপস্থিত হইয়া পার্বতী দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাকে স্তব করিতেছ (ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা)?

তখন এক কল্যাণময়ী দেবী তাঁহারই শরীরকোষ হইতে আবির্ভূতা হইয়া জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন। বলিলেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ইঁহারা আমাকেই স্তব করিতেছেন। কোষ হইতে নির্গতা এই কৌষিকী দেবী তখন অতি মনোহর রূপ ধারণ করিলেন (পরমং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্)। যিনি পার্ব্বতীদেবীর অঙ্গ হইতে নির্গত হইলেন তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন এবং কালিকা নামে খ্যাত হইলেন।

নারায়ণীস্তুতি

মহাদেবী দুর্গা অগণিত সৈন্যসামন্ত সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের বধসাধন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তখন পরমানন্দে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া (বহ্নিপুরোগমাঃ) জগজ্জননীর স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তবটি চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে অবস্থিত। এই স্তবকে নারায়ণী-স্তুতি বলে। ইহাতে চৌত্রিশটি মন্ত্র আছে। ভাব-গাম্ভীর্য্যে ও ভক্তি-মাধুর্য্যে এই স্তোত্রটি অতুলনীয়। হে শরণাগত-দুঃখহারিণি দেবি, প্রসন্না হও নিখিল জগতের তুমি একমাত্র আধারস্বরূপা (আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা)। তুমি রসরূপে সমস্ত বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছ। তুমি অনন্ত বীর্যশালিনী বৈষ্ণবী-শক্তি। তুমি কামরূপা মহামায়া, সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্না হইলে জীব মুক্তি লাভ করে। সমস্ত বিদ্যা তোমারই মূর্ত্তি। সকল নারীতে তোমারই কলাশক্তি—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। তুমি সর্ব্ব-স্বরূপা—প্রকাশরূপা ও মোক্ষদা। তুমি স্তবের পরপারে। তুমি এত উৎকৃষ্ট যে ভাষার সামর্থ্য নাই তাহা প্রকাশ করে (স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ)।

তুমি বুদ্ধিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান কর। কলাকাষ্ঠাদিরূপ ধারণ করিয়া কালস্বরূপে তুমি সর্বক্ষণে সকল পদার্থের পরিণাম ঘটাও। অবশেষে মৃত্যু আনয়ন কর। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকল মঙ্গলজনকের মঙ্গল, সর্বশুভফলপ্রদা, সর্ব্বকার্যার্থসাধিনী। তুমি ত্র্যম্বকা। জননী, দুহিতা ও জায়া এই তিন প্রকারে অম্বা। তুমি গৌরী, চিরবধূ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের সনাতনী শক্তিস্বরূপা; তুমি শরণাগত দীনকাতরগণের পরিত্রাণকারিণী। সর্ব্বজনের সর্ব্বব্যাধি-বিনাশকারিণী।

তুমি হংসযুক্ত বিমানে অবস্থান কর ; তুমি ব্রহ্মাণী। কুশাগ্রদ্বারা কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া তুমি শান্তিবারি বর্ষণ কর (কৌশাম্ভঃক্ষরিকে)। তুমি মাহেশ্বরী। ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্পাভরণ ধারণ করিয়া তুমি মহাবৃষভের উপর আরোহণ কর। আবার তুমি কৌমারী। মহাশক্তি ধারণ করতঃ ময়ূর, কুক্কুটের উপর আরোহণ কর। তুমি শঙ্খ চক্র-গদাপদ্মধারিণী বৈষ্ণবী-শক্তি। তুমি বারাহী-শক্তি, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া মহাপ্রলয়ে জলমগ্না পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার কর ('দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে')। তুমি নারসিংহী-শক্তি, নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ত্রিলোক রক্ষা কর। তুমি কিরীট ও মহাবজ্রধারিণী ঐন্দ্রীশক্তি, তুমি সহস্রলোচন ও বৃত্রাসুরের বধকারিণী। তুমি শিবদূতী। দৈত্যদিগের মহা সৈন্য তুমি বিনাশ করিয়াছ। তোমার রূপ ভয়ঙ্কর, শব্দ ভীষণ। তুমি চামুণ্ডা। বিকট দন্ত হেতু তোমার বদন ভয়ঙ্কর। তুমি মুণ্ডমালা-শোভিতা। চণ্ডমুণ্ড মহাদৈত্যকে তুমি বিনাশ করিয়াছ। তুমি লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও স্বধা-স্বরূপিণী। তুমি মহারাত্রি, মহামায়া, মেধা, সরস্বতী, মহাশক্তি, সত্যস্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী ও সর্ব্বসমষ্টি। হে নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্না হও।

তোমার ত্রিনয়নযুক্ত বদন আমাদের রক্ষা করুক। তোমার ত্রিশূল আমাদের কল্যাণ করুক। তোমার যে ঘণ্টাশব্দদ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া অসুরের তেজ নষ্ট করিয়া থাক, সেই শব্দদ্বারা মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর—'পাপেভ্যো নঃ সুতানিব'। অসুরের রক্তলিপ্ত তোমার খড়্গ আমাদের কল্যাণবিধায়ক হউক।

তুমি তুষ্টা হইলে সকল দুঃখ যায়। তুমি রুষ্টা হইলে সকল অভীষ্ট নষ্ট হয়। তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা সকলের আশ্রয়স্থল হয় (ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি)। আজ বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুমি ধর্ম্ম-বিদ্বেষী অসুরদিগেব যে বধসাধন করিয়াছ তাহা তুমি বিনা আর কে করিতে পারে? এক দিকে তুমি উজ্জ্বল আলো, বিবেকদীপ, অন্য দিকে তুমি মহান্ধকার, মমতাগর্ত। এই দুই দিকেই তুমি জীবগণকে চালাও। তুমি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্ব রক্ষা করিতেছ। তুমি বিশ্বরূপা, তাই বিশ্বকে ধারণ করিতেছ। তুমি বিশ্বেশ্বরের বন্দনীয়া (বিশ্বেশবন্দ্যা)। যাহারা তোমার পাদপদ্মে ভক্তিপ্রণত, তাহারা বিশ্বের আশ্রয়-স্বরূপ (বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ)। হে বিশ্বের ক্লেশহারিণি দেবি! প্রণতদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। ত্রিভুবন-বাসিগণের প্রতি বরদাত্রী হও—("ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব")।

জগজ্জননীকে সম্মুখে রাখিয়া দেবগণ এই স্তব করিলেন। মাতা বলিলেন, আমি বরদাত্রী। জগতের হিতকর (জগতাম্ উপকারকম্) যে বর মনে ইচ্ছা কর, তাহাই দিব। দেবগণ বলিলেন, আমাদের সকলের শত্রু বিনাশ কর, যাহাতে বিশ্বের কল্যাণের পথে সকল বাধা দূরীভুত হয়। মানবকল্যাণের যাহারা বাধা দেয় তাহাদের দুর্বুদ্ধি দূর কর।

পূজাতত্ত্ব

(ক)

মহাশক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। মাতার সহিত

সন্তানের চির সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। মাতা প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাছে আসিতেছেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ লইয়া, আমাদেরই তুষ্টি, পুষ্টি বিধানার্থ তিনি আসিতেছেন। আর দুর্ভাগা সন্তান আমরা এমনই স্মৃতিভ্রষ্ট যে, তাঁহারই দেওয়া ধন ভোগ করিতেছি, তাঁহারই আদরে বর্দ্ধিত হইতেছি অথচ তাঁহাকেই লক্ষ্য করি না।

স্মৃতিভ্রংশরূপ অর্গলে আমাদের হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সহস্রবার মা আসিয়া ফিরিয়া যান, আমরা রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দেই না। এই রুদ্ধ দুয়ারকে খুলিবার যে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত নিরুপম উপায়, তাহারই নাম পূজা। মহাশক্তির সঙ্গে আমাদের বিস্মৃত সম্বন্ধটি পুনঃ স্থাপন প্রসঙ্গে সকল শাস্ত্রকারই কোনও না কোন উপায়ের সন্ধান দিয়াছেন। বৈদিক শাস্ত্র বলিয়াছেন যজ্ঞের কথা, তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন পূজার কথা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক ও তান্ত্রিক সভ্যতা যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তখন সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যজ্ঞ ও পূজা দুই-ই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। দু'য়ের মূল উদ্দেশ্য একই। গৌণ দৃষ্টিতে দু'য়ের উদ্দেশ্য কাম্যবস্তু লাভ। মুখ্য দৃষ্টিতে উভয়ের উদ্দেশ্য মুখ্য বস্তু ব্রহ্মপদ লাভ।

পূজার দুইটি দিক্—একটি বাহিরের দিক্, সেটি বিজ্ঞানধর্ম্মী, অপরটি অন্তরের দিক্, সেটি আত্মধর্ম্মী। বাহিরের দিক্ হইতে পূজা একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থাবিশেষ (scientific technique)। অন্তরের দিক্ হইতে পূজা একটি আত্মধর্ম্মী প্রেমপূর্ণ সমর্পণ বিশেষ। ইহা কেবল মাতৃরূপা মহাশক্তির নিকট পৌঁছাইবার

পথ মাত্র নয়। মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিয়া মাতৃত্বের স্নিগ্ধতার আনন্দে পূর্ণ হওয়াও পূজারই ফল। পূজা নিম্নাধিকারীর জন্য, এই মত তন্ত্র পোষণ করেন না। মায়ের কাছে যাইবার ও তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় পূজা। ইহাতে অনধিকার কাহারও নাই।

পূজার অনুষ্ঠানগুলির মূল বৈজ্ঞানিক। মনে করুন, আপনার গৃহে উৎসবানুষ্ঠান। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় গৃহপ্রাঙ্গণ সজ্জিত। হঠাৎ সকল আলো নিভিয়া গিয়া বাড়ী ঘর আঁধার করিয়া দিল। আপনি পথ চাহিয়া দেখিলেন, রাজপথ ও পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীঘর আলোকে উদ্ভাসিতই আছে।

আপনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে আপনার বাড়ীর সঙ্গে মূলকেন্দ্রের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী ডাকিলেন। তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্ঘণ্ট দিলেন। আপনি আনাইয়া দিলে তাঁহারা দুই দশ মিনিট খাটিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেলেন। পূজা ব্যাপারটিও এইরূপ দুই দুইয়ের যোগে চার হওয়ার মতো।

জগতের সকলেই শক্তিমান্। আপনি শক্তিহীন কেন? তন্ত্রশাস্ত্র উত্তর দিবে—আপনি শক্তির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ হারাইয়াছেন। আবার সম্বন্ধ স্থাপন করুন। উপায় কি? উপায় পূজা। পূজায় কি লাগিবে? পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দিন—তিনি আসিয়া ধান, মান, কলা, কচুর নির্ঘণ্ট দিবেন। যথাযথ দ্রব্যাদি দ্বারা যথাযথ পূজা হউক। শক্তির আলো জ্বলিয়া উঠিবে। মাকে আবার পাইবেন। নিশ্চয়ই পাইবেন, গল্প নহে। শত সহস্র প্রমাণ আছে।

শ্রীগীতায় যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি পরম শ্লোক আছে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ৪।২৪

যজ্ঞের সবই ব্রহ্মময়। অগ্নিও ব্রহ্ম, হবনীয়ও ব্রহ্ম, অর্পণও ব্রহ্ম, হবনক্রিয়ার কর্ত্তাও ব্রহ্ম। জ্ঞানী এই প্রকার সমস্ত ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

পূজা সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ ভাবনা প্রয়োজন। পূজার সকল উপকরণই ঈশ্বরময়। পূজার পূর্ব্বে প্রত্যেকটি উপচারকে শুদ্ধ করতঃ অর্চ্চনা করিয়া ঈশ্বরময় করিয়া লইতে হয়। এমন কি, যে পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা হইবে, তাহাকেও অর্চ্চনা করিতে হয়। পুষ্পকে অর্চ্চনা করিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া ফুলগুলি তাহার অধীশ্বর বিষ্ণুময়, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধিকালে পূজক, পূজ্য-দেবতার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া যায়।

পূজার আন্তর দিকটি হইল সমর্পণের কথা। চন্দনমাখা পুষ্প দেবতার পায়ে সমর্পণ করি। মূলে ওটি অনুরাগমাখা আত্মদান। ওটি দিতে দিতে ক্রমে জীবনটিই পূজাময় হইয়া উঠে। শেষে জীবনের সকল কর্ম্মই তাঁহার পূজায় পরিণত হয়।

'যৎ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।' যে যে কর্ম্ম করি সকলই তোমার আরাধনার্থ। এই পূজার প্রধান উপচার ভক্তি। ভক্তিবশ ভগবান্। ভক্ত ভক্তি করিয়া তাঁহাকে যাহা অর্পণ করে তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণ। ঐ দানে তিনিও সর্ব্বাধিক সুখী। পূজায় আর একটি প্রয়োজনীয় বস্তু, মন্ত্র। মন্ত্রতন্ত্র বিশ্লেষণে তন্ত্রশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের রাজা। মন্ত্র শব্দের অর্থ হইল "মননাৎ ত্রায়তে"—যে বস্তু মনন

করিতে করিতে ত্রাণ পাওয়া যায়। মন্ত্র বলিতে ভগবন্নাম—ভগবদ্‌-বোধক শব্দ। বেদের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী। তন্ত্রশাস্ত্র বহু দেবতার বীজমন্ত্রের দ্রষ্টা। তন্ত্রমতে প্রত্যেকেরই ইষ্টদেবতার বীজ প্রণবতুল্য। প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম। দেবতার মন্ত্রের বাচ্য দেবতা। তত্ত্ববিচারে ব্রহ্ম ও দেবতায় ভেদ নাই। বেদশাস্ত্রে আছে—

"একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"

একই সদ্বস্তুকে পণ্ডিতগণ বহু নামে বলিয়া থাকেন। সুতরাং নিজ ইষ্টমন্ত্র, প্রণবের সঙ্গে অভিন্নই।

মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বস্তু অভিন্ন। চণ্ডী বলিয়াছেন—মাকে লক্ষ্য করিয়াই—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ ১।৭৩

হে নিত্যে, হে অক্ষরে, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্‌কার ও স্বরস্বরূপিণী। তুমি অমৃতরূপা ও ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা। অর্থাৎ তুমি ও প্রণব অভিন্ন।

মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা যে অভিন্ন, ইহার অনুভূতি হয় মন্ত্রের চৈতন্য হইলে। জপ করিতে করিতে মন্ত্রচৈতন্য হয়। তেঁতুল বলিতেই যদি রসনায় জল আসে, তবে বুঝিতে হইবে যে তেঁতুল শব্দের চৈতন্য হইয়াছে। কালিকাব বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতেই যদি নৃমুণ্ডমালিনী বরাভয়করা দেবীর উদয় হয় তবে বুঝিতে হইবে এই বীজের চৈতন্য হইয়াছে।

মন্ত্রাক্ষরের একটি নিজস্ব শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই সে

কার্য্য করে। অভিন্ন যে তৎপ্রতিপাদ্য বস্তু, তাহাকে টানিয়া আনে। এইটি মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক দিক্। আবার ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতাযুক্ত মনপ্রাণ লইয়া মন্ত্র উচ্চারণে মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এটি মন্ত্রের আধ্যাত্মিক দিক্। মন্ত্রের শক্তিও কার্য্য করিবে—জাপকের ভক্তিও কার্য্য করিবে। শক্তি হৃদয়ে জাগিলে, তবে ভক্তিকে জাগাইবে। ভক্তি শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

মেধা ঋষি মাতৃদর্শন লাভের জন্য সুরথ-সমাধিকে পূজাই করিতে বলিয়াছিলেন—

তামুপেহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ ১৩।৪-৫

ঋষির আদেশে সমাধি ও সুরথ রাজা পূজা করিয়া মহাশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভাবে পূজা করিয়াছিলেন উহাই তন্ত্রোক্ত পূজার বিশিষ্টরূপ। তাঁহাদের পূজার কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥

উত্তর চরিত ১৩/৯—১২

অম্বিকার দর্শনের জন্য বৈশ্য নদীপুলিনে গিয়া দেবীসূক্ত জপ করিলেন। নদীর পুলিন তপস্যার অনুকূল স্থান। কোন্ স্থান পূজার যোগ্য সে সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বহু নির্দেশ আছে। বিল্বমূল, তুলসীকানন, দেবায়তন, গুরু-সন্নিধান, যেখানে চিত্তের সহজে একাগ্রতা হয়। এই সব বহু কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নির্জ্জনং পশুবর্জ্জিতম্।"

তৎপরে দেবীসূক্ত জপ করিলেন। দেবীর এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণকে জপ কহে। "জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তিঃ"। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"

তন্ত্রশাস্ত্রও কহিয়াছেন "জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ"। মন্ত্র-জপের পদ্ধতি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তর কথা আছে।

মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্।
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ॥

বৈষয়িক চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া, শুচিভাবে মৌনভাবে মন্ত্রের অর্থ চিন্তাসহ ব্যগ্রতাশূন্য হইয়া, মনে কোন প্রকার দুঃখভাব না রাখিয়া জপ করাই সিদ্ধিলাভের হেতু।

পতঞ্জলিও কহিয়াছেন "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থের ধ্যান করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, প্রথমে ধ্যান তৎপর মন্ত্রজপ করিবে। পরে ধ্যানান্তেও মন্ত্র জপ করিবে—

আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানস্যান্তে পুনর্জপেৎ।
ধ্যানমন্ত্রসমাযুক্তাঃ শীঘ্রং সিধ্যন্তি সাধবঃ ॥

মন্ত্রসঙ্গে মন্ত্রার্থের চিন্তা, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতার ধ্যান, বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধ্যান ও মন্ত্র সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।

তারপর তাঁহারা নদীতীরে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, হোম ও তর্পণ দ্বারা মায়ের পূজা করিয়াছিলেন।

অনেকেই মনে করেন বেদে মূর্ত্তিপূজার কথা নাই। আর্য্য-সমাজীরা খুব জোর করিয়াই একথা বলেন। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবপূজা ভারতীয় দৃষ্টিতে তন্ত্রশাস্ত্রেরই মহাদান।

পূজাতত্ত্ব

(খ)

"কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্"

(শ্রীচণ্ডী ১৩।১০)

মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য। ঋষির আদেশে ও নির্দ্দেশেই তাঁহারা পূজা করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি যে মৃন্ময়ী হইয়াছিল একথা চণ্ডীতে সুস্পষ্ট।

প্রতীক অবলম্বনে ভগবদর্চ্চনা হিন্দু সংস্কৃতিতে তন্ত্র-শাস্ত্রের অতুলনীয় দান। বেদশাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। "ন তস্য প্রতিমা বাস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" ইত্যাদি অনেক বৈদিক উক্তি প্রতিমা অর্চ্চনের অপক্ষপাতী বলিয়া কেহ কেহ মনে

করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বৈদিক মতে "যজ্ঞ", এবং তান্ত্রিক মতে "পূজা"।

যজ্ঞে কোন মূর্ত্তির আবশ্যকতা থাকে না। অগ্নিকে সকল দেবতার মুখ ভাবনায় (অগ্নিমুখা বৈ দেবতাঃ) একমাত্র অগ্নির মাধ্যমেই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-দ্রব্যাদির সমর্পণ চলে। পূজায় কিন্তু প্রতিমা অপরিহার্য্য। ঈশ্বরের সঙ্গে কুটুম্বিতাকে অন্তরঙ্গ ও প্রগাঢ় করিতে হইলে অর্চ্চনাই সর্ব্বাধিক শক্তিশালী একথা ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ আচার্য্যগণেরও অনুমোদিত তথ্য।

কোন কোন আচার্য্য "অরুন্ধতী-ন্যায়" অবলম্বনে প্রতীক পূজার সার্থকতা স্থাপন করেন। আকাশের উত্তর ভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে যে নক্ষত্রমণ্ডল আছে উহার মধ্যে একটি নক্ষত্রের নাম হইল বশিষ্ঠ। ঐ বশিষ্ঠের পার্শ্বে অরুন্ধতী বিদ্যমানা। অরুন্ধতী অত্যন্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্র। তাহাকে চিনাইতে হইলে আগে বশিষ্ঠকে দেখাইতে হয়। বশিষ্ঠ পরিচিত হইলে অরুন্ধতীকে পাওয়া অতি সহজ হইয়া পড়ে। পণ্ডিতেরা ইহাকে "অরুন্ধতী-ন্যায়" বলেন। এই "ন্যায়টির" তাৎপর্য্য হইল, সূক্ষ্মবস্তু সম্বন্ধে অবগতির জন্য স্থূল বস্তুর সাহায্যাপেক্ষা। পরমতম বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার জন্য, স্থূল বস্তুর অপেক্ষা, ইহাকেই বলে প্রতীকোপাসনা। প্রতীক-রূপেই মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজনীয়তা। স্থূলবুদ্ধি প্রবর্ত্তকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর উপায় আর কি হইতে পারে?

ভগবদ্‌বিগ্রহ প্রতীক বটে কিন্তু ইহাই মূর্ত্তি সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। সাধনা-যাত্রার প্রারম্ভে শ্রীমূর্ত্তি প্রতীক হইতে পারে কিন্তু সাধনের পরিণতিতে উহা চিন্ময় সত্তা। প্রতীক-রূপতার চিন্ময়-

রূপত্বে পরিণতি হইলেই. পূজা সার্থক হয়। যিনি একদিন ছিলেন অপরিচিত লোক—তাঁহারই সঙ্গে যেমন বহু মেলামেশার পরে তিনি হইয়া ওঠেন পরম বন্ধু—সেইরূপ প্রতীক-রূপে যে মূর্ত্তির হয় প্রতিষ্ঠা, ভক্তের অর্চ্চনার ফলে তিনিই হইয়া যান চিদ্‌বিগ্রহ—সাক্ষাৎ ভগবান্—আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষায় "অর্চ্চাবতার"।

আচার্য্য রামানুজের নিকট একদা জনৈক মূর্ত্তি-পূজায় আস্থাহীন ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য আপনি ছোট ছোট কতকগুলি পিতলের মূর্ত্তি রাখিয়াছেন কেন?" আচার্য্য বলিলেন, "আমার ধুনী জ্বালাইবার জন্য আগুনের প্রয়োজন, আপনি গ্রাম হইতে আমাকে একটু আগুন আনিয়া দেন, তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।" ঐ লোকটি আগুন লইয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য বলিলেন, "আপনি এক খণ্ড দগ্ধ কাষ্ঠ আনিয়াছেন কেন? যাহা কহিয়াছি ঠিক তাহাই আনুন। আগুন কহিয়াছি, আগুনই আনুন। আগুন সকল বস্তুর মধ্যেই আছে। আপনার হাত ঘসিয়া দেখুন হাতের মধ্যেও আগুন আছে। আপনি আমার জন্য একটু খাঁটি আগুন আনুন—পোড়া কাষ্ঠ চাই না।"

আচার্য্যের কথা শুনিয়া লোকটি উত্তর করিল, "অগ্নি আছে সকল বস্তুর মধ্যেই, কিন্তু আপনার নিকট আনিতে হইলে দগ্ধ-কাষ্ঠ ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না।" তখন আচার্য্য গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সকল বস্তুতে নিহিত অগ্নিকে আমার নিকট আনিতে যেমন দগ্ধকাষ্ঠ আহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় আপনি দেখেন না—আমিও সেইরূপ সর্ব্বভূতস্থ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে আমার

নিকটতম করিয়া আনিতে চাহিলে মূর্ত্তিতে আরোপ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে নাই না। আপনার হাতের কাঠখানি আগে ছিল কাঠ, উহাতে অগ্নি ধরিলে উহা হইয়াছে অগ্নি। আমার নিকটস্থ এই ঠাকুরটি এক সময় ছিলেন পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি, কিন্তু এখন উহা চিন্ময় পরব্রহ্ম, পরব্রহ্মের ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। নারায়ণ যেমন অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন রামরূপে, তিনি আজ আমার দুয়ারে আসিয়াছেন এই অর্চ্চাবতাররূপে।”

আচার্য্যের উক্তিতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। বিগ্রহরূপে ভগবদর্চ্চনা, তন্ত্রশাস্ত্রের এই বিরাট দানকে শাস্ত্রকারগণ ও আচার্য্যগণ মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥
লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

(১১।৩।৪৬-৪৮)

হৃদয়ের গ্রন্থিকে ছেদন করিতে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কেশবকে অর্চ্চনা করিবে। গুরুর নিকট হইতে আগমোক্ত পথ ও তাঁহার কৃপারূপ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া পরে অভীষ্ট মূর্তিতে মহাপুরুষের অর্চনা করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের নববিধ ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনা একটি প্রধান অঙ্গ। নারদপঞ্চরাত্র, নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও পূজা, বিশেষ একটি ভজনাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু

শ্রীগৌরাঙ্গ, সনাতন গোস্বামিপাদকে শিক্ষা দিতে চৌষট্টি-অঙ্গ ভজনের কথা কহিয়াছেন। তন্মধ্যে পাঁচটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। সেই প্রধান পঞ্চাঙ্গের মধ্যে অন্যতম "শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।" বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ ছাড়া ভারতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই পূজাঙ্গের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদী সাধকেরাও চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা আবশ্যক মনে করেন।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠারূঢ়, ব্রহ্মবস্তুও সেইপ্রকার মূর্ত্ত্যারূঢ়। সুতরাং মূর্ত্তি যে কেবল অরুন্ধতী-ন্যায়ে ব্রহ্মবস্তুকে চিনাইয়া দিবার উপায় মাত্র, তাহা নহে। উহাতে উপাস্য বস্তুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি ঘটে। বিগ্রহে বিরাজমান থাকিয়া তিনি ভক্তদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কার্য্যটি সাধন হয় ভক্তের ভক্তি এবং মন্ত্রের শক্তির বলে।

তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন,—গাভীর দুগ্ধ তাহার রক্ত হইতে সমুদ্ভূত। রক্ত গাভীর সর্বাঙ্গেই বিরাজিত। তাই বলিয়া গাভীর যে কোন অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেই দুগ্ধ পাওয়া যায় না। একমাত্র স্তন হইতেই উহা ক্ষরিত হয়। সেইরূপ শ্রীভগবানের উপস্থিতি সর্বত্র সকল সময়ে থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি প্রতিমাতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে হইয়া থাকে।

সুতরাং মূর্ত্তি কেবল দেবতার প্রতিনিধি নহেন। ঐ মুর্ত্তিই দেবতা। পূজার অঙ্গগুলি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে বিগ্রহে দেবতা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভক্তের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেন, ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অষ্টপ্রকার বিগ্রহের কথা কহিয়াছেন।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ (১১।২৭।১২)

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, সুবর্ণাদিময়ী (লৌহী), মৃৎচন্দনাদিময়ী (লেপ্যা), চিত্রপটময়ী (লেখ্যা), বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই আট প্রকারের প্রতিমা হইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মনোময়ী প্রতিমাকেও একপ্রকার প্রতিমা বলা হইয়াছে। চক্ষু নিমীলন করিয়া মানসে যদি তাঁহার মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া অর্চ্চনা করি, তাহা হইলেও প্রতিমা পূজা করা হইল। যাহারা প্রতিমা পূজার বিরোধী, কথাটি তাঁহাদের ভাবিবার মত। মূর্ত্তি (image) ছাড়া মন ভাবিতে পারে না—এই তথ্য বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞান-সম্মত। মনকে সঙ্গে নিলেই সে প্রতিমা তৈয়ারী করিবে। সুতরাং যাহারা প্রতিমা-পূজার বিরোধী তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে হইবে—মনকে বাদ দিয়া। মনকে বাদ দিলে উপাসনা করিবে কে ? মনোভূমির উর্দ্ধে শুদ্ধ চিদ্‌ভূমিতে—যেখানে উপাস্য উপাসক উপাসনা একাকার হইয়া যায়—সেখানে উপাসনাও নাই, প্রতিমাও নাই। কিন্তু উপাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রতিমা চাই-ই।

অনেকে মনে করেন প্রতিমায় দেবার্চ্চনা নিতান্ত অজ্ঞ, অনধিকারী গ্রাম্য নরনারীর জন্য, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য নহে। কিন্তু একথা নিতান্তই অসার। পূজা কার্য্যটি এতই কঠিন যে, মহা মহা পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পূজা সম্পাদনে অক্ষম। পূজার উপচারসমূহের মধ্যে পূজকের মন একটি সর্ব্বপ্রধান বস্তু। মনটিকে তৈয়ারী না করিলে অন্য সকল সম্ভারের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পূজা হইবে না। আর মনটি যদি লুব্ধ ভ্রমরের মত ইষ্টের পাদপদ্মে লাগিয়া যায় তাহা হইলে উপচারহীন

পূজাও কল্যাণদায়ক হয়। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য কিভাবে মাতৃপূজার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীচণ্ডী গ্রন্থ অবলম্বনেই স্মরণ করা যাইতেছে—

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ ১৩।১১

আদৌ যতাহারৌ অল্পাহারৌ ততো নিরাহারৌ। প্রথমতঃ আহার সংযমপূর্ব্বক অল্পাহারী হইয়াছিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে একেবারেই আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আহার বলিতে কেবলমাত্র মুখদ্বারা খাদ্য গ্রহণকেই বুঝায় না, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্ব্বিষয় গ্রহণও আহার পদবাচ্য। সুতরাং বোঝা গেল যে, সুরথ এবং সমাধি পূজকদ্বয় চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জ্জগৎ হইতে রূপ-শব্দাদি গ্রহণ করাও বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ভজনোন্মুখ কোন ব্যক্তিকে লিখিয়াছিলেন—'কায়মনে মনুষ্য-বিষয় গ্রহণ করিও না।' মায়ের পূজকদ্বয় সেইরূপ কায়মনে জাগতিক বিষয় গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

'নিরাহারৌ যতাহারৌ' বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় সংযমের কথা বলিয়া 'তন্মনস্কৌ' পদে অন্তরিন্দ্রিয় মনঃসংযমের কথা বলিতেছেন। একমাত্র জগন্মাতাতেই যাহাদের মন নিবিষ্ট তাঁহারাই তন্মনস্ক। বস্তুতঃ মনটি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টচিন্তায় দিয়া তন্মনস্ক হইতে পারিলেই নিরাহার হওয়া সম্ভব। অন্তর-সংযমই বহিঃসংযমের জনক। অন্তরে ইষ্ট-ধ্যান নাই, অথচ বহিরিন্দ্রিয়সংযম—ইহা কৃত্রিম। গীতাশাস্ত্র উহাকে মিথ্যাচার বলিয়াছেন।

মনটি দেবীর চরণে অর্পণ করিয়া বহিরিন্দ্রিয়গণকে বহির্ব্বিষয় হইতে

বিনিবৃত্ত করিয়া 'সমাহিতৌ' হইয়াছিলেন। 'সমাহিতৌ' পদের অর্থ কেহ বলিয়াছেন "ত্যক্তবাহ্যচেষ্টৌ", তাঁহাদের বাহ্যচেষ্টা ছিল না। কেহ কেহ বলেন, সমাহিতৌ অর্থে গুরূপদিষ্টার্থে সাবধানৌ, নিরস্তসংশয়ৌ, বহুবিঘ্ন-পরিহারপরৌ নিয়মপরায়ণৌ—তাঁহারা ছিলেন গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ে সাবধান সতর্ক, পাছে তাঁহাদের ভজনে কোন প্রকার ছিদ্র থাকে ও ফললাভে বাধা ঘটে। গুরু-বাক্যকে সত্যরূপে গ্রহণ করায় তাঁহাদের চিত্তে কোন সংশয় ছিল না। গীতাশাস্ত্র, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" বলিয়াছেন। চিত্তে সংশয় থাকিলে সকল ভজন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ভজন-পথে যতপ্রকার বিঘ্নবাধা উপস্থিত হউক না কেন তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া ঐ পথে চলিতেই দৃঢ়সংকল্প। যেরূপ নিয়ম করিয়া তাঁহারা প্রত্যহ উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই সব নিয়মের প্রতি তাঁহাদের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কোন কারণেই নিয়ম-শৃঙ্খলার পথ হইতে তাঁহারা ভ্রষ্ট হন নাই। এই সকল কথাই 'সমাহিত' শব্দ দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বোঝা গেল তাঁহারা "শরীরং বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি" এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাতৃপূজার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তাঁহারা মাতাকে উপহার (বলি) দিতেন স্বদেহ-শোণিত দ্বারা অভিসিঞ্চিত করিয়া। "দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্"। তৌ সুরথবৈশ্যৌ নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতং তপশ্চরণকালে পরহিংসা-পরাঙ্মুখত্বাৎ স্বশরীরোদ্ভব-রক্তমেব অন্নময়ং বলিঞ্চ দদতুঃ, তপস্যা আচরণ করিবার কালে পরহিংসা করা অন্যায়, এই হেতু তাঁহারা নিজ গাত্র হইতে রুধির এবং অন্নময় চরু প্রভৃতি দ্রব্য মাতাকে প্রদান করিতেন।

তন্ত্রশাস্ত্রকার বলেন—নিজদেহ হইতে রুধির দিলে দেবী সহস্রগুণ তুষ্ট হন।

"সহস্রং তর্পিতা দেবী স্বদেহ-রুধিরেণবৈ।"

সকল বলির শ্রেষ্ঠ বলি নিজ অহংকার-বলি। স্বদেহ-শোণিত-দান আত্মবলিদানের একটি প্রকৃষ্ট প্রতীক। অহংকার সমর্পণের ওটি স্থূলরূপ।

"বলিদানেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠ আত্মবলিঃ স্মৃতঃ।"

আমাদের অন্তঃকরণরূপ পশুর "চিত্তাহংকৃতি-বুদ্ধিমানসময়ৈঃ" চারি পদ। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই চারি চরণে অন্তঃকরণ-পশু বিচরণ করে। এ পশুকে মায়ের চরণাম্বুজে যে ভক্ত বলিদান করেন, অণিমাদি অখিলসিদ্ধি তাঁহার চরণে লুটাইতে থাকে। ঐ পশু বধ করিবার অস্ত্র হইল বোধরূপ পরশু অর্থাৎ জ্ঞানরূপ কুঠার। এই পশূৎসর্গ ই প্রকৃত বলিদান।

এই ভাবে তাঁহারা তিন বৎসর মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন।

"এবং সমারাধয়তো স্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ"

যতাহার, নিরাহার হইয়া একান্ত মনে সমাহিতচিত্তে নিজদেহজ শোণিতে মায়ের তুষ্টি বিধান করতঃ নিজেকে সর্ব্বতোভাবে মায়ের চরণে সমর্পণ করতঃ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহারা পূজা ও দেবীসূক্ত জপ করিতে লাগিলেন দীর্ঘ তিনটি বৎসর। তারপর—

"পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।" ১৩।১৩

জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা ভক্তদ্বয়ের সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রকটীভূতা হইয়া কথা বলিলেন। মাতাকে তাঁহারা কিরূপ দেখিলেন তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বর্ণনা দিয়াছেন—

স দদর্শ পুরো দেবীং গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্ ।
তেজঃস্বরূপাং পরমাং সগুণাং নির্গুণাং বরাম্ ॥
দৃষ্ট্বা তাং কমনীয়াঞ্চ তেজোমণ্ডলমধ্যতঃ ।
স্বেচ্ছাময়ীং কৃপারূপাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥

গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের মত প্রভাময়ী মাকে তিনি দেখিলেন! মা তেজঃস্বরূপা, পরমা, সগুণা, গুণাতীতা—তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থা অতীব কমনীয়া। মা স্বেচ্ছাময়ী কৃপাঘনমূর্ত্তি, আর ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কাতরস্বভাবা।

যথাযথ পূজাদ্বারা মহাশক্তিরূপিণী মা প্রত্যক্ষা হন---ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পূজাঙ্গকে উপেক্ষা না করিয়া আসুন আমরা সকলে অন্তরে ভক্তিচন্দন ও করে পুষ্পস্তবক লইয়া মাতৃচরণে অঞ্জলি দিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকি----মা! মা।

॥ অকাল-বোধন ॥

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।"

দেবতা ও মানুষ। ইহাদের মধ্যে ভেদ বহুবিধ। তন্মধ্যে একটি হইল দিন ও রাত্রির পরিমাপে। মানুষের দিন বার ঘণ্টায়, রাত্রি বার ঘণ্টায়। দেবতার দিবা ছয় মাস, রাত্রি ছয় মাস। আমাদের মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস এই ছয় মাস দেবতাদের দিন, শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস দেবতাদের রাত্রি। দেবতাদের দিনকে বলে উত্তরায়ণ, রাত্রিকে বলে দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত, দক্ষিণায়নে তাঁহারা নিদ্রিত।

শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নের মধ্যে। দেবী ভগবতী তখন নিদ্রিতা। সেই জন্য তখন তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে দেবীর জাগরণের জন্য বোধন করিতে হয়। বসন্তকাল পড়ে উত্তরায়ণের মধ্যে। তখন দেবী জাগরিতা থাকেন। তাই জন্য বাসন্তী পূজায় বোধনের আবশ্যক হয় না। শারদীয়া পূজা, অকাল পূজা। বাসন্তী পূজা, কাল-বোধিত পূজা। অকাল হইলেও, পূজা বলিতে শারদীয়া মহাপূজাকেই বুঝায়।

মহারাজ সুরথ করিয়াছিলেন বাসন্তী পূজা। শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছিলেন শারদীয়া পূজা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আছে—

পূজিতা সুরথেনাদৌ দেবী দুর্গতিনাশিনী।
মধুমাস-সিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥

আদিতে সুরথ রাজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, চৈত্রমাসে শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রবিধিমতে। সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য দুই জনে একত্র হইয়া এই পূজা করিয়াছিলেন ঋষির আদেশে। ঋষি বলিয়াছিলেন—

তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥ চণ্ডী-১৩।৫

"হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও, যিনি আরাধিতা হইলে, মানুষকে ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন।"

মায়ের অর্চ্চনা করিয়া সুরথ রাজা ভোগ ও স্বর্গ পাইয়াছিলেন, আর সমাধি বৈশ্য, মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বাসন্তী পূজার কাহিনী মূল চণ্ডীতে সংক্ষেপে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে অকাল বোধন করিয়া জগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূজাই জগতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত হয় নাই। দেবীভাগবত ও কালিকাপুরাণে শ্রীরামের পূজার কথা বিশেষভাবেই কথিত হইয়াছে।

অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেবতারা শ্রীরামের মঙ্গল চিন্তায় মহাভাবনায় পড়িলেন। তাঁহারা সকলে স্থির করিলেন রামের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবেন। তাঁহারা গিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ চাহিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, আদ্যাশক্তির কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত রাবণ-বধ সম্ভব নহে। কিন্তু দেবী ত এখন নিদ্রিতা। তাঁহাকে আমরা প্রবোধিত করিব। কিন্তু কি ভাবে যে প্রবোধিত করিব, তাহাও জননীর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে।

দেবতাগণ ব্রহ্মার সহিত দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবীর কৌমারী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। কৌমারী রূপের বর্ণনা শ্রীচণ্ডীতেই পরিদৃষ্ট হয়—

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

কৌমারীদেবী কুমার কার্ত্তিকেয়ের শক্তি। তিনি শ্রেষ্ঠ ময়ূরের উপর সমাসীনা, মহাশক্তিধারিণী নিষ্পাপা। তিনি প্রকটীভূতা হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—"আপনারা আগামী কল্য বিল্ববৃক্ষমূলে জননীর বোধন করিবেন। আপনাদের প্রার্থনায় তিনি বোধিতা হইবেন। জগন্মাতাকে প্রবুদ্ধা করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

ব্রহ্মা মর্ত্ত্যে আসিলেন। একটি নির্জ্জন স্থানে একটি বিল্ববৃক্ষ দর্শন করিলেন। তাহার সবুজঘন পত্ররাশির মধ্যে কাঁচা সোনার বর্ণ একটি মনোহারিণী বালিকাকে বিনিদ্রিতা দর্শন করিলেন। ইনি জগজ্জননী ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া ব্রহ্মা সেখানে দেবগণ সহ নতজানু হইয়া বোধনস্তব করিলেন।

এই স্তবটী একটি অষ্টক—আটটি মন্ত্র আছে। আদি ও অন্ত্যের দুইটি মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে।

জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং
ক্রীড়াস্থানে স্বাগতাং ভূতলেঽস্মিন্।
শত্রুস্ত্বং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গে
দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেঽপি॥

মহাদেবি! তুমিই যে মহেশ্বরী ইহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি।

ভূতল তোমার ক্রীড়াভূমি, তাই তুমি এখানে আগমন করিয়াছ। তুমি শত্রুরূপাও বটে, মিত্ররূপাও বটে। বন্ধন-কারিণীরূপে তুমি শত্রু; বন্ধনমোচনকারিণীরূপে তুমি মিত্র। মহাযোগিগণ ধ্যানযোগে অন্তরেও তোমাকে ধরিতে পারেন না।

ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা
রুদ্রেন্দ্রাদৌ মষ্যপীহাস্তি যা চ।
সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত
তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ॥

যেখানে যে শক্তির ক্রিয়া সকলই তোমার। আমি ব্রহ্মা, আমার শক্তিও তোমার। রুদ্রদেবতা, ইন্দ্রদেবতা সকলের শক্তিই তোমার, তুমি সর্ব্বশক্তিরূপিণী। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রামের শক্তিও তোমার, রাবণের শক্তিও তোমার। আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি সকল শক্তি লইয়া শ্রীরামচন্দ্রে প্রবর্ত্তিতা হও। অর্থাৎ সমগ্র শক্তি দ্বারা তুমি শ্রীরামকে সাহায্য কর। জননি, তুমি জাগরিতা হও, এই জন্য বোধন করিতেছি।

ব্রহ্মার স্তবে মহাদেবী প্রবুদ্ধা হইলেন। তিনি তখন তাঁহার বালিকা মূর্ত্তি ছাড়িয়া চণ্ডিকা-রূপে ব্যক্ত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "মাতঃ, আমরা অকালে তোমাকে ডাকিয়াছি, রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। 'রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।' দেবি, অদ্য হইতে আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিব, যাবৎ না রাবণের বধ হয়। 'রাবণস্য বধং যাবদর্চয়িষ্যামহে বয়ম্।' আমরা যে ভাবে বোধন করিয়া তোমার অর্চনায় ব্রতী, সেই প্রকারে যুগ যুগ ধরিয়া সমস্ত নরনারী 'যাবৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে' যাবৎ কাল সৃষ্টি থাকিবে, তাবৎ

কাল তোমার পূজা করিবে। তুমি কৃপা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্বশক্তি দিয়া রাবণ-বধে সহায়ক হও।"

সদ্যঃপ্রবুদ্ধা দেবী কহিলেন, "আমি সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য ধনুর্বাণে প্রবেশ করিব। অষ্টমীতে রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ হইবে। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মাথা মাটিতে লুটাইবে। দশমীতে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব করিবেন।"

বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত পূজাবিধি দেবী নিজেই জানাইয়া দিলেন। রঘুনন্দন-স্মৃতিতে দুর্গোৎসবের ছয়টি কল্প বিধান আছে। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টম্যাদি কল্প, মহানবমী কল্প। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে, বিহার অঞ্চলে ও আসামে ষষ্ঠ্যাদি কল্প প্রচলিত।

এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষের শাখায় দেবীর বোধন হয়। তৎপর আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। ঐদিনকার পূজা হয় ঘটে। পরে সপ্তমী হইতে তিন দিন মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্পে ও প্রতিপদাদি কল্পে, যথাক্রমে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-নবমীতে ও আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদে দেবীর বোধন হয়। প্রথম কল্পে পক্ষব্যাপী ও দ্বিতীয় কল্পে নবরাত্রি মায়ের অর্চনা হইয়া থাকে। ষষ্ঠ্যাদি কল্পে চারি দিন পূজা হয়।

মহাশক্তির আবির্ভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া সীতা দেবীর উদ্ধার সাধন করেন। মহাবিপদ্ কাটিয়া গেল বলিয়া অষ্টমীর নাম হইল মহাষ্টমী। মহাসম্পদ্ লাভ হইল বলিয়া নবমীর নাম মহানবমী।

মহাবিপত্তারকত্বাদ্ গীয়তেঽসৌ মহাষ্টমী।
মহাসম্পদ্দায়কত্বাৎ সা মহানবমী মতা।

শ্রীরামচন্দ্রের এই দুর্গোৎসবের স্মরণেই আমাদের এই শারদীয়া মহাপূজা। যিনি পূজক তিনি স্থিত শ্রীরামের ভূমিকায়। সংসারাশ্রমী সাধারণ নরনারীর দারিদ্র্যই মহাবিপদ্, ঐশ্বর্য্যই মহাসম্পদ্, জীবনযাত্রাই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া মহাবিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহাসম্পদ্ লাভ মায়ের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে।

"দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা।" ৪।১৭

যাহারা যোগী, সাধনাই তাঁহাদের সমর, বিষয়বন্ধনই তাঁহাদের মহাবিপদ্, মুক্তিলাভই মহাসম্পদ্। জগজ্জননীর অর্চনায় যে যোগী সাধক, সমরে জয়লাভ করেন, তাঁহার ভব-বন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি মুক্তি-সুখে ডুবিয়া থাকেন।

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ।" ৪।৯

যাহারা জ্ঞানমার্গের সাধক অজ্ঞানতাই তাঁহাদের মহাবিপদ্, ব্রহ্ম-জ্ঞানই পরম ধন। মহাদেবীর অর্চনায় সাধনযুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করেন, কারণ জগজ্জননী নিজেই মূর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। যাহারা ভক্তি-পথের উপাসক তাঁহারা বনবাসী রামচন্দ্রের ভূমিকায় নিরন্তরই ব্যথিত। তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তিরূপিণী সীতাদেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে অপরাধরূপী রাবণ—এই ভাবনা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বেদনাতুর করে। যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় মহাপরাধরূপী দশাননের বধ হয় মহাষ্টমীতে, প্রেমভক্তিরূপিণী সীতার উদ্ধার হয় মহানবমীতে। দশমীতে এই পরম সত্যানুভূতিকে হৃদয়ের গভীর তলদেশে চিত্তদর্পণে নিরঞ্জন করিয়া ভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করেন।

মানব-সভ্যতা আজ ভোগমুখী। ভোগপ্রবণতাই অকাল,

আমাদের অকাল-বোধন সফল হউক। বৃক্ষের পরিচয় ফলে, বিশ্বমাতার পূজার পরিচয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রসারে। মহাপূজার আয়োজনে উৎসব-মুখর আমাদের জীবন আকাশের মত উদার হউক—বাতাসের মত স্নিগ্ধমধুর হউক।

মহাপূজার উপচার

ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার যত প্রকার উপায় মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে তন্মধ্যে পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূজা তন্ত্রশাস্ত্রের এক অভিনব দান। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে এই অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান নাই। পূজা কথাটির ঠিক অনুবাদ অন্য ভাষায় চলে না। পুষ্পচন্দনাদি কতিপয় বিশিষ্ট উপচার লইয়া দেবতার সঙ্গে যে এক অভিনব প্রকারের ব্যবহার, তাহাই আমাদের পূজা। শ্রীভগবানের সান্নিধ্য-লাভের ইহা এক শ্রেষ্ঠ পন্থা।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের বৈদিক উপায় হইল যজ্ঞ। পূজানুষ্ঠান হইল তন্ত্রশাস্ত্রের নিজস্ব সম্পদ্। যুগ-যুগ ধরিয়া এই অনুষ্ঠানটিকে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রায় সকল

সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। পূজায় দুইটি বস্তুর প্রাধান্য, মন্ত্র ও উপচার। এই নিবন্ধে কেবলমাত্র উপচারের কথাই বলিব। যে সকল উপচার দ্বারা যেভাবে ঐ কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মন্ত্র-রহস্য বা প্রয়োগবিধি বলা সম্ভব নহে।

পূজার বাহ্য ও আন্তর দুইটি দিক্। উভয়েরই মূল্য সমান। কাহারও কাহারও ধারণা, বাহ্য-পূজা হইতে মানস-পূজা শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নাধিকারীই বাহ্যপূজা করিবে। এই ধারণা ঠিক নহে। মূলতঃ বাহ্য-পূজাই পূজাপদবাচ্য। বাহ্য-পূজায় অসমর্থ ব্যক্তিকেই মানসপূজা করিতে বলা হইয়াছে। বাহিরে পূজা ত্যাগ করিয়া অন্তরের পূজা বিধি নহে। বস্তুতঃ অন্তর বাহির দুই মিলিয়াই সমগ্র পূজা। মানবদেহের যেমন হস্ত-পদাদি অঙ্গ, প্রাণশক্তি অঙ্গী। পূজারূপিণী দেবী-দেহেরও সেইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক উপচার সমর্পণ হইল অঙ্গ, অন্তরের অনুরাগ হইল অঙ্গী। এই নিবন্ধে প্রধানতঃ অঙ্গের কথাই বলিব।

বহুদিন যাহার আশাপথ চাহিয়া আছি, এইরূপ কোন অতীব প্রীতির পাত্র, অথচ মর্য্যাদাসম্পন্ন নিতান্ত নিজজন যদি আমাদের গৃহে আসিয়া উপনীত হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে যেভাবে গ্রহণ করি, সেই ভাবটি লইয়াই দেবতার পূজা। উপচারসকলও সেই ভাব লইয়াই নির্ণীত হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের কত আপন জন, কত প্রেমের পাত্র, অথচ তিনি কত বিরাট বস্তু। আজ তিনি আমাদের দুয়ারে নামিয়া আসিয়াছেন তাঁহার দিব্যধাম হইতে। তাঁহাকে সম্মান করিতে হইবে, সংবর্ধনা করিতে হইবে, পরম যত্নে সেবা করিতে হইবে। আমাদের নিজেদের যেরূপ স্নান, আহার, বিশ্রাম

প্রয়োজন তাঁহারও সেই রকমই দরকার—এই বোধে আত্মবৎ পরিচর্য্যা তাহাই পূজার প্রধান দিক্।

সকল দেবতার পূজার অঙ্গই মূলতঃ একপ্রকার। পূজায় যদি মহাস্নান থাকে ও বলি-হোম থাকে, তাহা হইলে সেই পূজাকে মহাপূজা কহে। আমাদের শারদীয়া দুর্গোৎসব একটি মহামজা। পূজার সময় আমরা অনেকেই পুরোহিতের উপর পূজার ভার ন্যস্ত করিয়া নিজেরা অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, পূজামণ্ডপে বসিয়া মহাস্নান, হোমাদি দর্শন করি না। দর্শন করিলে অনুভব করিতে পারা যায় যে, ঐ সকল অনুষ্ঠান কত বিচিত্রতাময় ও গম্ভীরার্থদ্যোতক। মায়ের মহাপূজার কথাই বলিব।

পূজার উপচার সামর্থ্যানুসারে পঞ্চবিধ, দশবিধ, বা ষোড়শবিধ হইতে পারে। মহাপূজায় ষোড়শোপচারই বিধি। বিভিন্ন গ্রন্থোক্ত নির্ঘণ্টে উপচারগুলির নামে অল্পবিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে ষোড়শ উপচারের নাম নিম্নরূপ

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কং তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণৈঃ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপে নৈবেদ্যং চন্দনং তথা।
দেবার্চনাসু নির্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ॥

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয় জল, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন এই ষোলটি পূজার উপচার।

সর্বাগ্রে আসন প্রদান। স্বর্ণাসন, কাষ্ঠাসন, বস্ত্রাসন, কুশাসন —যেটি সামর্থ্যে কুলায় তেমনি আসন দেওয়া যাইতে পারে। ঐ

সকলের অভাবে কুশাসন অর্পণ করা চলে। একটিমাত্র পুষ্প হাতে লইয়া "মা ইহাই তোমার আসন হউক" বলিয়াও অর্পণ করা যায়। "আসনং গৃহ্ণ চার্বঙ্গি" এই মর্ম্মে মন্ত্র আছে। মন্ত্রসহ আসন সমর্পণ কর্ত্তব্য।

আসন প্রদান করিলেই মা বসিবেন না। "স্বাগত" জানাইতে হইবে। লৌকিক নিয়মে আসুন, এই যে আসুন, ইত্যাদি বলিবার মত ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্র-মুদ্রাসহযোগে জগজ্জননীকে যথাস্থানে উপবেশন করানোই স্বাগতম্। বীজমন্ত্রসহ স্বাগতং সুস্বাগতম্ ইত্যাদি বিনয়বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক এই কার্য্য করিতে হয়।

মাতা আসন প্রতিগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলে তাঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালনের জন্য জল দিতে হয়। তাহাই পাদ্য। পাদ্যের পর অর্ঘ্য। অর্ঘ্য রচনা করিতে আটটি দ্রব্যের প্রয়োজন—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, অক্ষত, তিল, যব ও শ্বেতসর্ষপ। "গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে" ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মাতাকে অর্ঘ্যার্পণ করিতে হয়। অতঃপর শ্রীমুখ প্রক্ষালনের জন্যে আচমনীয় প্রদেয়। শুদ্ধ জল দ্বারাই আচমনীয় দেওয়া হয়। কর্পূর ও সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত জল দিবার বিধিও আছে।

মা আসিয়াছেন, সন্তানের জন্য বহু পথ অতিক্রম করিয়া, তাই তাঁহার পথশ্রান্তি অপনোদনের জন্য একটি শীতল, সুস্বাদু, পুষ্টিকর পানীয় অর্পণ করিতে হইবে। এইটির শাস্ত্রীয় নাম মধুপর্ক। পরিমাণ মত পাঁচটি দ্রব্য মিশ্রণে মধুপর্ক তৈয়ারী হয়। দধি, ঘৃত, জল, মধু ও চিনি। কোন কোন মতে নারিকেলের জলও মিশাইতে হয়। ইহা কাংস্যপাত্রে অর্পণ করিতে হয়। মধুপর্ক সৌখ্য, ভোগ, পুষ্টি ও

তুষ্টি প্রদায়ক। মধুপর্ক অর্পণের পর মুখ ধোবার পুনরাচমনীয় দেওয়া বিধি। মায়ের ক্লান্তি দূর হইলে স্নানীয় দ্বারা স্নান করাইতে হয়। মহাষ্টমীতে মায়ের যে স্নান তাহাকে মহাস্নান বলা হয়। প্রথমে তৈল-হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা অভ্যঙ্গ ও পঞ্চশস্যচূর্ণ দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করণীয়। অতঃপর নানাবিধ জলের দ্বারা স্নান করাইতে হয়। তেত্রিশ প্রকার জলের মধ্যে কতিপয় নাম করা যাইতেছে।

শুদ্ধজল, গঙ্গাজল, সুগন্ধজল, শীতলজল, ঈষদুষ্ণজল, কুশযুক্তজল, স্বর্ণজল, রজতজল, মুক্তাজল, নারিকেলজল, তিলযুক্ত জল, সর্ব্বৌষধি-জল, মহৌষধিজল, অগুরুজল, পুষ্পযুক্ত জল, শিশিরের জল, বৃষ্টির জল, চন্দনজল, শর্করাযুক্ত জল, পুষ্করিণীর জল, সহস্রধারাজল। ইহা ছাড়া পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চশস্য ও অষ্টবিধ মৃত্তিকাযুক্ত জল ও বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি মায়ের মহাস্নানে অর্পিত হয়। সর্ব্বশেষে অষ্ট কলসী জলে স্নান করানো হয়। এই স্নান করান দেবতাগণ আকাশ-গঙ্গার জলে, মরুদ্গণ বৃষ্টির জলে, বিদ্যাধরগণ নদীর জলে, লোকপালগণ সমুদ্রের জলে, নাগগণ পদ্মরেণু-জলে, পর্ব্বতগণ নির্ঝরের জলে, সপ্তর্ষিগণ সর্ব্বতীর্থ জলে ও অষ্টবসু চন্দনবাসিত জলে।

এই মহাস্নান কালে অষ্টবিধ বাদ্য বাজিবে, অষ্টবিধ রাগিণী গীত হইবে। এই সকল বাদ্য ও রাগরাগিণীর নামও শাস্ত্রে লিখিত আছে। মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যাদি দ্বারা মাতাকে স্নান করাইতে হয়। প্রত্যেকটি বস্তু দ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র পৃথক্। অষ্ট কলসী জলে স্নানের আটটি মন্ত্র পৃথক্ ও বিশেষ প্রাণস্পর্শী। মনে হয় অনন্তর বিশ্বের সকলে মিলিয়া জগন্মাতার মহা-অভিষেক করিতেছেন।

স্নানের পর জননীকে পরিধেয় বস্ত্র অর্পণ করিতে হয়। তাঁহার

সন্তান সাধ্যানুসারে মাকে কার্পাস বস্ত্র বা কৌষেয় বস্ত্র বা আরও মূল্যবান্ বস্ত্র অর্পণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া মাকে বস্ত্র নিবেদন করিতে হয়। জননী বসন গ্রহণ করিলে ভূষণ দিয়া তাঁহাকে সাজাইতে হয়। মায়ের নয়টি অঙ্গে আভরণ দিতে হয়—চরণ কটি, বক্ষ, হস্ত, কণ্ঠ, নাসিকা, কর্ণ, সীমন্ত ও মস্তক। নূপুর হইতে আরম্ভ করিয়া মুকুট পর্য্যন্ত ভক্ত সামর্থ্যানুযায়ী মাতৃ-অঙ্গ আভরণযুক্ত করেন। অক্ষম হইলে মানসে ঐরূপ সুসজ্জিতা জননীকে দর্শন করেন।

স্নানান্তে জননীকে অঙ্গলেপনের জন্য অগুরু-চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিতে হয়। তার পর চন্দনযুক্ত পুষ্প মায়ের পাদপদ্মে দিতে হয়। ইহাই পূজার প্রধান অঙ্গ। শ্রীগীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন অর্জ্জুনকে,—পত্র-পুষ্প-ফল-জল ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দিলে, আমি তাহা গ্রহণ করি। মায়ের পূজায় বিল্বপত্র ও জবা-পুষ্পাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তা ছাড়া মা নাগকেশর, বকুল, কুন্দ, করবী, আকন্দ, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম প্রভৃতি ফুল ভালবাসেন। শ্বেত ও রক্ত-চন্দনযুক্ত পত্রপুষ্প মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মায়ের পায়ে দিতে হয়। তৎসহ ভক্তি ও অনুরাগযুক্ত আপনার হৃদয়পদ্মও ঐ শ্রীচরণপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। অনন্তর ধূপ ও দীপ। ধূপ শব্দের নির্ব্বচন আচার্য্যেরা কহেন—অশেষ দোষ 'ধূত' অর্থাৎ বিনাশ করে এবং পরমানন্দ প্রদান করে, এই হেতু ধূপ নাম সার্থক। ধূপের ধূম আরামদায়ক হইবে। কখনও এমন হইবে না যাহাতে মায়ের চক্ষের জ্বালা হইতে পারে, "নাসাক্ষিরন্ধ্র-সুখদ" হইবে। খুব তাপও হইবে না, 'নিস্তাপ' হইবে। ষড়ঙ্গ ধূপ, ষোড়শাঙ্গ ধূপ ইত্যাদি বহুবিধ ধূপ-প্রস্তুত-প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

সাধারণতঃ ধূপে গুগ্‌গুল, চন্দনের গুঁড়া প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মাকে ধূপ-ধূম অর্পণ করিতে হয়। তৈল বা ঘৃতযুক্ত দীপদান প্রশস্ত। প্রাণীর অঙ্গজাত দ্রব্যে দীপদান নিষিদ্ধ। দীপটি হইবে নেত্রের আনন্দদায়ক। দীপে খুব তাপ হইবে না (দূরতাপবিবর্জ্জিত), দীপ শব্দশূন্য ও ধূমশূন্য হইবে। পলিতা খুব সরু বা খুব মোটা হইবে না। দীপটি কিছু উচ্চস্থানে রহিবে যেন বসুমতীর অঙ্গে তাপ না লাগে।

মাতঃ, তোমার জ্যোতিই অগ্নিকে তেজস্বী করিয়াছে, তোমার জ্যোতিতেই সূর্য্য চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্। তবু মা, তোমাকে এই ক্ষুদ্র দীপ দিতেছি গ্রহণ কর। 'ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মাকে দীপ দিতে হয়। তৎসহ নিজ ক্ষুদ্র জীবনদীপটিও ঐ ভাবে স্নেহময় করিয়া অর্পণ করিতে হয়।

পূজার ভোগের নাম নৈবেদ্য। মা এখন আহার করিবেন। ভক্তের নিজের যাহা প্রিয়, তাহাই সে মাকে দিবে। "মনঃপ্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যম্"। বালকের প্রিয় দ্রব্যাদি মা ভালবাসেন। "স্ত্রীণাং প্রীতিকরম্" দ্রব্যাদি মায়ের প্রীতিপ্রদ। শাস্ত্রে নৈবেদ্যের উপকরণের যে কত বর্ণনা তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কালিকা-পুরাণে উপকরণের বিস্তৃত নির্ঘণ্ট আছে।

ঘৃতযুক্ত শালিধানের অন্ন, মাষ, মুদ্গ, তিল, পরমান্ন, পিষ্টক, কৃশর (খিচুড়ি), মোদক, পৃথুক (চিঁড়া), ধানা (মুড়কী), দ্রাক্ষা, পনস, খর্জ্জুর, শ্রীফল, ব্রাহ্মী, কলমী, পুনর্নবা প্রভৃতি শাক, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনী, শর্করা, মধু ইত্যাদি সন্তান যাহা মাকে ভক্তি করিয়া দিবেন মা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন। কোন দ্রব্য ভক্তের মাকে দিতে

ইচ্ছা, কিন্তু তাহা দুর্লভ। তখন 'তৎ কল্পনীয়ং মনসা' উহা মনে মনে ভাবনা করিয়া দিবে। নিতান্ত দীন-দরিদ্র সন্তান, মাকে কিছুই দিবার মত নাই তার ঘরে, সে কি করিবে? মনে মনে ধ্যান করিয়া সর্ব্ববিধ দ্রব্য কল্পনা করিয়া নৈবেদ্য সাজাইবে, করুণাময়ী মা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

মা ভোগ গ্রহণ করিলে ভক্ত শ্রীচরণ বন্দনা করেন। এই বন্দনাটি অতি মূল্যবান্। আচার্য্যেরা বলেন, সকল দ্রব্য দিয়াও যদি প্রণতিটি ভক্তিপূর্ণ না হয় তবে সকলই বিফল হয়। কিছু না দিয়াও কেবলমাত্র ভক্তিপূর্ণ একটি নমস্কারে পূজা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। "একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, আমার সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার চরণ'পরে॥" গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন 'মাং নমস্কুরু'। আমরাও মাকে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ', শত-সহস্র প্রণতি জানাই। দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি সব এক করিয়া সমস্ত সত্তাটাকে মায়ের পায়ে ফেলিয়া দেওয়াই হইল শ্রেষ্ঠ প্রণাম। বন্দনাই ষোড়শ উপচারের শেষ উপচার।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ষোড়শোপচারে পূজা, মহাস্নান সঙ্গে যদি বলি ও হোম থাকে, তাহা হইলেই ঐ পূজা মহাপূজা হয়। পূজা ও মহাস্নানের কথা বলা হইল। বলি ও হোম সম্বন্ধে দুটি কথা মাত্র বলিব। 'বলি' শব্দের অর্থ হইল উপহার। মায়ের শ্রীকরে কিছু উপহার দিতে হইবে। সুরথ রাজা "নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতং" দ্রব্যাদি দিয়াছেন। নিজ গায়ের রক্তমাখা দ্রব্যাদি। আমরা কথায় বলি "গায়ের রক্ত" অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, বহু কষ্টার্জিত বস্তু মাকে দিতে হয়।

যাহারা রাজসিক বা তামসিক পূজা করেন, তাঁহারা বলির দ্রব্য বলিতে বুঝেন একটি নিরীহ চতুষ্পদ প্রাণী। যাহারা সাত্ত্বিক তাঁহারাও একটি চতুষ্পদ প্রাণী আনেন—ঐ প্রাণীটির পা হইল মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। এই চতুষ্পাদবিশিষ্ট নিজ অন্তঃকরণটি তাঁহারা মাকে দিয়া দেন। ভক্ত সাধকের গান আছে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম দু'টো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
যদি না মানে নিষেধ
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥

হোম বৈদিক বিধি। মহাপূজায় বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধির একাত্মতা হইয়া গিয়াছে। অগ্নিমুখে সকল দেবতার উদ্দেশে আহার্য্য অর্পণ করিতে হয়। এই অর্পণটি পূর্ণ হয়, যখন সাধকের ভাবনায় গীতার বাণী সজীব হইয়া উঠে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৪।২৪

অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃতাগ্নি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে, একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মময়ী মা-ই সব। হোমের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাতৃময়। মায়ের স্নেহের অনলে সাধকের জীবনাহুতি হইলেই হোমাঙ্গ পূর্ণ হয়। মায়ের সন্তানের সেবায় জীবনকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া হোমাঙ্গ সার্থকতা প্রাপ্ত হয়।

জগজ্জননীতে মাতৃভাব ও মায়ের সকল সন্তানে ভ্রাতৃভাবের বিকাশে আমাদের মহাপূজা জীবন্ত হইয়া উঠুক।

বরদাত্রী

দুর্গা-সপ্তশতী-চণ্ডীগ্রন্থে মেধা ও সুরথ-সমাধি সংবাদ

অনেক শাস্ত্রগ্রন্থই অনুরূপ সংবাদ বা বক্তা শ্রোতার কথোপকথনরূপে প্রকটিত আছেন। গীতা, কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। ভাগবত, শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ। মহাভারত, বৈশম্পায়ন-জনমেজয়-সংবাদ। এই সংবাদের পরে আবার সংবাদ থাকে। যেমন গীতা কৃষ্ণার্জ্জুনের আলোচনা, তাহাই পুনরায় সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ, তাহাই পুনরায় বৈশম্পায়ন-জনমেজয়-সংবাদ। ইহাকে গীতার ষট্‌সংবাদ বলে। চণ্ডীরও ষট্‌সংবাদ আছে। সুরথ-সমাধি মেধা মুনির কাছে যাহা শ্রবণ করেন সেই কথা মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরি মুনিকে (মতান্তরে ক্রৌষ্টুকি) বলেন। তার পর সেই কথাই আবার পক্ষিরূপী মুনিপুত্রগণ জৈমিনিকে. কহিয়াছেন। ইহা চণ্ডীর ষট্‌-সংবাদ।

চণ্ডীর মুখ্য তত্ত্ববিষয়টির মেধা মুনি বক্তা, সুরথ ও সমাধি শ্রোতা। গীতা, ভাগবত, মহাভারত সর্ব্বত্রই কিন্তু একজন শ্রোতা—যথাক্রমে অর্জ্জুন, পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়। চণ্ডীর শ্রোতা দুই জন। দুই জন মুখ্য শ্রোতার শাস্ত্রীয় প্রয়োজনীয়তা কি, গ্রন্থের শেষ (ত্রয়োদশ) অধ্যায়টি পর্যন্ত না পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

চণ্ডীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ঋষিবর সুরথ-সমাধিকে মায়ের আরাধনা করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁহারা নিজেরা মূর্তি তৈয়ারী করিয়া তিন বৎসর কাল কঠোর সাধনা করিলেন। পূজায় জননী প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, তোমরা বর প্রার্থনা কর।

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।
যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ।।

যাহা প্রার্থনা কর আমার কাছে পাইবে। আমি তোমাদের প্রতি পরিতুষ্টা হইয়াছি। তখন রাজা বর কামনা করিলেন—

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ।।

অবিভ্রংশী অর্থাৎ বিভ্রংশরহিত নিষ্কণ্টক। আমি এমন রাজ্য কামনা করি যাহা কেহ কখনও কাড়িয়া লইতে না পারে। এইরূপ রাজ্য আমি পরজন্মে কামনা করি। আর এই জন্মে চাই স্বীয় রাজ্য যাহা হারাইয়াছি। সেই হৃতরাজ্য যেন নিজ বলে শত্রু নাশ করিয়া লাভ করি। ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রমে শত্রুগণকে পদানত করিয়া নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তি কামনা করি। ইহকালে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের শক্তি ও পরকালে অবিভ্রংশী রাজ্যে স্বর্গলাভ, এই রাজার যাচ্ঞা।

জগজ্জননী বলিলেন—

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।।
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি।।
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ।।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি।।

(চণ্ডী ১৩।১৯-২২)

অর্থাৎ, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি শত্রু বিনাশ করিয়া নিজ রাজ্য লাভ করিবে। আর পরজন্মে সূর্য্যদেব হইতে পুনর্ব্বার জন্ম

লাভ করিয়া তুমি পৃথিবীতে সাবর্ণি মনু হইবে। সেই রাজ্য আর কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। সাবর্ণি মন্বন্তরে তুমি হইবে মন্বন্তরাধিপ। সমাধি বৈশ্য বর চাহিলেন—

সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥ ১৩।১৭

বৈশ্য চাহিলেন জ্ঞান। "জ্ঞানং বব্রে।" যেরূপ জ্ঞান দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় সেইরূপ জ্ঞান। বৈশ্যবরের ভাষায় বলি, 'মম' এবং 'অহং'—আমার ও আমি এই যে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি—এই আমার স্ত্রী, এই আমার সাধের দেহ, এই যে মিথ্যা অভিমান, তাহার বিচ্যুতি বিশেষভাবে ঘটাইবার কারক যে জ্ঞান- দেহ-দৈহিক-ভোগাসক্তি-নাশকারী যে জ্ঞান, তাহাই কামনা করিলেন।

রাজার মত ভোগসুখ না চাহিয়া বৈশ্যবর এইরূপ জ্ঞান চাহিলেন কেন? তাহার কারণ ঋষিবর বলিয়াছেন, বৈশ্যবর্যের দুইটি বিশেষণ দিয়া— নির্ব্বিণ্ণমানস' এবং 'প্রাজ্ঞ'।

নির্ব্বিণ্ণ অর্থ বিরক্ত। বিষয়-সুখে বিরক্ত হইয়াছে মন যাহার সেই নির্ব্বিণ্ণমনা। সমাধি বৈশ্যের অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈষয়িক সুখে বিরক্তি জাগিয়াছে। কেন জাগিল, তাহার কারণ, তিনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সারাসার-বিবেকবান্। চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ-ফলে তাঁহার চিত্তে কোন্‌টি সার বস্তু, কোন্‌টি অসার বস্তু এই অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছে। বিবেকবান্ ব্যক্তিই প্রাজ্ঞ, প্রকৃষ্ট-জ্ঞানশালী। বৈশ্যবরকে বর দিতে দিতে মাতা বলিলেন—

বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥

হে বৈশ্যবর! তুমি আমার নিকট যে বর পাইতে অভিলাষ করিয়াছ তাহাই দিব। সম্যক্ সিদ্ধি অর্থাৎ পরামুক্তির জন্য প্রয়োজন যে জ্ঞানের, সেই জ্ঞান তোমার লাভ হইবে। পরামুক্তির জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানের। সমাধি সেই জ্ঞান লাভ করিলেন।

ইহাতে স্পষ্ট হইল যে, মহামায়া সুখদা ও মোক্ষদা, এই দুই-ই বটেন। দুই জন শ্রোতার চণ্ডী-শ্রবণের রহস্য ব্যক্ত হইল। বিষয়সুখ ও মোক্ষসুখ ছাড়া আরও একটি পরম সম্পদ্ মহাশক্তি প্রদান করিতে পারেন। সেটি দান করেন অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ারূপে। সেই দেয় সম্পদ্‌টি হইল শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শ্রীবৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য যোগমায়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দ-ব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥

হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে নন্দব্রজবাসিনী গোপবালাগণ হবিষ্যান্ন ভোজনাদি নিয়মপালনপূর্ব্বক কাত্যায়নীব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি মন্ত্রে নিত্য পূজা করিতেন তাহা শ্রীভাগবত উল্লেখ করিয়াছেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

হে দেবি কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগশক্তি-শালিনি, হে সমগ্র লীলার অধীশ্বরি, আপনি নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া দিন। আপনাকে প্রণাম।

এই মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহারা যোগমায়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন মাস ভরিয়া। এই অর্চ্চনা তাঁহাদের গভীর কৃষ্ণ-প্রেমের পরিচায়ক। এই প্রেমবলে ও যোগমায়া দেবীর অশেষ করুণাবলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং জগৎপতিকে তাঁহারা প্রাণপতিরূপে আপন জন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

মহামায়া কেবল ভোগসুখ ও মোক্ষ-সুখের দাত্রী নহেন, শ্রীহরিচরণ-কমলে প্রেমভক্তি-ধনেরও তিনি প্রদাত্রী। যে স্বরূপে এই প্রেমভক্তিধন দান করেন, শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে রূপে শ্রীবৃন্দাবনে নন্দপত্নী যশোদার গৃহে প্রকটিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অবতারের তথ্য মূল চণ্ডী-গ্রন্থেই উক্ত আছে।

"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।"

এই স্বরূপকে শ্রীমদ্ভাগবত 'একানংশা' 'কৃষ্ণানুজা' প্রভৃতি নানা পরিচয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, ইনি অন্তরঙ্গা শক্তি—চিচ্ছক্তিবৃত্তি-স্বরূপভূতা। যে শক্তি দেহাভিমানী জীবকে আবরণ করেন সেই বহিরঙ্গা শক্তি ইনি নহেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

নিত্যলোক হইতে লীলাকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইতে ইনি মহা-সামর্থ্যশালিনী। এই স্বরূপে তিনি ভক্তিদাত্রী।

দেবগণ স্তবে মাকে "সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

সকলের সকল প্রকার আর্ত্তিকে তিনি হরণ করিয়া থাকেন। যিনি ভোগী তাঁর অন্তরে নিয়ত ভোগকামনা। ভোগ্য বস্তু পাইবার জন্য তাঁর আর্ত্তি—মাতা এই আর্ত্তি হরণ করেন। যিনি যোগী তিনি মুক্তি কামনা করেন। মুক্তি না পাওয়ার জন্য তাঁহার অন্তরে আর্ত্তি জাগে। জগজ্জননী সেই আর্ত্তিকে দূর করেন। যাহারা সত্য সত্যই ভোগ বা মুক্তি কিছুই চান না, তাঁহারা শুদ্ধ ভক্তি-যোগী। তাঁহারা কেবল চান, শ্রীকৃষ্ণচরণে নির্ম্মল শুদ্ধা ভক্তি। ইহা পাওয়ার জন্য অপ্রাপ্তিজনিত আর্ত্তি তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়া থাকে। বিশ্বকবির ভাষায়—

যেন, তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে।
যেন, ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥

এই আর্ত্তি দূর করিয়া মহাদেবী তাঁহাদের হৃদয়ে সুদুর্লভ প্রেমভক্তি মহাসম্পদ্ দান করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর মা কালীর কাছে প্রার্থনায় বলিয়াছেন—

এস হে ওহে পাগলা কালি
লয়ে প্রেমের ডালি।
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হে
তুমি গণপতি অংশুমালী॥

আদ্যা-স্তবেও দেখা যায়—

সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী।

সর্ব্বার্ত্তিহারিণী সর্ব্ববিধ বরদাত্রী হরিকৃপারূপিণী জগজ্জননী মহাদেবী জয়যুক্তা হউন। মাতৃকরুণার প্লাবনে বিশ্বচরাচর ধন্য হউক, আমরা তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাই।

শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য

প্রস্থানত্রয় বলিতে বেদ, বেদান্ত ও গীতাকে বুঝায়। বস্তুতঃ বেদ, বেদান্ত, গীতাই মুখ্যশাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্র, ইহাতে প্রকাশিত সত্যেরই বিভিন্নমুখী অভিব্যক্তি। বেদ, বেদান্ত ও গীতাতেও মূলতঃ একটি তত্ত্বেরই ত্রিমুখী বিকাশ। বেদকে বলে শ্রুতি-প্রস্থান—ইহা অনাদি-সত্য। কেহ নির্ম্মাণ করে নাই, গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অনাদিকাল ধরিয়া শ্রুত হইয়া আসিতেছে। ইহা অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার।

গীতাকে বলে স্মৃতি-প্রস্থান। শ্রুতির সত্যই মানবীয় জীবন-স্মৃতির মধ্যে, লৌকিক ইতিহাসের মধ্যে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের মাধ্যমে প্রকটিত হইয়াছে স্মৃতি-প্রস্থান গীতা-গ্রন্থে। বেদান্তসূত্রকে বলে ন্যায়-প্রস্থান। শ্রুতি ও স্মৃতির সত্যই ইহাতে ন্যায়ানুমোদিত ভাবে বাদ, বিচার ও তর্কের মাধ্যমে সুসিদ্ধান্ত-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহা শ্রুত হইয়া আসিতেছে ঋষিগুরু-পরম্পরায়, দৃষ্ট হইয়াছে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের মধ্যস্থলে, তাহাই পুনরায়

যুক্তিমুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বেদান্তদর্শনে। এই প্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের সম্বন্ধ কি, তাহাই এই নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোচ্য।

প্রস্থানত্রয় জ্ঞানশাস্ত্র। চণ্ডী বিজ্ঞানশাস্ত্র। জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিরোধিতা নাই। একই সত্যানুসন্ধিৎসা ও একবাক্যতা আছে।

জ্ঞানশাস্ত্রে নির্ম্মল সত্য (pure truth), বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রযুক্ত সত্য (applied truth)। জ্ঞানের দ্বারা আনীত সত্য, বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা স্থাপন করে। বেদাদি শাস্ত্রের মহাসত্য, চণ্ডী আধ্যাত্মিক পরীক্ষা অর্থাৎ সাধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বেদ, গীতার মন্ত্র ও বেদান্তের সূত্র, চণ্ডীতে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

বেদের একটি বিখ্যাত সূক্তের প্রকট প্রতিমা দেবী দুর্গা, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্‌দেবী যে মন্ত্রের দর্শন করিয়া ব্রহ্মবাদিনী ঋষি হইয়াছেন সেই দেবীসূক্তের উজ্জ্বল বিগ্রহই শ্রীশ্রীমহাদেবী চণ্ডিকা। দেবীসূক্ত ও সপ্তশতী পাঠ করিলেই উহা হৃদয়ঙ্গম হয়। দেবীসূক্ত-মধ্যেই চণ্ডীর বীজ নিহিত আছে। এই জন্যই দেবী-মাহাত্ম্য পাঠের পূর্ব্বে দেবীসূক্ত পাঠ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, দেবীসূক্ত পরে পাঠ্য। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীসূক্ত জপ করিয়াই মায়ের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। দেবীসূক্তে যিনি মন্ত্ররূপা, দেবীমাহাত্ম্যে তিনি বিগ্রহরূপা। ইহা দ্বারা বেদ ও চণ্ডীর একাত্মতা প্রতিপন্ন হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসী
দেকমেবাদ্বিতীয়ম্। ৬।২।১।

ব্রহ্ম বস্তু আদিতে এক এবং অদ্বিতীয় ছিলেন। পরবর্ত্তী তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ৬।২।৩

আমি বহু হইয়া প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, এইরূপ ইচ্ছা করিলেন ব্রহ্ম। এক বস্তু, বহু হইলেন। কিরূপে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল তাহা শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি স্পষ্টতর করিয়া কহিয়াছেন—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ। ৪।১।

তিনি এক, "শক্তিযোগে" বহুরূপ হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর পরবর্ত্তী ৬।৮ মন্ত্রে কহিয়াছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

সুতরাং শক্তি দ্বারাই যে তিনি বহুরূপ হইয়াছেন ইহা শ্রুতিতে সুস্পষ্ট। এই পরাশক্তি পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। যে-শক্তি আগন্তুক তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট। যে-শক্তি স্বাভাবিক তাহা স্বরূপভূত, অভিন্ন। যেমন ধূমযুক্ত অগ্নি ও দাহিকাশক্তিযুক্ত অগ্নি। ধূমযুক্ততা অগ্নির আগন্তুক বা ঔপাধিক বৈশিষ্ট্য। ইন্ধনের আর্দ্রতারূপ উপাধি থাকিলেই অগ্নির ধূমযুক্ততা। ইন্ধনের আর্দ্রতা না থাকিলে—একটা লাল তপ্ত লৌহদণ্ডে ধূমের অভাব। ইহাতে বুঝা গেল ধূমযুক্ততা অগ্নির আগন্তুক ধর্ম্ম। অতএব উহা অগ্নি হইতে পৃথক্। যদিও অগ্নি ছাড়া ধূম থাকিতে পারে না, তবু ধূম ছাড়া অগ্নি থাকিতে পারে।

আর দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, দাহনকার্য্য ছাড়া অগ্নির স্থিতির সম্ভাবনা নাই। দাহ্য ফুরাইয়া গেলে অগ্নি বসিয়া থাকিবে না,

অমনি চলিয়া যাইবে। সুতরাং দহন-শক্তি আর অগ্নি অভিন্ন। যে শক্তিযোগে ব্রহ্ম বহু হন—উহা পরাশক্তি ও স্বাভাবিকী শক্তি—উহা যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই বলা হইল। এই শক্তিই দেবী-মাহাত্ম্যে প্রতিবিম্বিতা মহাশক্তি দুর্গা। সুতরাং বেদের ব্রহ্মতত্ত্বে ও চণ্ডীর দুর্গাতত্ত্বে ভেদের অবকাশ নাই। সৃষ্টির বৈচিত্র্যকারিণী এই মহাশক্তি, প্রধানতঃ বল ও ক্রিয়ারূপা।

কঠ-শ্রুতিতে উমা হৈমবতীকে ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান-বল-ক্রিয়া এই ত্রিবিধ শক্তির অখণ্ড স্বরূপতাই মহাশক্তি, ইহা স্থির হইল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত মন্ত্র—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। ১০।১৬৪।৪৬

"সদ্বস্তু" একটিই। বিপ্রগণ সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের সূর্য্য অগ্নি সোম, পুরাণের ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই সকল পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট দেবগণের নাম নহে। ইঁহারা একই পরম সত্য বস্তুর বিভিন্ন অভিধা মাত্র। পরমবস্তুর জ্ঞানশক্তির নাম সূর্য্য। তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির নাম অগ্নি। তাঁহার অনুভূতি-শক্তির নাম সোম। একই পরাৎপর বস্তুর সৃষ্টি-শক্তির নাম ব্রহ্মা, পালনী-শক্তির নাম বিষ্ণু, অমঙ্গল-নাশক পরম মঙ্গলশক্তির নাম শিব। এই বৈদিক মন্ত্রের মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে দেবী-মাহাত্ম্যের মহাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি-খানিতে। মায়ের বদনখানি শম্ভু, বাহুসমূহ বিষ্ণু, চরণযুগল ব্রহ্মা।

মহাদেবীর পাদপদ্ম, করপদ্ম ও বদনপদ্মের দিকে দৃষ্টি করিলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন। মায়ের চক্ষু তিনটি। অগ্নি কেশপাল, যম। কর্ণই বায়ু (মাতরিশ্বা), তাঁহার প্রতি রোমকূপের উজ্জ্বল রশ্মিই সূর্য্যদেবতা। সুতরাং মায়ের প্রতিকৃতির মধ্যে বেদের "একং সদ্‌বিপ্রাঃ"—মন্ত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকটীভূত।

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহু, কিন্তু অঙ্গী অর্থাৎ দেহী একজনই। সেইরূপ নিখিল দেবদেবীসকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ। অঙ্গী ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি দুর্গা। তাঁহার দর্শনে একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্বের অনুভূতি হয়। স্তুতিকালে দেবগণ কহিয়াছেন—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণ-শক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা। (চণ্ডী ৪।৩)

যে দেবী স্বীয় শক্তি দ্বারা এই জগৎকে উৎপাদন করিয়াছেন—সমস্ত দেবগণের তেজোরাশিই যাহার মূর্ত্তি—আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

ছান্দোগ্য শ্রুতির যে প্রসিদ্ধ মন্ত্রের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রটি চণ্ডীতে এক অপূর্ব্বভাবে মহাদেবীর শ্রীমুখ হইতে উক্ত হইয়াছে। অসুররাজ শুম্ভ যুদ্ধে আসিয়া, মহাদেবীর অনেক মাতৃকামূর্তি তাঁহাকে সহায়তা করিতেছেন দেখিয়া, ক্রোধযুক্ত হইয়া কঠোর ভৎর্সনা-বাক্য বলিলে মা উত্তর করিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥ (১০।৫)

এই জগতে আমি ত একাই আছি! আমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? ওরে দুষ্ট, এই সকল আমারই বিভূতি, এই দেখ্, আমাতেই

প্রবেশ করিতেছে। এই কথা মায়ের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী প্রমুখ সকল মাতৃকা-শক্তি মহাদেবীর অঙ্গে মিশিয়া গেলেন। অম্বিকা তখন একাই রহিলেন।

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী-প্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা॥ (১০।৭)

তারপর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবী মহাদেবীর শরীরে মিশিয়া গেলেন। দুর্গা তখন একাই বিরাজমানা থাকিলেন। যুদ্ধের মধ্যে ঐ নিরুপম দৃশ্যটিতে বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র মূর্তিলাভ করিয়াছে। সহস্র টীকা-ভাষ্যে যাহা হইবার নহে একটি অপূর্ব্ব লীলার মধ্যে তাহা সুব্যক্ত হইল। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির মন্ত্রটি ঋষিমুখে উক্ত। চণ্ডীর উক্তিটি মায়ের নিজমুখে কথিত। উত্তম পুরুষের একবচনের উক্তি বেশী জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী হয়! এই হেতু শ্রুতির মন্ত্র অপেক্ষাও চণ্ডীর উক্তিটি অধিকতর হৃদয়স্পর্শী। বহুত্বের মধ্যে বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিকে শ্রুতির মন্ত্র বিশাল প্রস্তরখণ্ডের মতো চাপ দিয়া, আর চণ্ডীর মন্ত্র তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিদ্ধ করিয়া, একই মহাসত্যকে দেখাইয়া দেয়। বেদান্ত-দর্শনের একটি প্রধান সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। এই সূত্রটিতে ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ বলা আছে। যাহা হইতে জগতের প্রকাশ, যাহাতে জগতের স্থিতি, যাহাতে জগতের পরিণতি লাভ, তিনিই ব্রহ্ম। এই তত্ত্বটি চণ্ডীগ্রন্থে বহু স্থানে কথিত হইয়াছে। স্তবে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥ (১।৭৫-৭৬)

হে দেবি, তুমি-ই এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিতেছ, তুমিই সর্ব্বদা ইহাকে সৃষ্টি করিতেছ, তুমিই ইহাকে পালন করিতেছ, অন্তকালে তুমিই ইহাকে সংহার করিয়া থাক। হে জগন্ময়ি, বিবিধ বস্তুর সৃজন-কালে তুমিই সৃষ্টি-শক্তি, পালনকালে তুমিই স্থিতি-শক্তি, অন্তকালে তুমিই সংহারিণী শক্তি।

চণ্ডীর মহাকালিকা, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। মহাকালিকা হইতে উদ্ভব, মহালক্ষ্মীতে স্থিতি, মহা-সরস্বতীতে চরমতা প্রাপ্তি-একথাও পূর্ব্বে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্ত-মতে সকল অসম্ভবতার সমাধান ব্রহ্মসত্তায়। সকল বিরোধিতার সমন্বয় বিরাট বস্তু ব্রহ্মস্বরূপে। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অপরিণামী, বিশ্বগ হইয়াও বিশ্বাতিগ। বেদান্ত-দর্শনে সূত্র আছে—

তত্তু সমন্বয়াৎ

অচিন্ত্য শক্তি আছে ব্রহ্মবস্তুতে। তাঁহার সামর্থ্যেই এই সমন্বয় সম্ভব হয়।

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।

দেবীমাহাত্ম্যে মহাদেবীরও এই অচিন্ত্য-শক্তির কথা বলা হইয়াছে।

"কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ।" (৪।৬)

রূপং তবৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ॥" (৪।২১)

অবিচিন্ত্যশক্তি মহাদেবীতেও বহু বিরোধিতার সমন্বয় রহিয়াছে। ব্রহ্মা স্তবে বলিয়াছেন—

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥ ১।৭৭

যিনি মহাবিদ্যা, তিনিই আবার মহামোহা। যিনি মহাদেবী, তিনিই আবার মহা-অসুরী। এই অদ্ভুত বিরোধিতার সমন্বয় মহাদেবীতে।

দেবতাগণ স্তবে বলিয়াছেন—

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ৪।২৬

জগতে তোমার যে সকল সুন্দর রূপ ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। অতি সৌম্যমূর্ত্তিও তাঁহার, অতীব ঘোরা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিও তাঁহার। এই অপূর্ব্ব বিরোধিতা মহাদেবীতে সমন্বয় প্রাপ্ত। পরবর্ত্তী স্তবে দেবতারা কহিয়াছেন—

অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ। ৫।১৩

তুমি অতি স্নেহময়ী, অতি ভয়ঙ্করী। তোমাকে নমস্কার। মহিষাসুর বধের পর দেবগণ স্তবে বলিয়াছেন—

বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্।
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র॥

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা,
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥ (৪।২১-২২)

হে মাতঃ, তোমার বীর্য্য অসুরদিগের বিনাশকারী। তোমার দয়া শত্রুদের প্রতিও প্রকাশিত। তোমার এই পরাক্রমের তুলনা কাহার সহিত হইতে পারে? মনোহারী ও ভয়ঙ্করী এমন রূপই বা আর কোথায় আছে? হৃদয়ে দয়া এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা কেবল তোমাতেই দেখা গেল।

এইরূপ মনোহারিত্ব ও ভয়ঙ্করত্ব, এইরূপ কৃপাময়তা ও নিষ্ঠুরতা, এই বিপরীত ধর্মের একত্র সমন্বয় একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেই সম্ভব। মহাদেবী ব্রহ্মময়ী বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব ও চণ্ডীপ্রতিপাদ্য মহাশক্তিতত্ত্ব অভিন্নই।

বেদ ও বেদান্তের সঙ্গে চণ্ডীর সম্বন্ধের কথা কিঞ্চিৎ বলা হইল। এখন গীতার সঙ্গে চণ্ডীর কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে। বেদবেদান্ত অনেকেই আলোচনা করেন না। কিন্তু গীতা ও চণ্ডী অনেক হিন্দুর গৃহেই বিরাজিত আছেন। অনেকে নিত্য গ্রন্থদ্বয় পূজা ও পাঠ করেন। এইজন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

চণ্ডী ও গীতা কোনখানিই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত তেরটি অধ্যায়। গীতা মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের আঠারটি অধ্যায়। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মহাভারত, উভয় গ্রন্থই বেদব্যাসের রচনা।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা তান্ত্রিক ও বৈদিক দুইটি প্রবাহের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় তান্ত্রিক ও বৈদিক দুইটি প্রবাহের কথা এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। বেদগাভীর দুগ্ধ যদি

গীতা হয়, তাহা হইলে তন্ত্রগাভীর দুগ্ধ চণ্ডী, একথা নিশ্চয় বলা চলে। দুইটি ধারার সম্যক্ জ্ঞান ও তাহাদের মিলনামিলনের রহস্য অবগত না হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির সমগ্ররূপ দর্শন করা সম্ভব নহে। অতএব এই সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক রূপের উপলব্ধি করিতে চণ্ডী ও গীতা দুইটি গ্রন্থই অপরিহার্য্য।

চণ্ডীগ্রন্থে সাতশত মন্ত্র আছে। গীতাগ্রন্থেও সাতশত শ্লোক আছে। চণ্ডীর মন্ত্রগণনায় "দেব্যুবাচ" "ঋষিরুবাচ" প্রভৃতি বাক্যকেও ধরা হইয়াছে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ এইরূপ বাক্যকে তিনটি মন্ত্র ধরা হইয়াছে। গীতায় ভগবানুবাচ, অর্জ্জুন উবাচ, প্রভৃতি কথা গণনায় ধরা হয় নাই। চণ্ডীতে মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৭৮টি মাত্র।

চণ্ডী ও গীতা উভয় গ্রন্থেই ষট্‌সংবাদ দৃষ্ট হয়। গীতা, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। সেই কথাই সঞ্জয় বলিয়াছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। উহাই আবার বৈশম্পায়ন বলিতেছেন জনমেজয়কে। চণ্ডীতেও সেইরূপ মেধা ঋষি দেবী-মাহাত্ম্য বলিতেছেন, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে। সেই কথাই মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিতেছেন ভাগুরি মুনিকে। উহাই আবার পক্ষিরূপী দ্রোণ মুনির চারিপুত্র, কীর্ত্তন করিতেছেন জৈমিনি মুনির নিকটে। ইহা চণ্ডীর ষট্‌সংবাদ। গ্রন্থে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে ঐ ছয় ব্যক্তি তাহার প্রধান দ্রষ্টা বা সাক্ষী। দ্রষ্টার দর্শনেই সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

চণ্ডী ও গীতা উভয়েই গুরুশিষ্য-সংবাদ। মোহগ্রস্ত রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য, আচার্য্য মেধার শরণাগত হইয়াছেন। শিষ্যদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন মুনিবর। গীতার

আচার্য্য, অর্জ্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ। বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুন শরণাগত হইলে 'শিষ্যস্তেঽহং' বলিয়া উপদেশপ্রার্থী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গুরুপদে আসীন (কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুং) হইয়া উপদেশ-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উভয় গ্রন্থের শ্রোতৃগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়াছেন—তাহা আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক সমস্যা নহে। উভয় ক্ষেত্রেই পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের সমস্যায় তাঁহারা বিচলিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু উহার সমাধানার্থ আচার্য্যেরা যে উপদেশ করিয়াছেন উহা সর্ব্বতোভাবেই পারমার্থিক। সমস্যার সমাধানে চণ্ডীর আচার্য, দেবী মহামায়ার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আর গীতার আচার্য্য, আত্মতত্ত্ব ও পুরুষোত্তম-তত্ত্ব কহিয়াছেন। ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে পারমার্থিক প্রসঙ্গ কেন? ইহার উত্তর এই যে—সমস্যা যাহাই হউক না কেন, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তদনুকূল জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ নিখুঁতভাবে না হইলে কোন বিষয়েরই শেষ সমাধান হইতে পারে না। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান মিলিবে আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনে। ইহা সনাতন ধর্ম্ম ও আর্য্য ঋষির এক অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গী।

চণ্ডীর মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে যুদ্ধ। গীতার আবির্ভাবও যুদ্ধের প্রাক্কালে। চণ্ডীর যুদ্ধ মূলতঃ সাধকের অন্তরের। গীতার যুদ্ধ বাস্তবের, বাহিরের। চণ্ডীর যুদ্ধ সূক্ষ্মস্তরের, দেবতায় ও অসুরে। এই দেবাসুরের তাত্ত্বিক রূপ, গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

যাহারা আমার ভক্ত' আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, আমি তাহাদের অজ্ঞান-তম বিনাশ করি, আত্মভাবস্থ উজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা। সকলের অন্তরে অজ্ঞান-তম আছে—উহাই অসুর। জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে উহাই ছন্দোহীনতা বা সুরবিরোধী অসুরভাব। আর আত্মভাবস্থ জ্ঞানদীপই মহাবিদ্যা-রূপিণী মহাদেবী। সকল আসুরিক শক্তির ইনি বিনাশকারিণী। অজ্ঞানতমোরূপ আসুরিকতা বিধ্বংস করিতে মহাশক্তি দুর্গা প্রকটিতা। চণ্ডীর মহাদেবী নিখিল ভাস্বর জ্ঞানদীপের সমষ্টিভূতা মূর্ত্তি। সুতরাং গীতায় "নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" মন্ত্রের মধ্যে চণ্ডীর অসুরধ্বংসকারী মহাযুদ্ধের রহস্যটি সূত্রাকারে বিরাজিত।

চণ্ডীর যুদ্ধ মনোময় ও বিজ্ঞানভূমিতে স্থিত। অসুরগুলি মনোময় ভূমির বস্তু, মহাদেবী বিজ্ঞানময় ভূমির প্রজ্ঞাঘন শক্তি। এই দু'য়ে যুদ্ধ। গীতায় যুদ্ধ কিন্তু মানুষের মাটির উপর। একই অন্নময় প্রাণময় ভূমির নীতির দুর্নীতির যুদ্ধ। গীতার যুদ্ধ রাজনৈতিক সমর, চণ্ডীর যুদ্ধ সাধন-সমর। গীতার কথা যুদ্ধের মুখে, চণ্ডীর কথা যুদ্ধের মধ্যে। চণ্ডীর প্রথম-চরিত্রের প্রথমাংশ ভূমিকা বা ঘটনার ক্ষেত্র-প্রস্তুতি। গীতার প্রথম অধ্যায়ও তাহাই। চণ্ডীতে সুরথ রাজা বটেন কিন্তু এক্ষণে রাজ্যভ্রষ্ট। রাজ্যচ্যুত রাজা বনে আসিয়াছেন কিন্তু বানপ্রস্থী হন নাই। বনে আশ্রয় লইয়াও বিষণ্ণচিত্ত। আত্মীয় স্বজন রাজপ্রাসাদ অশ্বগজ পাত্রামাত্য সকলের অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তাকুল।

আর সমাধি বৈশ্য? তিনিও বনে আসিয়াছেন। ধনলোভী, নিজ স্ত্রীপুত্রগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া। রাজা ও বৈশ্যের বনেই দেখা।

উভয়ের একই অবস্থা। আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি মমতাকৃষ্ট। তাহাদের জন্য অতীব দুঃখার্ত্ত (দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ)।

গীতায় অর্জ্জুনের চিত্তও অনেকাংশে অনুরূপভাবে বিষাদযুক্ত। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হস্তে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ হইবে ইহা বহু পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে। অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া মহাশক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্জ্জুন বীরপুঙ্গব। যুদ্ধ তাঁহার কাছে ক্রীড়ার মতো। কিন্তু আজ রণাঙ্গনে সৈন্য দর্শন করিতে করিতে এ কি হইল! অপ্রত্যাশিত "অকীর্ত্তিকর" হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও মহামোহ তাঁহার উপস্থিত হইল। যাহাদের অশেষ হীনতার কথা অন্তরে গাঁথা আছে সেই আত্মীয় পরিজনের প্রতি মমতাকৃষ্ট হইলেন, যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই এমন মোহ যে, তাঁহাদের বধ করা অপেক্ষা নিজ মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন।

"যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু"—(চণ্ডী ১।৩৩)

চণ্ডীতে মেধা ঋষির পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া রাজা সুরথ এই মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ" (১।৪৪)

অর্থাৎ বিষয়ের দোষ স্পষ্টতঃ দেখা সত্ত্বেও আমরা তাহার প্রতি মমত্ব হেতু আকৃষ্ট হইতেছি কেন? গীতার মধ্যেও অর্জ্জুনের অনুরূপ প্রশ্ন দৃষ্ট হয়—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ (৩।৩৬)

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কে আমাদের চিত্তকে বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত করে? উভয় প্রশ্নের মর্ম্মার্থ একই। সব বুঝিয়াও ভুল করি, পাপে লিপ্ত হই কেন?

চণ্ডীর জিজ্ঞাসু রাজা ও বৈশ্য নিজেদের জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন। প্রশ্ন করিতেছেন—

"তৎ কেনৈতন্ মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি"। (১।৪৪)

অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই মোহ কেন? উত্তরে ঋষি বলিয়াছেন যে, তোমাদের এই বিষয় ও ইন্দ্রিয় মিলন হেতু যে অবরোধ তাহাকে যদি জ্ঞান বল, তাহা হইলে ঐরূপ জ্ঞান পশুপক্ষী-দেরও আছে।

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ (১।৫০)

বস্তুতঃ এই ইন্দ্রিয়বিষয়-মিলনজ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নামান্তর। চণ্ডীর এই উত্তরের প্রতিধ্বনি গীতাতেও শ্রুত হয়। অর্জ্জুনকে মৃদুমন্দ ভর্ৎসনার সুরে শ্রীভগবান্ যেন এই কথাই বলিয়াছেন—"অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানী ব্যক্তির মত কথা বলিতেছ (প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে), কিন্তু কাজ করিতেছ অজ্ঞানের মত। কারণ, যাহা শোকের বস্তু নয় (অশোচ্য) তাহারই জন্য শোক করিতেছ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরূপ করেন না।"

চণ্ডীতে সুরথ-সমাধির মোহগ্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত মনকে ঋষি প্রশান্ত করিয়াছেন চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা দেবী মহামায়ার পূজা করাইয়া। গীতায় অর্জ্জুনের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বিষাদিত চিত্তকে স্বরূপস্থিত করাইয়াছেন শ্রীভগবান্, উপদেশামৃত দ্বারা। সুরথ-

সমাধির বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে মাতৃদর্শনে—অর্জ্জুনের মোহ কাটিয়াছে সত্য-দর্শনে, বিশ্বরূপ-দর্শনে।

চণ্ডী ও গীতার ভূমিকায় এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও পরিবেশের ভিন্নতা সুস্পষ্ট। চণ্ডীর উপদেশের পরিবেশ ঋষির তপোবন। উহার প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য—প্রশান্ত শ্রীসম্পন্ন, রমণীয় শান্তরসপ্রধান। চণ্ডীর আলোচ্য বিষয় দেবাসুর-সংগ্রাম—রজোময় ও তমোময়। পক্ষান্তরে গীতার পটভূমিকা এক মহাসমরের। যুদ্ধক্ষেত্র স্বভাবতঃই রজস্তমোগুণময়। কিন্তু গীতার আলোচ্য বিষয় আত্মতত্ত্ব—গভীর শান্তরসাত্মক। চণ্ডীর প্রশান্ত ভূমিতে যুদ্ধের অশান্ত বার্ত্তা। গীতার অশান্ত সমরাঙ্গনে প্রশান্তির বার্ত্তা। চণ্ডীর মধ্যমচরিতে দেবী মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব ও গীতার বিশ্বরূপ দর্শন, তত্ত্বতঃ একই। উভয় ক্ষেত্রেই অনুভূতি বিজ্ঞানময় ভূমির—সামগ্রিক দৃষ্টি। বহুত্বে একত্ব, একত্বে বহুত্ব। সমগ্র সত্তাকে একেবারে একত্র একত্বে দর্শন। "ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্" একস্থ সমগ্র বিশ্ব। বিশ্বচরাচরের সকলই একদেহে স্থিত, ইহাই অপরোক্ষ দর্শন। ইহাই বিশ্বরূপদর্শনের মর্ম্মকথা।

চণ্ডীতেও মায়ের মহীয়সী স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে নিখিল দেবগণ-শক্তি-সমূহ প্রকটিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তি একই বিশ্বজননীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাঁহার বাহুই বিষ্ণু, চরণই ব্রহ্মা, শ্রীবদনই শিব। কেশে যম, নাসিকায় পবন, নয়নে অগ্নি। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আয়ুধগুলি মায়ের শ্রীহস্তে শোভমান। মায়ের দর্শনেই নিখিল দেবতা ও দৈবশক্তির দর্শন মেলে। এক স্বরূপে বিশ্বদেবতার দর্শন এক নিরুপম দর্শন।

গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের ভীতিযুক্ত বিস্ময়। চণ্ডীতে মাতৃদর্শনে দেবগণের প্রীতিযুক্ত বিস্ময়। অর্জ্জুন 'হৃষ্টরোমা' ভয়ে। দেবগণ "পুলকোদ্গমচারুদেহাঃ" আনন্দে। দেবগণ জানেন, মা আমাদের সকল অমঙ্গল নাশ করিবেন—তাই উল্লসিত। অর্জ্জুন জানেন না ইনি কে, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ"

উগ্রমূর্ত্তি আপনি কে আমাকে বলুন। উত্তরে জানিলেন—তিনি কাল, লোকসংহারে প্রবৃত্ত—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"।

চণ্ডী ও গীতায় শ্রীভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবের কথা ঠিক একই রূপ; চণ্ডীতে দেবগণের স্তুতিতে প্রসন্না দেবীর সান্ত্বনা-বাক্য—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ ১১।৫৫

যখন যখনই দানবের অভ্যুদয়ে জীবগণ এইরূপে উৎপীড়িত হইবে তখন তখনই আবির্ভূতা হইয়া শত্রু নাশ করিয়া শান্তি আনয়ন করিব; গীতাতেও শ্রীভগবান্ অনুরূপ বাণী বলিয়াছেন—যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুগণের রক্ষণ, দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। "সম্ভবামি যুগে যুগে।" উভয় বাণীতেই বুঝা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী দুর্গা উভয়েরই দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত উৎপীড়িত জীবগণের জন্য দয়া আছে। আমাদের দুঃখ তাঁহাদের প্রাণে লাগে। ডাকিলে শোনেন। প্রয়োজন বোধ করিলে মর্ত্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন। অনুগ্রহ করিয়া দুঃখ দূর করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন নন্দ-গোকুলে যশোদার ঘরে। সেই যশোদার ঘরেই মা আসিয়াছেন যোগমায়ারূপে কন্যা হইয়া একই রজনীতে একই সময়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে যশোদা যমজ প্রসব করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ও যোগমায়া। এই জন্য কন্যা যোগমায়াকে জগতে "বিষ্ণোরনুজা" বলা হইতেছে। বসুদেব তাঁহার পুত্রকে যশোদার শয্যায় রাখিলে দুই স্বরূপ একত্ব প্রাপ্ত হন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—নিজ মায়াশক্তির সঙ্গে সম্ভূত হই। আর সেই আত্মমায়া-স্বরূপিণী দেবীই চণ্ডীতে বলিয়াছেন—আমি নন্দগোপ-গৃহে যশোদা গর্ভে আসিব "নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা" ১১।৪১)—এই একবাক্যতা চমৎকার।

গীতায় শ্রীভগবান্ নিজের স্বরূপ বলিয়াছেন, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" (১২।২০)। চণ্ডীতে ঋষি মহাদেবীর তত্ত্ব বলিয়াছেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" ৫।১৭

আত্মার স্বরূপ হইল চেতনা বা চৈতন্যস্বরূপতা। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি আছি সর্বভূতে আত্মা রূপে। ঋষি বলিলেন, মহাদেবী আছেন সর্বত্র চেতনারূপে। ভিন্নতা কিছুই নাই।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—এই বিশ্বজগৎ আমার একাংশে অবস্থিত—

"একাংশেন স্থিতো জগৎ" ১০।৪২

চণ্ডীতে দেবতাগণ মায়ের স্তবে বলিয়াছেন—

"সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতম্" ৪।৭

তুমি সকলের আশ্রয়। এই সমস্ত জগৎ তোমার অংশভূত। উভয় একই কথা।

গীতা বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই তত্ত্বের মিলনে সংসার সৃষ্টি। গীতা সমস্ত বিকার ও গুণকে প্রকৃতিসম্ভব বলিয়াছেন—

"বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্" ১৩।১৯

দেহস্থ পুরুষকে বলিয়াছেন 'ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ' (১৩।২৩) দেবীমাহাত্ম্যে মহাদেবী আদ্যা পরমাপ্রকৃতি (পরমা প্রকৃতিরাদ্যা ৪।৭)। কিন্তু এই পরমাপ্রকৃতির মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয় সম্মিলিতা, কারণ মহাদেবী কেবল নিখিল বিকার ও গুণের মূল নহেন—তিনি চৈতন্যময়ী এবং মহেশ্বরীও বটেন। মহাদেবী প্রকৃতি বলিয়া ত্রিগুণময়ী, আবার পুরুষ বলিয়া ত্রিগুণের দোষের দ্বারা লিপ্ত নহেন। এইরূপ আশ্চর্য্যজনক তত্ত্ব বলিয়া মহাদেবী হরিহরাদিরও অজ্ঞেয়া।

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা ॥ (৪।৫)"

তুমি সমস্তজগতের কারণ। তুমি ত্রিগুণা হইয়াও দোষে লিপ্ত নহ। হরিহর প্রভৃতিরও তুমি অজ্ঞেয়া। অপরা শব্দের অর্থ টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, অনধিগতস্বরূপা। শ্লোকের "অপি" শব্দের অর্থ উক্ত টীকাকার লিখিয়াছেন—

"অপীত্যাশ্চর্যে, ত্রিগুণাপি দোষৈর্ন জ্ঞায়সে,
রাগাদিভির্ন বিষয়ীক্রিয়সে, আশ্চর্য্যমেতৎ ॥"

ত্রিগুণাদি প্রকৃতির স্বরূপ; গুণাতীতত্ব পুরুষের স্বরূপ।—এই দুই গুণের একত্র মিলনটিই আশ্চর্য্য বস্তু।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—যেখানে যাহা কিছু শ্রীমৎ, উর্জ্জিত ও বিভূতিযুক্ত, সকলই আমার অংশভূত বলিয়া জানিবে।

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্"॥ (১০।৪১)

চণ্ডীতে ভগবতী অসুরকে বলিলেন, রে দুষ্ট! দেখ্ আমার বিভূতি-সকল আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। এই বলিয়া আকর্ষণ করিলেন। অসুর দেখিল অগণিত মাতৃকামূর্ত্তি দেবীর দেহে প্রবেশ করিতেছে, প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যাইতেছে। মা বলিলেন,—আমি ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই যুদ্ধে বহুরূপে যে অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা উপসংহার করিলাম। আমি এখন একাই আছি, একাই যুদ্ধ করিব, তুই স্থির হ।

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥" (১০৮)

নিখিল বিভূতি যে এক বস্তুরই বহু প্রকাশ—গীতায় ইহা সুব্যক্ত, চণ্ডীতে বাস্তবায়িত।

বৈশেষিক দর্শনের ঋষি কণাদ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন, "যতো নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়ৌ স ধর্ম্মঃ" যাহা হইতে অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়স হয় তাহাই ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের ফল অভ্যুদয়। নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের ফল নিঃশ্রেয়স। পূর্ণাঙ্গ বৈদিক ধর্ম্মের দিকে চণ্ডীর লক্ষ্য নিবদ্ধ।

সুরথ ও সমাধির অর্চ্চনায় মা পরিতুষ্টা হইয়া বলিলেন,—বর যাচ্ঞা কর। রাজা চাহিলেন অবিভ্রংশ রাজ্য। সমাধি চাহিলেন তত্ত্বজ্ঞান। যে জ্ঞানের উদয় হইলে মিথ্যা, আমি ও আমার নাশ

প্রাপ্ত হয়, তাহাই চাহিলেন সমাধি। রাজা চাহিলেন অভ্যুদয়, বৈশ্য চাহিলেন নিঃশ্রেয়স। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে তেমন ভাবেই ভজনা করি। শ্রীচণ্ডীতে তাহা প্রকট করিয়া দেখান হইল। সুরথ রাজা ভজনা করিয়াছেন রাজ্যসুখের জন্য, সমাধি বৈশ্য ভজনা করিয়াছেন মুক্তিসুখের জন্য। ভগবতী উভয়কেই বাঞ্ছানুরূপ ফলদান করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন চণ্ডীতে শুধু প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম—ভোগের কথা। গীতায় শুধু নিবৃত্তি-ধর্ম্ম, ত্যাগের কথা—যোগের কথা। এই কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। চণ্ডীতে যেমন ভোগের কথা আছে, মোক্ষ বা অপবর্গের কথাও যথেষ্ট আছে। গীতায়ও যে মোটেই ভোগের কথা নাই, এমন কিছু নহে।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। এই কথা সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি-মার্গের, ভোগের কথাই। "উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ"—এই ধুয়া ভগবান্ গীতায় আগাগোড়াই বজায় রাখিয়াছেন। বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াও বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।" (১১।৩৩)

অতএব অর্জ্জুন, তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। শত্রু জয় করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। ইহা ভোগমার্গেরই নির্দ্দেশ, "যুধ্যস্ব জেতাসি" যুদ্ধ কর জয় হইবে, এই কথা ত্যাগ-মার্গের নহে। তবে

গীতা ও চণ্ডীতে পার্থক্য এই,—চণ্ডীতে ভোগ যোগ দুইটি পৃথক্ বস্তু। ভোগের জন্য ভোগ, ত্যাগের জন্য যোগ। ভোগ চাও এক পথ, ত্যাগ চাও আলাদা পথ। আর গীতায় ভোগ যোগ পৃথক্ নহে। গীতা ভোগের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ত্যাগের ভূমিকায়। সর্ব্বতোভাবে ত্যাগের ভূমিতে দাঁড়াইয়া ভোগ কর। গীতায় দৃষ্টি নিবৃত্তির দিকে - মূল কথা তার ত্যাগ, কিন্তু নিবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, ত্যাগের সঙ্গে ভোগের কোন বিরোধিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। গীতায় ভোগ ত্যাগের কুক্ষিগত। ভোগ কর ভোগস্পৃহা-শূন্য হইয়া, কর্ম্ম কর কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর আমাকে স্মরণ করিয়া। "মামনুস্মর যুধ্য চ" (৮।৭)। কর্ম্ম কর কর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়িয়া—শত্রু জয় কর নিমিত্তমাত্র হইয়া। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর শত্রুভাব না রাখিয়া, 'নির্ব্বৈর' হইয়া। গীতায় প্রেরণা আছে কর্ম্ম করাইতে- কিন্তু সেই করা-ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে, কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই—কর্ম্ম আছে কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা নাই। এই কর্ত্তৃকর্ম্মহীন স্তব্ধ ক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞান-কর্ম্মের সমন্বয়, ভোগযোগের সমন্বয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একাত্মতা। ভোগের প্রতীক ধনুর্দ্ধর পার্থ। ত্যাগের প্রতীক যোগেশ্বর কৃষ্ণ। গীতা ধনুর্দ্ধারীর রথে যোগেশ্বরকে সারথি করিয়া এই কথাই জানাইয়াছেন—পূর্ণজ্ঞানী হইয়া, কর্মের অতীত হইয়া অপর্যাপ্ত কর্ম কর। ভোগাতীত হইয়া ভোগের মধ্যে বাস কর। যোগেশ্বরকে জীবন-রথে সারথি করিয়া কর্মের ধনু ধারণ কর। সর্ব্বশেষে সঞ্জয়ের মুখেও তাহাই শুনি—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম"॥ (১৮।৭৮)

সুতরাং গীতা ও চণ্ডীর পার্থক্য এই যে, চণ্ডী দুই হাত বাড়াইয়া এক হাতে ভোগ ও অপর হাতে যোগ দিতেছেন। আর গীতা দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া ভোগ-যোগের এক অপূর্ব্ব মিলনময় সন্দেশ বিতরণ করিতেছেন।

চণ্ডীপাঠে "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হেতু অনেকে মনে করেন—চণ্ডীতে শুধু দেহি দেহি রব, কেবল ভোগময় রাজ্যের জন্যই প্রার্থনা। এইরূপ মনে করা ঠিক নহে। প্রথমতঃ 'রূপং দেহি জয়ং দেহি' মন্ত্রটি মূল চণ্ডীর নহে, উহা অর্গলা স্তোত্রের অন্তর্গত। ঐ স্তবপাঠের বিধি আছে চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে। দ্বিতীয়তঃ 'রূপং দেহি জয়ং দেহি' ইত্যাদি প্রার্থনার মধ্যে দ্বিবিধ তাৎপর্য্যই অন্তর্নিহিত আছে। যিনি ভোগাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার কাছে একপ্রকার অর্থ, যিনি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার কাছে অন্য প্রকার অর্থ। যিনি ভোগী তিনি দেহের রূপ কামনা করেন, যিনি ত্যাগী তিনি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার প্রার্থনা করেন। ভোগী লৌকিক যুদ্ধে, মামলা মোকদ্দমায় জয় কামনা করেন, ত্যাগী সাধন-সমরে জয়াকাঙ্ক্ষা করেন। ভোগী চাহেন লৌকিক নাম যশঃ খ্যাতি, তাই বলেন যশো দেহি! সাধক চাহেন ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জগতে কীর্ত্তিত হইতে—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥

ভোগার্থী বাঞ্ছা করেন লৌকিক শত্রুর ধ্বংস; তাই বলেন "দ্বিষো জহি"। ত্যাগী যোগী চাহেন সাধন-পথে যারা বাধক সেই কামাদি শত্রুর অবলুপ্তি। ভোগী যেখানে পাঠ করেন—

"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্"

সাধকগণ সেখানে চিরকাল পাঠ করেন—

"ভক্তিং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং ॥"

তদ্ভিন্ন মায়ের কাছে অবনত হইয়া যে যাহাই কামনা করুক, মা সকল সময় সকলকে তা দেন না। যে বস্তু দিলে একজনের উপকার অন্যের ক্ষতি তাহা দেন না। যাহাতে জগতের সকলের কল্যাণ তাহাই দেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া জগজ্জননী বলিলেন—

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।

তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ (১১।৩৭)

হে দেবগণ, আমি বরদাত্রী, তোমরা মনে মনে জগতের হিতকর যে ইচ্ছা করিতেছ তাহা প্রার্থনা কর, এখনই দিতেছি। নিষ্কাম ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় নয়। সে সর্ব্বদা কর্ম্ম করে 'সর্ব্বভূতহিতে রত' হইয়া। সুতরাং মা যে জগতের মঙ্গলময় বর দিবেন, তাহা নিষ্কাম ভক্তেরও কাম্য। দেবতাগণও বলিয়াছেন—

ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব। (১১।৩৫)

হে স্তবনীয়ে দেবি! ত্রিভুবনবাসী জনগণের জন্য বরদাত্রী হও। কেহ কেহ মনে করেন গীতা ভক্তির কথায় পূর্ণ। চণ্ডীতে ভক্তির গন্ধও নাই। এরূপ মনে করাও ঠিক নহে। গীতা শুধু ভক্তিকথায় পূর্ণ নয়—জ্ঞান কর্ম্ম যোগ সাংখ্য সকল বস্তুর মিলনময় গীতাগ্রন্থ। চণ্ডীগ্রন্থও ভক্তিশূন্য নহে। যে অর্গলা-স্তবে "রূপং দেহি জয়ং দেহি" প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে সেই স্তবেই আছে—

"দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে (২৪)

হে দেবি অম্বিকে, তুমি ভক্তদিগকে অনর্গল আনন্দ দান করিয়া থাক। ভক্তদিগকে যে কত আনন্দ দান করেন তাহার প্রমাণ চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণের স্তুতিকালে। স্তবপরায়ণ দেবগণের বর্ণনায় ঋষি বলিয়াছেন—"প্রণতি-নম্রশিরোধরাংসাঃ" "প্রহর্ষপুলকোদ্গম-চারুদেহাঃ" তাঁহারা গ্রীবা ও স্কন্ধ নত করিয়া প্রণাম করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ উদ্গত হওয়ায় সুন্দর দেহশালী হইয়া মহাদেবীকে স্তব করিয়াছিলেন। আনন্দ গভীর না হইলে পুলক হয় না।

চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্তবের শেষে বলিয়াছেন—

যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ। (৫।৮২)

আমরা ভক্তিনম্র হইয়া স্মরণ করিলে জগন্মাতা তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ্ নষ্ট করিয়া থাকেন। সর্ব্বশেষে চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের স্তবে দেবগণ কহিয়াছেন—হে দেবি, মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

"পাপেভ্যো নঃ সুতানিব" (১১।২৭)

এই প্রার্থনার মধ্যে প্রীতিপূর্ণ আর্ত্তি বিদ্যমান। পরেই বলিয়াছেন, তোমার যাহারা আশ্রিত, তাহাদের আর বিপদ্ নাই।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং (১১।২৯)

আশ্রিত, শরণাগত, মুখের কথায় হয় না—হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে। তারপর একটি আশ্চর্য্য সংবাদ বলিয়াছেন—

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি (১১।২৯)

তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা সকলের আশ্রয় হইয়া

থাকে। সকলের বলিতে নিখিল বিশ্বের সকলের। আর এক মন্ত্রে তাহা স্পষ্টতর করিয়াছেন—

"বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ" (১১।৩৩)

যাহারা তোমার কাছে ভক্তিভরে বিনম্র তাহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। কতখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মাতৃচরণ আশ্রয় করিলে সে নিখিল বিশ্বের আশ্রয়স্থল হইতে পারে তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা হরিভক্ত সম্বন্ধে বলেন—

"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।"

চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্তবটিতে পুনঃ পুনঃ

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

শত শতবার নমস্কার। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। ৯।৩৪

মন্মনা, মদ্ভক্ত হইয়াই পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে বলিয়াছেন।

ভাগবতীয় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের গুণাবলির মধ্যে 'হতারিগতি-দায়কত্ব' একটি প্রধান গুণ। যে শত্রুকে তিনি নাশ করেন তাহারও সদ্‌গতি দান করেন। পূতনামোক্ষণলীলায় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্।

জিঘাংসাবৃত্তি লইয়া আসিয়াও পূতনা সদ্‌গতি পাইল। চণ্ডী গ্রন্থে মহিষাসুরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে, স্তবে দেবগণ কহিয়াছেন, মহিষাসুর বধকালে তোমার বাহিরে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও "চিত্তে কৃপা" ছিল। তোমার ভয়ঙ্কর শস্ত্রপ্রভাসমূহের ঝক্‌মকানিতে অসুরদের দৃষ্টি যে নষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ তোমার অর্দ্ধ-চন্দ্রযুক্ত স্নিগ্ধ বদনখানি তাহারা দেখিতেছিল (৪।২০)। তোমার শস্ত্রদ্বারা পবিত্র হইয়া তাহারা

উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক, এইরূপ মতি লইয়াই তুমি তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছ। নতুবা ত শুধু দৃষ্টি দ্বারাই তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিতে পারিতে।

দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী॥ (৪।১৯)

করুণাময়ী মহাদেবীও যে হতারিগতিদায়িকা ইহা এই মন্ত্রে সুব্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থশেষে উভয় গ্রন্থের ফলশ্রুতিও অনুরূপ। গীতার শেষে বক্তা বলিতেছেন—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ (১৮।৭০)

যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবেন। আরও বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।

সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ১৮।৭১

যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া গীতা শ্রবণ করেন তিনি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যবানের প্রাপ্য শুভ লোক প্রাপ্ত হন। দেবী-মাহাত্ম্যেও মহাদেবী বলিয়াছেন—

শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ॥

যে আমার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহার কোন পাপ, বা পাপজনিত বিপদ্ হইবে না। আরও বলিয়াছেন—

তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥ (১২।৭)

সেই জন্য, আমার এই মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে সকলের পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত। তাহাই উৎকৃষ্ট স্বস্ত্যয়ন। আরও অনেক ফলের কথা আছে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা—

সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।

আমার মাহাত্ম্য আমার সন্নিধিকারক। পুরাণে শ্রীভগবান্ ও বলিয়াছেন—

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

গীতা শ্রবণে অর্জ্জুনের মোহ নষ্ট হইল—স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, চিত্ত স্থির হইল, সকল সংশয় কাটিয়া গেল। গীতা শ্রবণ করিতে করিতে "সুদুর্দর্শ বিশ্বরূপ" দর্শন হইল।

দেবী মাহাত্ম্যে ঋষিবর চণ্ডীগ্রন্থ শুনাইয়া শ্রোতা সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্যকে দেবীর চরণে শরণাগতি গ্রহণ করিতে বলিলেন।

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥ (১৩।৫)

সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। তাঁহাকে আরাধনা করিলে তিনি মনুষ্যদিগকে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ দান করিয়া থাকেন।

ঋষি তাঁহাদিগকে আরাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আরাধনার ফলে তাঁহারা মায়ের সাক্ষাৎকার ও বাঞ্ছানুরূপ ফল লাভ করিলেন।

ঋষি বলিলেন, পরমেশ্বরী ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ দান করেন

এখানে স্বর্গ শব্দের অর্থ যদি ইন্দ্রাদিলোক ধরি, তাহা হইলে তজ্জন্য দেবীর আরাধনা ও শরণ-গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। কেন না স্বর্গাদি পুণ্য ফলেই লাভ হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে", আবার ভ্রষ্ট হইতে হয়। এই জন্য স্বর্গ শব্দকে মোক্ষার্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্বর্গ অর্থে মোক্ষ হইলে, অপবর্গ অর্থ কি হইবে ইহাই আলোচনীয়।

অপবর্গ শব্দ মোক্ষ অর্থেই গৃহীত হয়। কিন্তু কখনও কখনও ভক্তি-শাস্ত্রে ভক্তি অর্থেও অপবর্গ শব্দের গ্রহণ দেখা যায়। মহাদেবী ভক্তিদাত্রী এ কথা আদ্যাস্তবে উক্ত আছে—

"সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী"

যাহারা রজোগুণী ভক্ত, মহাদেবী তাহাদের সম্বন্ধে সুখদা। যাহারা সত্ত্বগুণী ভক্ত, তাহাদের সম্বন্ধে মোক্ষদা। যাহারা গুণাতীত তাহাদিগকে জগন্মাতা ভক্তি দান করিয়া থাকেন।

ভক্তি অর্থে অপবর্গ শব্দের প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত ভক্তিশাস্ত্র হইতে দেওয়া যাইতেছে। মহাপ্রভু ভ্রমণকালে দক্ষিণ দেশ হইতে আনিয়াছিলেন বিল্বমঙ্গলঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' শ্রীগ্রন্থ। সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎ-কল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরী নির্ব্বাণনির্ব্ব্যাকুলম্।
স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবিবিলসদ্-গোপীসহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্ত-নতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥২ ॥

বৃন্দাবনে পরমোদার কিশোরাকৃতি একটি বস্তু আছে। তাহার চারিটি বিশেষণ—(১) স্বর্গীয় তরুণীগণের হস্তাগ্র হইতে বিগলিত

কল্পতরুর পুষ্পদ্বারা সমাবৃত। (২) আবদ্ধ বেণুনাদ শ্রবণে আনন্দে তন্ময়। (৩) কটিদেশ হইতে বারংবার বিগলিত নীবীবন্ধন অবরুদ্ধ করিতে করিতে অতীব শোভাযুক্ত গোপীগণ কর্তৃক বেষ্টিত। (৪) হস্তন্যস্ত-নতাপবর্গং—এই বিশেষণের অর্থ করিতেছেন সারঙ্গরঙ্গদা টীকায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—হস্তেন ন্যস্তনতানাং ভজনোন্মুখানাম্ অপবর্গঃ স্বপার্ষদ-রূপানন্দ-দেহদানেন লিঙ্গদেহভঙ্গঃ যেন। যদ্বা অপবর্গঃ প্রেমভক্তিযোগো যেন।

সুতরাং বিশেষণটির অর্থ হইল, যাহারা শ্রীচরণে নত হইয়া ভজনোন্মুখ হইয়াছে তাহাদিগকে যিনি নিজ পার্ষদ-দেহ অথবা প্রেমভক্তি দান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের গদ্যে এক স্থলে প্রেমভক্তি অর্থে অপবর্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—টীকায় করিরাজ গোস্বামী তাহা নিজ বাক্যের সমর্থনে উল্লেখ করেন।

অতএব চণ্ডীর অপবর্গ শব্দ ভক্তি অর্থে গ্রহণ করিয়া অর্থ করা চলে যে, মহাদেবী পদাশ্রিত যোগ্যজনে ভক্তিধনও দান করিয়া থাকেন। পৌর্ণমাসী কাত্যায়নীরূপে যে তাহা করেন, ভক্তসমাজে তাহা প্রসিদ্ধও আছে।

শ্রুতিসূত্র ও গীতার সঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর সম্বন্ধ, সংক্ষেপে আলোচিত হইল। দেখা গেল মূলতঃ একই মহাসত্য সর্ব্বত্র ঘোষিত। তন্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে বৈদিক সত্যের দর্শনই চণ্ডী—এইরূপ বলা চলে।

শক্তিবাদ ও মহাপ্রভু

শক্তিবাদ হইল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের ভিত্তি। . "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।" ইহা হইল শক্তিবাদের মূলমন্ত্র। শক্তি হইতেই জগৎ জাত, শক্তিতেই জগৎ স্থিত, শক্তিতেই জগৎ বিলয়-প্রাপ্ত। তন্ত্রশাস্ত্রমতে শক্তিই পরব্রহ্ম। পুরুষতত্ত্ব শিব আছেন, শবতুল্য।

বেদশাস্ত্রের ভিত্তি হইল পুরুষবাদে। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং" ইহা হইল পুরুষবাদের মূল মন্ত্র। পুরুষ হইতেই জগৎ সৃষ্ট, পুরুষাশ্রয়েই জগতের স্থিতি, পুরুষেই চরম লয় প্রাপ্তি। বৈদিক শাস্ত্র মতে পুরুষই পরব্রহ্ম।

নিগম ও আগম, বৈদিক ও তান্ত্রিক চিন্তাধারা দুই-ই ভারতীয় ঋষির সাধনার সম্পদ্। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌কে অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিতে হইলে শক্তিবাদ ও পুরুষবাদের সুষ্ঠু সমাধান ও সামঞ্জস্য অপরিহার্য্য। ভারতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্রসমূহে এই সমাধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই পরিস্ফুট।

পুরুষ হইতেছেন শক্তিমান্। প্রকৃতি শক্তিরই নামান্তর। শক্তি হইতেই শক্তিমান্, কিংবা শক্তিমানেরই শক্তি? শক্তিবাদী বলেন, ধন আছে বলিয়াই ধনবান্। শক্তি আছে বলিয়াই শক্তিমান্। আগে ধন, পরে ধনশালী। আগে শক্তি, পরে তাহা হইতে শক্তিবিশিষ্ট শক্তিমান্।

পুরুষবাদী বলেন, ধন ত ধনবানেরই করায়ত্ত সম্পদ্। শক্তি ত শক্তিমানের অধীন তত্ত্ব। যে অধীন, সে ত গুণীভূত, যাহার অধীন সে-ই

বস্তু, সে-ই স্বাধীন। স্বাধীন, স্বরাট্ বস্তুই প্রধান। অতএব শক্তিমান্ বা পুরুষতত্ত্বই মৌলিক।

এখানেই সমস্যা। সকল শাস্ত্রেই এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা। আদি-তত্ত্ব কে? অনাদি চরম বস্তু কোন্‌টি? শক্তিমান্, না শক্তি? পুরুষ, না প্রকৃতি? ভগবান্, না ভগবতী? কৃষ্ণ, না কালী?

তন্ত্রবাদ শক্তিকে প্রধান স্থান দিয়াছেন, তদ্বিপরীত অদ্বৈত-বেদান্ত শক্তির কোন স্থানই রাখেন নাই। অদ্বৈত-বেদান্তমতে পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, সুতরাং নিঃশক্তিক। শক্তির কার্য্য হইল ক্রিয়া। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম শক্তি-সম্পর্কবর্জ্জিত পুরুষ। বস্তুতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন। ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। শক্তির ক্রিয়া ছাড়া ত জগৎ চলিতে পারে না। ব্রহ্ম যদি নিঃশক্তিক, তাহা হইলে জগতের কি গতি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ কোন বস্তু নহে। ইহা মিথ্যা। মিথ্যা পদে অলীক নহে, সতে অসতের ভান। রজ্জুতে সর্পভ্রম।

অদ্বৈতমতে শক্তি মায়া। মায়া সদ্বস্তু নহে। ব্রহ্মই সদ্বস্তু। মায়া সৎ হইলে দুইটি সৎ বস্তুর আশঙ্কা হয়, অদ্বৈতবাদই বিপন্ন হয়। মায়া সর্ব্বতোভাবে অসৎও নহে, কারণ অসতের ভান হয় না। সুতরাং মায়া বা শক্তি সৎ ও অসতের মধ্যবর্ত্তী কোন অনির্ব্বচনীয় স্থিতি। এই মতে শক্তি উপেক্ষিত, মিথ্যা বলিয়া গৃহীত। অনিত্য বস্তুতেই শক্তির খেলা। নিত্য সত্য ব্রহ্মে শক্তির বিদ্যমানতা নাই।

সাংখ্যদর্শন পুরুষ-প্রকৃতি উভয়কেই সমান মূল্য দেওয়ায় দ্বৈতবাদী। এই মতে পুরুষের ঈক্ষণে প্রকৃতি ক্রিয়াবতী। প্রকৃতির পরিণামই

জগৎপ্রপঞ্চ। প্রকৃতির বন্ধনে পুরুষ বদ্ধ। প্রকৃতি বন্ধন খুলিলে পুরুষ মুক্ত।

এই সমাধান সুন্দর, কিন্তু সুদৃঢ় নহে। দুইটি দুর্ব্বলতায় এই মত অদৃঢ়। (১) পুরুষের বহুত্ব। (২) প্রকৃতির জড়ত্ব। সাংখ্যে পুরুষ এক নহে, বহু। অসংখ্য পুরুষ, প্রত্যেকেই কেমন করিয়া নিত্য ও চরম বস্তু, ইহা ভাবিতে বুদ্ধি বিদ্রোহী হয়।

সাংখ্যে পুরুষ চৈতন্যময়। প্রকৃতি কিন্তু অচেতনা, জড়া। জড়ের কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি অকর্ত্তা। এই দুই অকর্ত্তার মিলনে অন্ধ-খঞ্জ ন্যায়ে অদ্ভুতভাবে জগৎকর্ত্তৃত্ব হয়, ইহা বুঝিয়া লইতে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে চরম তত্ত্ব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম। তিনি প্রকৃতি-সম্পর্ক-হীন নহেন। তিনি প্রকৃতি দ্বারা বিশেষিত। প্রকৃতির প্রকাশ দ্বিবিধ, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই দুই শক্তি হেতু তিনি শক্তিবিশিষ্ট।

শ্রীগীতাতেও পুরুষোত্তমতত্ত্বই মূল-তত্ত্ব। তাঁহার দুইটি প্রকৃতি। পরা ও অপরা। পরা প্রকৃতি হইতেছে জীব-চৈতন্য। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছে। আর উভয়কেই ধারণ করিয়া আছেন পরমেশ্বর।

গীতার মতে পুরুষের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি প্রসবধর্মা হন। শক্তিকে ক্রিয়াবতী করে শক্তিমান্। প্রকৃতি অনাদি, তথাপি পুরুষের অধীন। বিশেষণ যেমন বিশেষ্যের উপর নির্ভরশীল, গুণ যেমন দ্রব্যের আশ্রয়ে স্থিত, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষকে অবলম্বন করিয়াই বিরাজমানা।

বিশেষণ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং প্রকৃতি স্বাধীন নহে। প্রকৃতি ও পুরুষ দু'য়ের স্বাধীনতা সমান না হইলে উভয়ের মিলনের আস্বাদন সুখাবহ হয় না। গীতায় ভগবানের আর একটি স্বকীয়া প্রকৃতি (স্বাং প্রকৃতিং)-র কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু গীতা তাহার সহিত পুরুষের কোন বিশেষ মিলনের আস্বাদন করেন নাই। করিলে হয়ত ঐ পথে সমাধান মিলিত।

নির্দ্দোষ সমাধান দাবী করে, পুরুষও প্রকৃতির সমান স্বাধীনতা—শক্তি ও শক্তিমানের সমান অধিকার ও সামর্থ্য। কিন্তু কোন মতেই তাহা দৃষ্ট হয় না। তন্ত্রমতে শক্তিই প্রধান। শক্তিমান্ শিব, শব হইয়া আছেন। অদ্বৈতবাদ মতে শক্তিমান্ই সর্ব্বস্ব। শক্তি মিথ্যাভূত। বিশিষ্টাদ্বৈত ও গীতার মতে শক্তি গুণীভূত, শক্তিমান্ই প্রধান তত্ত্ব।

কেহই উভয়কে সমমূল্য দেন নাই। না দিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। দুই-ই সমান অধিকার, সমান সামর্থ্য ও সমান স্বাধীনতা পাইলে পরতত্ত্ব নির্দ্দেশ অসম্ভব হইয়া উঠে। চরমতত্ত্ব এক বই দুই হইলে, একে অন্যকে সীমাবদ্ধ করে। শক্তি-শক্তিমান্ দুই সর্ব্বতোভাবে সমান হইলে শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাণী ব্যাহত হয়।

ইহা এক বিষম সমস্যা। প্রকৃতি-পুরুষ দুই-ই স্বাধীন ও সম-সামর্থ্যবিশিষ্ট না হইলে রসশাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হয়। আবার দুইটিই স্বরাট্ হইলে তত্ত্ব-শাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকৃত সমাধানে রস ও তত্ত্ব উভয়কেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

এই রসশাস্ত্র ও তত্ত্বশাস্ত্রের বিরোধের সমাধান হইতে পারে, যদি শক্তি ও শক্তিমান্ দুই হইয়াও এক হন। এক হইয়াও দুই হন।

এ কথার তাৎপর্য্য হইল এই যে, একই বস্তু দুই ভাগ হইবে এবং দুই মিলিয়া তাহাদের অখণ্ডতা অক্ষুন্ন থাকিবে, তাহাদের একের সত্তা সার্থক হইবে অপরের মাধ্যমে। যেমন আলোর সত্তা সার্থক, চক্ষুর মাধ্যমে। চক্ষুর সত্তা সার্থক, আলোর মাধ্যমে।

আলোচ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অনুধ্যান করিয়াছেন ভাগবতীয়েরা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বেই শক্তিমান্ সমস্যার সম্যক্ সমাধান।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ অভিনব। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি কিন্তু রাধা ছাড়া কৃষ্ণ কিছুই নহেন। কৃষ্ণ রাধাশক্তিতেই শক্তিমান্। আবার কৃষ্ণ ছাড়াও রাধা কিছুই নহেন। রসনার মাধ্যমেই শর্করার মিষ্টত্বের প্রকাশ। শর্করার মাধ্যমেই রসনার মধুর রসানুভূতি—শক্তির বিলাস। সেইরূপ শ্রীরাধার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমেই শ্রীরাধার রাধাত্ব। সুতরাং তাঁহারা দুই হইয়াও এক। তত্ত্বের অখণ্ডতার মধ্যে রসের খণ্ডতা। তাত্ত্বিক অভিন্নতার মধ্যে নায়ক-নায়িকার ভিন্নতা।

লৌকিকে নারী-জীবনের দুইটি দিক্। এক, পতির প্রীতিবিধান, অপর, সৃষ্টি ও পালন। মূল-শক্তির সেইরূপ দ্বিবিধা বৃত্তি, হ্লাদিনী ও সৃজনী-পালনী। যাহারা সৃজনী-পালনী বৃত্তির উপর অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন, তাঁহাদের ভাবনায় পুরুষের সঙ্গে শক্তির সম্বন্ধ সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত হয় নাই। ভাগবতীয়েরা পুরুষোত্তমের সুখাবগাহিনী হ্লাদিনী শক্তির উপর মুখ্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছেন, এই জন্যই প্রকৃত সম্বন্ধটি সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণের দৃষ্টিতে শক্তির মূল স্বরূপ বা স্বরূপা শক্তি

হইলেন হ্লাদিনী। এইটি শক্তির অন্তরঙ্গ স্বরূপ। সৃজনী-পালনী বৃত্তি ঐ শক্তিরই বহিরঙ্গ স্বরূপ। সৃজনী-পালনী শক্তির মূর্ত্তি শ্রীকালিকা। হ্লাদিনী-শক্তির মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ অদ্ভুত। কৃষ্ণের সকল ইচ্ছার আধার রাধা। "কৃষ্ণের যতেক বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।" আবার রাধার আরাধনা হইল কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি। "কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে"। একের দ্বারা অপরের পূর্ণতা। দুই মিলিয়া অদ্বয় তত্ত্বের অখণ্ডতা।

শ্রীরাধার স্বাধীনতা শ্রীকৃষ্ণে। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপতা শ্রীরাধায়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ধন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ধন। রাধাধনে কৃষ্ণ ধনী। কৃষ্ণধনে রাধা ধনী। ইহাই প্রেমরসের সর্ব্বোত্তম ভূমিকা। এই ভূমিকায় শক্তি ও শক্তিমান্ সমস্যার সমাধান। পুরুষ-প্রকৃতি রহস্যের অর্গল উদ্ঘাটন।

শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। শ্রীরাধা রসশক্তি। রস দুই হইয়াও বস্তুতঃ এক। তত্ত্বে এক হইয়াও আস্বাদনে দুই। এই দ্বৈতে একত্ব, একত্বে দ্বৈত, ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতম হয়, যদি ইহা রূপায়িত হয় এমন একটি স্বরূপ বিগ্রহে, যেটি দৃশ্যতঃ একক সত্তা, অথচ তাহার মধ্যে আছে দ্বৈতের বিলাস।

ঐ একায়িত ঘনীভূত বিগ্রহই "শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরি।" তিনি শক্তিও বটেন, শক্তিমান্ও বটেন। তিনি শক্তি-কবলিত শক্তিমান্, কেবল শক্তি-বিশেষিত শক্তিমান্ নহেন। শক্তি-স্বায়ত্তীকৃত শক্তিমান্। শক্তির মহত্ত্ববশতঃই শক্তিমান্ গ্রস্ত।

সুতরাং গৌরসুন্দরে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব পূর্ণভাবে স্বীকৃত। হ্লাদিনী শক্তি, শক্তিমান্ হইতে নিবিড়তর ও ব্যাপকতর তত্ত্ব। রাধাদ্বারা কৃষ্ণ

আবরিত। কোন অংশে বৃহত্তা না থাকিলে সম্পূর্ণ আবরিকা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ?

অদ্বৈতবাদের "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" বাণীর মৌলিক সত্যটিও গৌরসুন্দরের স্বরূপেতে প্রকটিত। সাধক, ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে ব্রহ্ম হইয়া যান। এই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তের মূল সত্যটি হইল, যে যাহাকে ঐকান্তিকভাবে ভাবনা করে সে তাহাই হইয়া যায়। শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাকে ধ্যান করিতে করিতে রাধা রাধা ভাবিয়া রাধা হইয়া গিয়াছেন। "কিশোরী স্মরি স্মরি" কিশোর কিশোরী হইয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈত-উপাসনার মূল তত্ত্বটিও গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রবাদের মূলতত্ত্বটিও গৃহীত হইয়াছে। আবার বেদের পুরুষবাদের চরম সিদ্ধান্তও স্বীকৃত হইতেছে। কারণ, প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দর শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণই। যে স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ শক্তিকে আপনাতে পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া লইয়াছেন, সেই স্বরূপটিই গৌর। পরমা প্রকৃতি, পরমপুরুষবরের প্রীতিবিধান করিতে আসিয়া, অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। সেই শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর। সুতরাং সর্ব্বশক্তি-ক্রোড়ীকৃত পুরুষোত্তমই গৌর। শক্তির সত্তাকে আত্মসাৎ-কারী শক্তিধর পুরুষপ্রবরই গৌর। অতএব তন্ত্রের শক্তিবাদ ও বেদের পুরুষবাদ, এই দু'য়ের চরম পরম সার্থকতা শ্রীগৌরসুন্দরে।

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষ-প্রকৃতির উর্দ্ধে। পরমব্রহ্ম পুরুষও নহেন. প্রকৃতিও নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরও পুরুষ-প্রকৃতির উর্দ্ধে। তবে তিনি পুরুষও বটেন, প্রকৃতিও বটেন। অদ্বৈত ব্রহ্ম সর্ব্বভাবগ্রাসী, শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বভাবোল্লাসী। ভাব-নির্ব্বাণে ব্রহ্ম, ভাব-রসায়নে

গৌরাঙ্গ। বিলাস-বিহীন চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম, রসবিলাসী পরমতত্ত্ব গৌরসুন্দর।

ব্যাকরণে একাধিক পদের একপদীকরণকে সমাস বলে। বহুব্রীহি-সমাসে পদগুলি গৌণ হওয়ায় অন্যপদ প্রধানতা লাভ করে। দ্বন্দ্বসমাসে উভয় পদেরই প্রাধান্য তুল্য থাকে।

পরব্রহ্মে শক্তি-শক্তিমানের বহুব্রীহি-সমাস। শ্রীগৌরসুন্দরে দ্বন্দ্বসমাস। পরব্রহ্মে শক্তি-শক্তিমান্ দুই-ই আপনাদের হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাধান্য রহিয়াছে "কেবলানুভবানন্দের"।

শ্রীগৌর দ্বন্দ্বসমাসে দুই এক হইলেও দু'য়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ" বাক্যে গীতাশাস্ত্র দ্বন্দ্ব-সমাসকেই সমাসের রাজা বলিয়াছেন। তবে ব্যাকরণের দ্বন্দ্ব-সমাস অপেক্ষা গৌব-দ্বন্দ্ব-সমাসে কিছু বৈশিষ্ট্য অধিক আছে। ব্যাকরণের সমাসে প্রত্যেক পদের প্রধানতা থাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। শ্রীগৌরে কিন্তু তাহা হয় নাই। এখানে দুই বস্তুর প্রাধান্য রহিয়াছে, একের মধ্য দিয়া অন্যের, আলাদাভাবে নহে। কৃষ্ণময়ী বলিয়াই রাধার প্রধানতা। রাধাময় বলিয়াই কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমতা। রস হইতেই রসনা—রসনাতেই রস আস্বাদিত।

এই অভিনব দ্বন্দ্বসমাসে সর্ব্বশাস্ত্রের দ্বন্দ্ব নিরসন হইয়াছে। শ্রীগৌরপ্রিয়জন তাই গৌরসুন্দরের দয়াকে বলিয়াছেন, "সাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া।" সর্ব্বদ্বন্দ্বনাশী দ্বন্দ্বাতীত অপ্রাকৃত দ্বন্দ্বসমাস শ্রীগৌরাঙ্গ জয়যুক্ত হউন। জয় গৌরহরি, জয় জগদ্বন্ধু হরি।

চণ্ডীরূপা গৌরহরির স্তব

জয় জয় জগত-জননী ! মহামায়া ।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া ॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী ।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা ।
বলিতে না পারে অন্যে কে দিবেক সীমা ॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি ।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা—তুমি বিষ্ণু-ভক্তি ॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তি-ভেদ ।
সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব মাতা ।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥
তুমি ত্রিজগতহেতু গুণত্রয়ময়ী ।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি ॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবের বসতি ।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥
জগতজননী তুমি দ্বিতীয়-রহিতা ।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল মাতা ॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন ।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥

সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী! দিয়া চরণের ছায়া॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা! কে রাখিবে আর॥
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা! কর নিজ দাস॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূত-বুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮)

চণ্ডী-পূজাবিধি

শুচি হইয়া শিখাবন্ধন ও তিলকধারণপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া আচমনপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ।

অর্চ্চনা।—ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার দ্রব্যে জল প্রক্ষেপ করিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।

(শালগ্রামে বা জলে পূজা করিলে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। (তাম্রপাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া) ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী—এষোঽর্ঘঃ) ওঁ শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ।

স্বস্তিবাচন—(উত্তরমুখে বসিয়া আতপ-তণ্ডুল লইয়া) ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, (ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং)। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু (ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি)। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু (ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্)।

স্বস্তিসূক্ত।—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥ এই সূক্ত তিনবার পাঠ করিয়া ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি—বলিয়া আতপ তণ্ডুল ছড়াইবে। যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণকে স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিতে হইবে।

সাক্ষ্যমন্ত্র।—[কৃতাঞ্জলি হইয়া] ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতিভূর্মিরাকাশং খচরামরাঃ॥ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

সঙ্কল্প।—তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, তুলসী, হরীতকী ফল ও জল লইয়া দক্ষিণ জানু পাতিয়া, উত্তরমুখে বসিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া—

বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ, অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক-(দেব) শর্ম্মা মনোঽভীষ্টসিদ্ধিকামঃ (শ্রীচণ্ডিকাপ্রীতি-কামঃ, বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত—'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ' ইত্যাদি-'সাবর্ণির্ভবিতামনু'রিত্যন্ত-দেবীমাহাত্ম্য-প্রকাশক-সন্দর্ভস্য (স্তোত্রস্য) সকৃৎ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে।

একরূপ চণ্ডীপাঠে 'সকৃৎ' পদ প্রয়োগ করিবে। ৩ রূপ, ৫ রূপ, ৭ রূপ ইত্যাদি পাঠের সঙ্কল্পে ত্রিরাবৃত্তি, পঞ্চাবৃত্তি, সপ্তাবৃত্তি ইত্যাদি বলিতে হইবে।

পরার্থে সঙ্কল্পে।—অমুকগোত্রঃ 'শ্রীঅমুক (দেব) শর্ম্মা' ইহার স্থানে অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-(দেব) শর্ম্মণঃ এবং 'করিষ্যে' স্থলে 'করিষ্যামি' বলিতে হইবে।

শারদীয় পূজায় চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্প, যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ, অদ্য আশ্বিনে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথাবারভ্য মহানবমীং (দশমীং বা)

যাবৎ বার্ষিক-শরৎকালীন-দুর্গামহাপূজায়াম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-(দেব) শর্ম্মা সর্ব্বাবাধা-বিনির্ম্মুক্ত-ধনধান্যসুতান্বিতত্বকামঃ (শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ, বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান ইত্যাদি। (পরার্থে পূর্ব্ববৎ বক্তব্য)।

সঙ্কল্পের পর ঈশান কোণে জল ফেলিয়া, কোশা উবুড় করিয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া কোশার উপর পুষ্প বা আতপ-তণ্ডুল দিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। যথা—[সামবেদীয়] ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্ বা সিঞ্চধ্ব-মুপ বা পৃণুধ্ব, মাদিদ্ বো দেব ওহতে॥ [যজুর্ব্বেদী] ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ [ঋগ্বেদীয়] ওঁ যা গুংগূর্য্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥০॥ ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু (ওঁ অস্তু, প্রতিবচন)। ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু (ওঁ ভবতু, প্রতিবচন)।

জলশুদ্ধি।—ভূমিতে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে গোলাকার, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি—'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া তদুপরি কোশা স্থাপন করিয়া, 'নমঃ মন্ত্রে জল ঢালিয়া, কোশার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া, 'ওঁ' মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া, ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু –বলিয়া ঐ জলের উপর মৎস্যমুদ্রা করিয়া, 'ওঁ' ১০ বার জপ করিবে।

ভূতাপসারণ।—'ফট্' মন্ত্র ৭ বার জপ করিয়া শ্বেতসর্ষপ বা আতপ তণ্ডুল লইয়া, ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥—বলিয়া ছড়াইয়া দিবে।

আসন-শুদ্ধি।—ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ (আসনে

গন্ধপুষ্প দিয়া আসন ধরিয়া) আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥ (কৃতাঞ্জলি হইয়া বামভাগে নমস্কার করিবে)—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ। (ঊর্দ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (সম্মুখে) ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

প্রাণায়াম।—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে বামহস্তে ৪ বার 'হ্রীং' বীজ জপ করিবে, অতঃপর অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকা টিপিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া ১৬ বার জপ করিবে; এবং তদন্তে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ৮ বার জপ করিবে।

করন্যাস।—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

অঙ্গন্যাস।—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান।—ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্। পীতাম্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং, দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর-বৈরিজিহ্বাম্॥ অথবা—বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং, কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্। হস্তৈশ্চক্রবরাসিখেটবিশিখাং চাপং গুণং তর্জ্জনং, বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে॥ অথবা, ওঁ বন্ধূক-কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং। স্ফুরচ্চন্দ্র-

কলা-রত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ ।। ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্ । পুস্তকঞ্চাক্ষ-মালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ ।। দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়-মানিতাম্ ।। অথবা—দুর্গা, কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি যে কোনও শক্তিমূর্ত্তির ধ্যান করিলেও চলে ।

নিজ মস্তকে সেই পুষ্প ধরিয়া মানস পূজা করিবে। হৃদয় মধ্যে দেবীকে চিন্তা করিয়া হৃৎপদ্ম আসন, শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্ম হইতে গলিত অমৃত পাদ্য, মন অর্ঘ্য, উক্ত অমৃত আচমনীয় ও স্নানীয় জল, গন্ধতত্ত্ব পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ, হৃৎপদ্মমধ্যে কল্পিত সুধাসমুদ্রের জল (অর্থাৎ সুধা) নৈবেদ্য দিবে। এইগুলি মনে মনে চিন্তা করিবে।

বিশেষার্ঘ্যস্থাপন।—নিজের বামভাগে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে 'হূং' লিখিবে। তদুপরি 'ফট্' মন্ত্রে প্রক্ষালিত ত্রিপদিকা সহ শঙ্খ রাখিয়া 'হ্রীং' মন্ত্রে জল, গন্ধ-পুষ্প, দূর্ব্বাক্ষতাদি তাহাতে দিয়া, মং দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলায় নমঃ (ত্রিপদিকায়), অং দ্বাদশকলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ (শঙ্খে), উং ষোড়শকলাব্যাপ্তসোমমণ্ডলায় নমঃ, বলিয়া (জলে) গন্ধপুষ্প দিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঐ শঙ্খে পূজা করিবে—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ (অগ্নিকোণে), হ্রীং শিরসে স্বাহা (ঈশানে), হ্রূং শিখায়ৈ বষট্ (নৈঋর্তে), হ্রৈং কবচায় হুং (বায়ুকোণে), হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (সম্মুখে), হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ (মধ্যে)। "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি পাঠ করিয়া করদ্বয়ে শঙ্খ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক হ্রীং মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে। পরে সেই শঙ্খের জল কিঞ্চিৎ কোশায় দিয়া, সেই জল নিজ মস্তকে ও পূজার দ্রব্যে ছিটাইবে। (এই অর্ঘ্য পূজাসমাপ্তি পর্যন্ত রাখিবে)।

(পুনর্ব্বার পুষ্প লইয়া, ধ্যান করিয়া, ঘটে বা পুস্তকে সেই পুষ্প দিয়া

আবাহন করিবে)—ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। (কৃতাঞ্জলি হইয়া) ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার-সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব ॥

গণেশাদিপূজা।—এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ; এতৎ পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ; এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ; এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। এইরূপ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বদেবতাভ্যো নমঃ—বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে, দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। যথা—

এতৎ পাদ্যং হ্রীঁ ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। তৎপরে, ওঁ আবরণ-দেবতাভ্যো নমঃ—বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে, ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি, তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ—এই গায়ত্রী ১০ বার জপ করিবে। পরে, ওঁ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ—বলিয়া ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

তৎপরে পুস্তকের ডোর খুলিয়া ডোর গুটাইয়া, তাম্রাদি আধারে রাখিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুস্তক-পূজা (এষ গন্ধঃ ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায় নমঃ ইত্যাদি) এবং, হ্রীঁ মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া পাঠ করিবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ঘণ্টাবাদন কর্ত্তব্য।

চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে দেবীসূক্ত, (বৈদিক), অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবী কবচ, ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি মন্ত্র এবং ঋষ্যাদি যথাক্রমে পাঠ করিবে। রাত্রিসূক্ত ও শাপোদ্ধার-পাঠের ব্যবহারও কোন কোন স্থানে

আছে। পরে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ এই নবাক্ষর মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া চণ্ডীপাঠারম্ভ করিবে এবং চণ্ডীপাঠের অন্তেও উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। মতান্তরে নবাক্ষর মন্ত্র "ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে" এইরূপ কথিত আছে। একদিনে ২।৩ রূপ পাঠ করিলে দেবীসূক্ত, অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবী কবচ ও ঋষ্যাদি প্রথমে একবার পাঠ করিলেই হইবে, প্রত্যেকবার পাঠ করিতে হইবে না। চণ্ডীপাঠে, সাবর্ণিঃ সূর্য্যঃ এই প্রথম শ্লোকের আদিতে প্রণব উচ্চারণ করিয়া পাঠারম্ভ করিবে এবং সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ, এই শেষ শ্লোকের অন্তে প্রণব উচ্চারণ করিয়া পাঠ শেষ করিবে।

শেষ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি দুইবার পাঠ করিবে। পাঠান্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া—ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥—বলিয়া জলগণ্ডূষ দেবীর বামহস্ত উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে। তৎপরে, হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া আবর্তি করিবে।

আরতির নিয়ম।—প্রত্যেক দ্রব্য দেবতার পায়ে ৪ বার, নাভিদেশে ২ বার, মুখে ৩ বার, এবং সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার ঘুরাইবে।

আরতির দ্রব্য।—দীপমালা অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর, জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, দর্পণ, পঞ্চপল্লব বা বিল্বপত্র (চামর)।

প্রণাম।—ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

দক্ষিণা।—(অর্চ্চনা) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

দক্ষিণাবাক্য।—কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুশ ও ফল ধরিয়া তদুপরি বামহস্ত উবুড় করিয়া রাখিয়া—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি কামনয়া কৃতৈতদ্দেবীমাহাত্ম্যপ্রকাশক-স্তোত্রপাঠকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীচণ্ডিকায়ৈ সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) ওঁ কৃতৈতদ্দেবীমাহাত্ম্যপাঠ-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। (ওঁ অস্তু)।

বৈগুণ্যসমাধান।—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি······শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্ যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়া ওঁ বিষ্ণুঃ ১০ বার জপ করিবে। এক গণ্ডূষ জল লইয়া, ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ এতৎ কর্ম্ম ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু (জলগণ্ডূষ ত্যাগ করিবে)।

বিসর্জ্জন।—ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা করিলে ঘট বিসর্জ্জন করিবে। যথা—ওঁ চণ্ডিকে দেবি ক্ষমস্ব—বলিয়া ঘটে জল দিয়া ঘট সঞ্চালন করিবে। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা ঘট হইতে একটি নির্ম্মাল্যপুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করিয়া দেবতাকে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট মনে করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ—বলিয়া কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য রাখিবে।

সপ্তশতী-সমন্বিতা

চণ্ডীচিন্তা

অথ দেবীসূক্তম্

অহং রুদ্রেভি রিত্যাদিস্সূক্তস্য আম্ভৃণী বাগ্ ঋষিঃ। পরমাত্মা দেবতা। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দ্বিতীয়া জগতী। ['অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি সূক্তটির দ্রষ্ট্রী হইলেন আম্ভৃণী (অম্ভৃণ ঋষির কন্যা) বাক্ নামে ব্রহ্মজ্ঞানবতী ঋষি। দেবতা হইলেন সচ্চিৎসুখাত্মক সর্বগত পরমাত্মা। সেই পরমাত্মার সহিত ইনি (ঋষি) তাদাত্ম্য অনুভব করিয়া সকল দেবতারূপে, সকল জগদ্রূপে, সকলের অধিষ্ঠানরূপে, আমিই সর্বরূপা হই—এই কথা বলিয়া নিজেই নিজের (পরমাত্মরূপিণীর) স্তুতি করিতেছেন। এই সূক্তে (স্তুতিতে) আটটি মন্ত্র। ছন্দ হইল ত্রিষ্টুপ্ (একাদশাক্ষরা)—শুধু দ্বিতীয় মন্ত্রটীর ছন্দ জগতী (দ্বাদশাক্ষরা)]। (সায়ণভাষ্য হইতে গৃহীত)

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভ-
র্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১
অহং সোমমাহনসং বিভ-
র্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ ।
অহং জনায় সমদং কৃণো
ম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে ।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭

অহমেব বাত ইব প্রবা-
ম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথি-
ব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮

ওঁ তৎসৎ ওঁ

ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম্।

আমি রুদ্ররূপে (রুদ্র একাদশটি) ও বসুরূপে (বসু আটটি) বিচরণ করি। আমি আদিত্যরূপে (দ্বাদশ আদিত্য) এবং বিশ্বদেবরূপে (সর্বদেবরূপে, অথবা বিশ্বদেব একটি গণ) বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ, উভয় দেবতাকে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে (ইঁহারা যুগ্ম দেবতা) ধারণ করি। ১ ॥

আমি শত্রু-নিহন্তা দেবতারূপী সোমকে ধারণ করি। আমি ত্বষ্টাকে (বিশ্বকর্মাকে), পূষণকে এবং ভগকে (ইঁহারা আদিত্যবর্গের দেবতা) ধারণ করি। যে যজমান হবির্যুক্ত, এবং যে উত্তম হবিঃ দেবগণকে দান করে এবং সোমরস দ্বারা দেবতাগণের তর্পণকারী, আমি তাদৃশ যজমানকে ধন (অর্থাৎ যজ্ঞফল) দান করি। ২ ॥

আমি রাষ্ট্রী অর্থাৎ সকল জগতের ঈশ্বরী (নিয়ন্ত্রী)। আমি উপাসকদিগকে ধন লাভ করাই। আমি পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জানিয়াছি (প্রত্যক্ষ করিয়াছি)। আমি যজ্ঞিয় দেবতাগণের মুখ্যা। তাদৃশী আমি বহুভাবে (জগৎপ্রপঞ্চরূপে) অবস্থান করি এবং জীবাত্মা হইয়া বহু জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছি। এইরূপে আমাকে বহুস্থলে দেবতারা বিধান করেন (অর্থাৎ তাঁহারা যাহা যাহা করেন আমাকেই করেন)। ৩ ॥

যে অন্ন ভোজন করে, সে আমা হেতুই তাহা করে (কারণ আমি ভোক্তৃশক্তিরূপা)। যে এই নানারূপা প্রপঞ্চসৃষ্টি দেখে, সে আমাহেতুই দেখে (কারণ দ্রষ্টৃশক্তিও আমি)। যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, যে লোকের কথা শ্রবণ করে, সেও আমার জন্যই তাহা করিতে পারে। আমার বিষয়ে যাহারা জ্ঞানরহিত (আমার স্বরূপ যাহারা জানে না), তাহারা উপক্ষীণ হয় (সংসারে জন্মমৃত্যুর অধীন হয়)। হে সখে! আমি

(তোমার হিতৈষিণী হইয়া) শ্রদ্ধালভ্য পরতত্ত্বের স্বরূপ তোমাকে উপদেশ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ৪ ॥

আমি স্বয়ং এই ব্রহ্মপদার্থ তোমাকে বিবৃত করিতেছি। এই পদার্থ দেবতা ও মানুষ উভয়েরই সেবিত (আমি স্বয়ং সেই বস্তুস্বরূপিণী, আমিই এই উপদেশ করিতেছি)। ঈদৃশী আমি যাহাকে রক্ষা করিতে চাই, তাহাকে সর্বাপেক্ষা মহান্ করিয়া, স্রষ্টা করিয়া দেই,—তাহাকে আমি অতীন্দ্রিয়জ্ঞানশালী এবং প্রজ্ঞাশালী করিয়া দেই (কারণ আমি সর্ব-জগতের নিয়ন্তা ব্রহ্ম)। ৫ ॥

ব্রহ্মদ্বেষী হিংসক শত্রুকে বধ করার জন্য, আমি রুদ্রের নিমিত্ত ধনুকে জ্যা আরোপণ করি। আমি আমার স্তোতাদিগের নিমিত্ত (তাহাদের রক্ষার্থে) যুদ্ধ করি। আমি (অন্তর্যামিরূপে) দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রবিষ্টা হইয়া আছি। ৬ ॥

আমি এই পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশকে সৃষ্টি করি (অথবা, জগৎ-সৃষ্টিকর্তাকেও আমিই সৃষ্টি করি)। ব্যাপ্তিশীল ধীবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্ম-চৈতন্য, তাহা আমার কারণ। এই হেতু আমি সকল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা আছি। স্বর্গলোককেও আমি ব্যাপ্ত করিয়া আছি। সকল প্রকার সৃষ্ট বস্তুও আমি কারণরূপে, আমার মায়াত্মক দেহের দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিদ্যমানা আছি। ৭ ॥

এই সমুদয় বিশ্ব আমি কারণরূপে সৃষ্টি করি। বায়ু যেমন স্বেচ্ছায় স্বয়ং প্রবাহিত হয়, আমিও তদ্রূপ স্বাধীনা। আকাশ ও এই পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া আমি (ব্রহ্মরূপে) বর্তমানা। আমার মাহাত্ম্য-বলে আমি এই প্রকারে সকল-জগদ্রূপে পরিণতা হইয়াছি। ৮ ॥

দেবীসূক্তের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অথ রাত্রিসূক্তম্

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৭তম সূক্ত এইটি। এই সূক্তের ঋষি কুশিক, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা রাত্রি। শ্রীজগদম্বা-প্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠে ও জপে বিনিয়োগ।

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী, পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১ ।
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা, নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২ ।
নিরুস্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩ ।
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং, নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ।
নি গ্রামাসো অবিক্ষত, নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ।
যাবয়া বৃক্যং বৃকং, যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ।
উপ মা পেপিশত্তমঃ, কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭ ।
উপ তে গা ইবাকরং, বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮ ।

ইতি ঋগ্বেদীয়ং রাত্রিসূক্তং সমাপ্তম্

অথ অর্গলাস্তোত্রম্

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥ ২
মধুকৈটভবিধ্বংসি-বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৩
মহিষাসুর-নির্ণাশি-বিধাত্রি বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪
ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৫
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬
নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে* নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৭
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৮
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৯

---

* পাঠান্তর—(জয়দে)

নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১০
স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১
চণ্ডিকে সততং* যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৫
সুরাসুর-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণাম্বুজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৭
দেবি প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ড-দৈত্যদর্পনিসূদিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৮
প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৯
চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্র-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০

---

* (যে ত্বামর্চ্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ)

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২১
হিমাচলসুতানাথ-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২২
ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৩
দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৪
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৫
তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৬
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥ ২৭

ইত্যর্গলস্তোত্রং সমাপ্তম্

অথ কীলকস্তবঃ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-নিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে ॥ ১
সর্ব্বমেতদ্ বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামপি কীলকম্।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জপ্যতৎপরঃ ॥ ২
সিধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনি কর্ম্মাণি সকলান্যপি।
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ * ॥ ৩
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
বিনা জপ্যেন সিধ্যেত সর্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪
সমগ্রাণ্যপি সেৎস্যন্তি লোকে শঙ্কামিমাং হরঃ।
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবমিদং শুভম্ ॥ ৫
স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ।
স প্রাপ্নোতি** সুপুণ্যেন তাং যথাবন্নিমন্ত্রিণাম্ ॥ ৬
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্বমেব ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥ ৭
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।
ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥ ৮

---

* "স্তোত্রমাত্রেণ সিধ্যতি" ইত্যপি পাঠঃ।

** "সমাপ্নোতি" ইতি চ পাঠঃ।

যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ।
স সিদ্ধঃ স গণঃ সোহথ গন্ধর্বো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৯
ন চৈবাপাটবং তস্য ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে।
নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০
জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্ব্বীত হ্যকুর্বাণো বিনশ্যতি।
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ ১১
সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ললনাজনে।
তৎ সর্বং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং সদা ॥ ১২
শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ ॥ ১৩
ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ ॥ ১৪
চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ।
হৃদ্যং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ ॥ ১৫
অগ্রতোঽমুং মহাদেব-কৃতং কীলকবারণম্।
নিষ্কীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥ ১৬

ইতি কীলকস্তবঃ সমাপ্তঃ।

———

অথ দেবীকবচম্ ।

অথ দেবীকবচস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো মহিষমর্দিন্যাদয়ো দেবতা দেবীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

শতানীক উবাচ

যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম্ ।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকম্ ।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে ॥ ২
প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী ।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥ ৩
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ ॥ ৪
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥ ৫
অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতা রণে ।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে ।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখ-ভয়ঙ্করীম্ ॥ ৭

যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে।
প্রেতসংস্থা চ চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা ॥ ৮
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা।
নারসিংহী মহাবীর্যা শিবদূতী মহাবলা ॥ ৯
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা।
ব্রাহ্মী হংস-সমারূঢ়া সর্বাভরণভূষিতা ॥ ১০
লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া।
শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা ॥ ১১
ইত্যেতা মাতরঃ সর্বাঃ সর্বযোগসমন্বিতাঃ।
নানাভরণ-শোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ ॥ ১২
শ্রেষ্ঠৈশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্বা দিব্যহার-প্রলম্বিভিঃ।
ইন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ১৩
দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্ ॥ ১৪
খেটকং তোমরঞ্চৈব পরশুং পাশমেব চ।
কুন্তায়ুধঞ্চ খড়্গঞ্চ শার্ঙ্গায়ুধমনুত্তমম্ ॥ ১৫
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ।
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবতানাং হিতায় বৈ ॥ ১৬
নমস্তেঽস্তু মহারৌদ্রে মহাঘোর-পরাক্রমে।
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি ॥ ১৭
ত্রাহি মাং দেবি দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধিনি।
প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নি-দেবতা ॥ ১৮

দক্ষিণে চৈব বারাহী নৈর্ঋত্যাং খড়্গধারিণী।
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্ বায়ব্যাং বায়ুদেবতা ॥ ১৯
উদীচ্যাং দিশি কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী।
ঊর্ধ্বং ব্রাহ্মী চ মাং রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা ॥ ২০
এবং দশ দিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডা শববাহনা।
জয়া মামগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ ॥ ২১
অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা।
শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেদুমা মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা ॥ ২২
মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবোর্মধ্যে যশস্বিনী।
নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্শ্বকে ॥ ২৩
শঙ্খিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী।
কপোলৌ কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে চ শঙ্করী ॥ ২৪
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরৌষ্ঠে চ চর্চ্চিকা।
অধরে চামৃতকলা জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥ ২৫
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠমধ্যে তু চণ্ডিকা।
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে ॥ ২৬
কামাখ্যা চিবুকং রক্ষেদ্ বাচং মে সর্ব্বমঙ্গলা।
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্দ্ধরী ॥ ২৭
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকূবরী।
খড়্গধারিণ্যুভৌ স্কন্ধৌ বাহূ মে বজ্রধারিণী ॥ ২৮
হস্তয়োর্দ্দণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গুলীস্তথা।
নখান্ সুরেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষৌ রক্ষেন্নরেশ্বরী ॥ ২৯

স্তনৌ রক্ষেন্মহাদেবী মনঃ শোকবিনাশিনী।
হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী॥ ৩০
নাভৌ চ কামিনী রক্ষেদ্ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা।
মেঢ্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাসিনী॥ ৩১
কট্যাং ভগবতী রক্ষেদূরূ মে ঘনবাহনা।
জঙ্ঘে মহাবলা রক্ষেজ্জানূ মাধব-নায়িকা॥ ৩২
গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে চ কৌষিকী।
পাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাতাল-বাসিনী॥ ৩৩
নখান্ দংষ্ট্রাকরালী চ কেশাংশ্চৈবোর্ধ্বকেশিনী।
রোমকূপানি কৌমারী ত্বচং যোগেশ্বরী তথা॥ ৩৪
রক্তং মাংসং বসাং মজ্জামস্থি মেদশ্চ পার্ব্বতী।
অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী॥ ৩৫
পদ্মাবতী পদ্মকোষে কক্ষে চূড়ামণিস্তথা।
জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্ব্বসন্ধিষু॥ ৩৬
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা।
অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্ম্মধারিণী॥ ৩৭
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্।
বজ্রহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা॥ ৩৮
রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা॥ ৩৯
আয়ু রক্ষতু বারাহী ধর্ম্মং রক্ষতু পার্বতী।
যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী॥ ৪০

গোত্রমিন্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা।
পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষ্মীর্ভার্য্যাং রক্ষতু ভৈরবী ॥ ৪১
ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্যকাং তথা।
মার্গং ক্ষেমঙ্করী রক্ষেদ্ বিজয়া সর্ব্বতঃ স্থিতা ॥ ৪২
রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি দুর্গে দুর্গাপহারিণি ॥ ৪৩
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্ব্বদা জপেৎ।
ইদং রহস্যং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্ ॥ ৪৪
দেব্যাস্তু কবচেনৈবমরক্ষিততনুঃ সুধীঃ।
পাদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ৪৫
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে।
তত্র তত্রার্থলাভঃ স্যাদ্ বিজয়ঃ সার্ব্বকালিকঃ। ৪৬
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্নোতি লীলয়া।
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্নোত্যবিকলঃ পুমান্ ॥ ৪৭
নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্ত্যঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
ত্রৈলোক্যে চ ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্ ॥ ৪৮
ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৪৯
দেবী বশ্যা * ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ ৫০
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে লূতা-বিস্ফোটকাদয়ঃ।
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বাপি যদ্ বিষম্ ॥ ৫১

অভিচারাণি সর্ব্বাণি মন্ত্রযন্ত্রাণি ভূতলে ।
ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশজাঃ ।। ৫২
সহজাঃ কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা ।
অন্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ ।।৫৩
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ ।
ব্রহ্মরাক্ষস-বেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ।। ৫৪
নশ্যন্তি দর্শনাত্তস্য কবচেনাবৃতো হি যঃ ।
নানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিঃ পরা ভবেৎ ।। ৫৫
যশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্ত্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ।
তস্মাজ্জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুনে ।। ৫৬
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ ।
নির্ব্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপ-সমুদ্ভবা ।। ৫৭
যাবদ্ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্ ।
তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং জপকর্ত্তুর্হি সন্ততিঃ ।। ৫৮
দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্ল্লভম্ ।
সংপ্রাপ্নোতি মনুষ্যোঽসৌ মহামায়া-প্রসাদতঃ ।। ৫৯
তত্র গচ্ছতি ভক্তোঽসৌ পুনরাগমনং ন হি ।
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ ।। ৬০

ইতি শ্রীহরিহরব্রহ্ম-বিরচিতং দেব্যাঃ কবচং সমাপ্তম্ ॥

ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ নরোত্তমায় নমঃ, ওঁ দৈব্যে নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ,
ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ তৎসৎ ওঁ

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রথমচরিতস্য ব্রহ্মা ঋষির্মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দো, নন্দা শক্তীরক্তদন্তিকা বীজমগ্নিস্তত্ত্বং ঋগ্বেদঃ স্বরূপং, শ্রীমহাকালীপ্রীত্যর্থং প্রথম-চরিতজপে বিনিয়োগঃ।

মহাকালী-ধ্যানম্

ওঁ খড়্গং চক্র-গদেষু-চাপ-পরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্য-পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্ ॥

মধ্যমচরিতস্য বিষ্ণুর্ঋষি র্মহালক্ষ্মীর্দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, শাকম্ভরী শক্তির্দুর্গা বীজং বায়ুস্তত্ত্বং, যজুর্ব্বেদঃ স্বরূপং, শ্রীমহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং মধ্যম চরিতজপে বিনিয়োগঃ ॥

মহালক্ষ্মী-ধ্যানম্

ওঁ অক্ষস্রক্-পরশুং গদেষু-কুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং
সেবে সৈরিভ-মর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ॥

উত্তরচরিতস্য রুদ্র ঋষিঃ, সরস্বতী দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দো, ভীমা শক্তির্ভ্রামরী বীজং, সূর্য্যস্তত্ত্বং সামবেদঃ স্বরূপং, শ্রীমহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থম্ উত্তরচরিতজপে বিনিয়োগঃ।

মহাসরস্বতী-ধ্যানম্

ওঁ ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশু-তুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজেচ্ছুম্ভাদি-দৈত্যার্দ্দিনীম্।

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ॥ (শিরসি) ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ওঁ মহাকাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (পুনঃ শিরসি) ওঁ বিষ্ণবে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ উষ্ণিহে ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (পুনঃ শিরসি) ওঁ রুদ্রায় ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ অনুষ্টুভে ছন্দসে নমঃ। (হৃদি) ওঁ মহাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

প্রথম-চরিত্রম্

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ১

ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম ॥ ২
মহামায়াপ্রভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ৩
স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশ-সমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৫
তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবল-দণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ ॥ ৬
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥
অমাত্যৈর্ব্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥ ৮
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥ ৯
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্ত-শ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥ ১০
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১১

সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ১২
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্‌ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥ ১৩
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥ ১৪
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥ ১৫
অসম্যগ্ ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥ ১৬
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥ ১৭
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥ ১৮
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥ ১৯

বৈশ্য উবাচ ॥ ২০

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ২১
বিহীনশ্চ ধনৈর্দ্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥ ২২
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ ২৩

কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্ ॥ ২৪
কথন্তে কিন্নু সদ্‌বৃত্তা দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥ ২৫

রাজোবাচ ॥ ২৬

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ। ২৭
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২৮

বৈশ্য উবাচ ॥ ২৯

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্‌গতং বচঃ। ৩০
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ। ৩১
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে। ৩২
যৎ প্রেম-প্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে। ৩৩
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ৩৫

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ। ৩৬
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্। ৩৭
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্য-পার্থিবৌ ॥ ৩৮

রাজোবাচ ॥ ৩৯

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ। ৪০
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥

মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি। ৪১
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম॥
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্‌ঝিতঃ। ৪২
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি॥
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ। ৪৩
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি। ৪৪
মমাস্য চ ভবত্যেষাঽবিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥ ৪৫

ঋষিরুবাচ॥ ৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে। ৪৭
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। ৪৮
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্। ৪৯
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্। ৫০
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু। ৫১
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি। ৫২
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ। ৫৩
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা॥

তন্মাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। ৫৪
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। ৫৬
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮

রাজোবাচ ॥ ৫৯

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। ৬০
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা। ৬১
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৬২

ঋষিরুবাচ ॥ ৬৩

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। ৬৪
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। ৬৫
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে। ৬৬
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধু-কৈটভৌ। ৬৭
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥

স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ। ৬৮
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্ ॥
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ৬৯
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্র-কৃতালয়াম্।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহার-কারিণীম্ ॥ ৭০
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ ৭১

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৭২

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা। ৭৩
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ৭৪
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা ॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ॥ ৭৫
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥ ৭৬
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ি।
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ ॥ ৭৭
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ॥ ৭৮
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধ-লক্ষণা ॥ ৭৯
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ॥ ৮০

শঙ্খিনী চাপিনী বাণ-ভুশুণ্ডী-পরিঘায়ুধা।
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী ॥ ৮১
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে ॥ ৮২
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাঽত্তি যো জগৎ ॥ ৮৩
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহ-মীশান এব চ ॥ ৮৪
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈ-রুদারৈর্দেবি সংস্তুতা ॥ ৮৫
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধু-কৈটভৌ।
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু ॥ ৮৬
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ। ৮৭

ঋষিরুবাচ ॥ ৮৮

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ॥ ৮৯
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধু-কৈটভৌ।
নেত্রাস্য-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ৯০
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথ স্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ৯১
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ।
মধু-কৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ ॥ ৯২
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ।
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ ॥ ৯৩

পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ।
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ ॥ ৯৪
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥ ৯৫

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ৯৬

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৯৭
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৯৮

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৯

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ ॥ ১০০
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ।
[প্রীতৌ স্ব স্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ ।]
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ১০১

ঋষিরুবাচ ॥ ১০২

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা ।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০৩
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্ ।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ১০৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধু-কৈটভ-বধো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রথম চরিত্র

প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভ-বধ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সূর্যপুত্র সাবর্ণিকে অষ্টম মনু বলা হয়। তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছি শোনো। ১-২। সূর্যের পুত্র মহাত্মা সাবর্ণি মহামায়ার প্রভাবে এইরূপে মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন। ৩

পুরাকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশীয় সুরথ নামে এক রাজা সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতি হন। ৪। তিনি নিজপুত্রের মতো সম্যক্ প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার শত্রু ছিল কোলাবিধ্বংসী নৃপতিগণ। ৫। অতি প্রবল সৈন্যসম্পন্ন হইয়াও সুরথ সেই স্বল্পবল রাজগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নিজপুরে ফিরিয়া মহাভাগ সুরথ রাজত্ব করিতে থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবল শত্রু, বলবান্ দুষ্ট দুরাত্মা অমাত্যগণ নিজরাজ্যেই তাঁহার কোষ ও বল হরণ করিয়া লইল। ৬-৮।

তখন হৃতরাজ্য সুরথ একাকী অশ্বারোহণে মৃগয়ার ছলে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি বিপ্রশ্রেষ্ঠ মেধা মুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন—তথায় হিংস্রপশুগণ শান্ত হইয়া থাকিত এবং মুনিশিষ্যগণ বাস করিত। ৯-১০। মুনিবর তাঁহার অতিথি-সৎকার করিলে তিনি কিছুকাল ইতস্তত পর্যটন করিয়া তাঁহার আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। ১১।

তখন তিনি মোহাকৃষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমার কুচরিত্র কর্মচারিগণ, আমার পরিত্যক্ত এবং পিতৃপিতামহাদি কর্তৃক যত্নে রক্ষিত সেই পুরী ধর্মানুসারে পালন করিতেছে কি? ১২-১৩। আমার গজ সর্বদা মদবারি বর্ষণ করিত। সে এবং তার মাহুত, আমার শত্রুর

হস্তগত হইয়া কিরূপ ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে জানি না। যাহারা আমার প্রসাদ ও ধনাদি লাভ করিত তাহারা এক্ষণে অবশ্য অন্য নৃপতির আজ্ঞা পালন করিতেছে। ১৪-১৫। ইহারা সর্বদা অযথা ব্যয় করিয়া আমার কষ্টার্জিত ধনভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে। ১৬।

রাজা সতত এইরূপ চিন্তাপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণের আশ্রমের নিকটে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এইস্থানে আপনার আগমনের হেতু কি? আপনাকে শোকার্ত বলিয়া মনে হইতেছে যেন। রাজার এই প্রীতিপূর্ণ ভাষণ শুনিয়া বৈশ্যটি বিনীত হইয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন। ১৭-১৯

বৈশ্য কহিলেন—আমি বৈশ্য, নাম সমাধি, আমি ধনবানের বংশে জন্মিয়াছি। ধনলোভে অসাধু স্ত্রীপুত্রাদি আমাকে বিদূরিত করিয়াছে। স্ত্রীপুত্রগণ আমার ধন আত্মসাৎ করায় আমি দরিদ্র হইয়া দুঃখী হইয়াছি। আত্মীয়স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। বনবাসে আসিয়া তাহাদের কোন শুভাশুভ সংবাদ পাইতেছি না। বাড়িতে তাহারা এক্ষণে কুশলে না অকুশলে আছে, তাহারা কিরূপ আছে, সদাচার-পরায়ণ বা অসদাচারী হইয়াছে—কিছুই জানি না। ২০-২৫ ॥ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে স্ত্রীপুত্রাদি ধনার্থে আপনাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত আপনার চিত্ত স্নেহপরায়ণ হইতেছে যেন? বৈশ্য উত্তর কহিলেন, আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কী করি, আমার মন কিছুতেই (তাহাদের প্রতি) নিষ্ঠুর হইতেছে না। যদিও তাহারা (সেই পুত্রাদি) পিতৃস্নেহ এবং পতি ও স্বজনপ্রীতি ভুলিয়া ধনলোভে আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, তথাপি তাহাদের প্রতি আমার মন অনুরক্তই রহিয়াছে। হে মহাত্মন্। আমি বুঝিয়াও বুঝি না, ইহা কী ব্যাপার! বিমুখ

আত্মীয়বর্গের প্রতি আমার চিত্ত স্নেহাসক্ত, তাহাদের জন্যও আমার দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে ও দুশ্চিন্তা হইতেছে। কী করিব, সেই স্নেহহীন স্বজনগণের প্রতিও আমার চিত্ত নিষ্ঠুর হইতেছে না। ২৬-৩৪ ॥

মার্কণ্ডেয় (মূল আখ্যাতা) ঋষি কহিলেন, হে বিপ্র। অতঃপর সেই নৃপশ্রেষ্ঠ ও সমাধিনামক বৈশ্য একসঙ্গে সেই মুনির নিকট গেলেন। তাঁহাকে যথানিয়মে যথাযোগ্য প্রণামাদি করিয়া, তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কহিলেন, ভগবন্! একটি প্রশ্ন আপনাকে করিতে চাই। আমার চিত্ত আমার বশে নহে, তাই আমি নষ্টরাজ্য হইয়াও সকল প্রজাদের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! সকল জানিয়াও মূঢ়ের মতো আমার এরূপ কেন হয়? আবার এই যে বৈশ্য, ইনিও ধনলোভী স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যগণ কর্তৃক বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছেন। স্বজন-কর্তৃক বর্জিত হইয়াও ইনি তাহাদের প্রতিই স্নেহাসক্ত হইতেছেন কেন? বিষয়ের দোষ দেখিতে পাইয়াও তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া আমরা দুইজনেই অত্যন্ত দুঃখাকুল হইয়াছি। আমরা সবই বুঝি, তবুও বিবেকহীনের ন্যায় আমাদের এই মূঢ়ের মতো আচরণ (চিত্তবৃত্তি) হইল কেন? মুনিশ্রেষ্ঠ, ইহার হেতু কী? ৩৫-৩৫ ॥

ঋষি (মেধা) কহিলেন, সকল প্রাণীরই বিষয়ের জ্ঞান আছে। হে মহাভাগ! শব্দস্পর্শাদি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ হইয়া প্রাণীর (শ্রোত্রাদি) ইন্দ্রিয়ের গোচরও হয়। ৪৬-৪৮ ॥ কোন কোন প্রাণী আছে রাত্রিতে দেখে না, কেহ বা দিনে দেখে না। কেহ আবার দিনে রাত্রিতে সকল সময়েই অন্ধ (ইহারা জ্ঞানান্ধ, মূঢ়)। মানব জ্ঞানী বটে কিন্তু পশুপক্ষি-মৃগাদিরও তো জ্ঞান আছে। পশুপ্রভৃতির ও মানুষের বিষয় জ্ঞান

(বিষয় গ্রহণের শক্তি) একই রূপ। আহার নিদ্রাদিও পশুপক্ষি-প্রভৃতির মানবের তুল্যই। ৪৮-৫১ ॥ পক্ষিগণ বুঝিয়াও স্বয়ং ক্ষুধা-কাতর হইয়াও শাবকের চঞ্চুতে খাদ্যকণা আদর করিয়া তুলিয়া দেয়। হে নরশ্রেষ্ঠ! মানুষও যে প্রত্যুপকার পাইবে এই লোভ করিয়া পুত্রাদির প্রতি প্রীতিমান্ হয়, তাহা কি দেখিতে পান না! ৫১-৫৩ ॥ তবুও মমতার আবর্তে (ঘূর্ণিতে) এবং মোহের গর্তে মানুষ পতিত হয়। ইহা সংসারের স্থিতিকারিণী দেবী মহামায়ার প্রভাবেই ঘটে। অতএব ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। ইনি জগৎপ্রভু শ্রীহরির যোগনিদ্রা, ইনি মহামায়া, ইনি জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখেন। জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া এই দেবী ভগবতী মহামায়া মোহগ্রস্ত করেন। তিনিই এই চরাচর সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন। ৫৩-৫৬ ॥ এই মহামায়াই প্রসন্না হইয়া বরপ্রদা হইলে মানবের মুক্তিও প্রদান করেন। ইনি পরমমুক্তির হেতু, ইনি সনাতনী। সংসারবন্ধনের হেতুভূতা ও এই দেবী। সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী ইনি। ৫৭-৫৮ ॥

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্। আপনি যাহাকে মহামায়া বলিলেন তিনি কে? হে ব্রাহ্মণ! তিনি কিরূপে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার কার্য বা কী? সেই দেবীর যেরূপ স্বভাব ও স্বরূপ, তিনি যাহা হইতে উদ্ভূত—হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ। এই সমস্তই আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫৯-৬২ ॥

ঋষি কহিলেন—এই জগৎ তাঁহারই মূর্তি হইলেও তিনি নিত্যা। তিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার উৎপত্তি (আবির্ভাব) নানাপ্রকারে হইল কীরূপে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। ৬৩-৬৫ ॥ দেবগণের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি যখন

আবির্ভূতা হন, তখনই সেই নিত্যা দেবীও উৎপন্না হইলেন বলিয়া লোকে উক্ত হয়। ৬৫-৬৬॥ প্রলয়কালে জগৎ একটি সমুদ্রে পরিণত হইলে শেষনাগের শয্যায় শ্রীভগবান্ হরি যখন শয়ান ছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে উদ্ভূত, মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত দুইটি ভীষণ অসুর ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করিতেছিলেন। ৬৭-৬৮॥ ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দেখিলেন, অথচ ভগবান্ বিষ্ণু নিদ্রিত। তখন তিনি শ্রীহরির জাগরণের নিমিত্ত তাঁহার নেত্রে লগ্না যোগনিদ্রাকে একাগ্রচিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই দেবী তেজোময় শ্রীবিষ্ণুর নিদ্রা, ইনি অতুলনীয়া, বিশ্বের ঈশ্বরী জগদ্ধাত্রী, জগতের ইনি সৃষ্টি ও সংহার-কারিণী। ৬৮-৭২॥ ব্রহ্মা বলিলেন (এইরূপে স্তব করিলেন)—

হে সনাতনি, পরিণামহীনে দেবি! তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা, তুমিই বষট্কার, তুমিই উদাত্তাদি-স্বররূপা, তুমিই সুধা, আবার তুমিই ত্রিমাত্রারূপা (অউম, প্রণব)। যাহা বিশেষরূপে উচ্চারণ করা যায় না, সেই অর্ধমাত্রারূপে স্থিতা ও নিত্যা তুমিই। তুমিই গায়ত্রী, তুমিই দেবজননী সাবিত্রী, তুমিই সকল জগৎ ধারণ কর ও সৃষ্টি কর। আবার তুমিই পালন করিয়া প্রলয়ে সর্বদা ইহার সংহারও কর। ৭২-৭৬॥ হে জগদ্রূপা, তুমি আদিতে সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা এবং অন্তকালে সংহাররূপা। তুমি মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা এবং মহাস্মৃতি। তুমিই আবার মহামোহরূপা। তুমি শ্রেষ্ঠা দেবী এবং মহেশ্বরী। ৭৬-৭৮॥ ত্রিগুণের পরিণামকারিণী তুমিই সর্বপ্রাণীর কারণ। তুমি কালরাত্রি, তুমি মহারাত্রি, তুমিই ভীষণা মোহরাত্রি। তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী। তুমি হ্রী, তুমিই অধ্যবসায়রূপা বুদ্ধি।

তুমি লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষমা। তুমি খড়্গধারিণী, শূলধারিণী, ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খ ও ধনুর্ধারিণী এবং বাণ ভুসণ্ডী এবং পরিঘ অস্ত্রধারিণী। ৭৮-৮১ ॥

তুমি সৌম্যা (দেবগণের প্রতি) আবার অতীব অসৌম্যা (অসুর গণের প্রতি)। সকল সৌম্য বস্তু হইতেও তুমি অতীব সুন্দরী। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা। তুমি পরমা দেবী পরমেশ্বরী। হে জগতের আত্মভূতে! সৎ অসৎ যাহা কিছু বস্তু কোথাও আছে, সেই সকলের শক্তিভূতা তুমি। আমি তোমার কী স্তুতি করিব? যিনি জগতের স্রষ্টা পালয়িতা ও সংহর্তা, সেই ঈশ্বর (নারায়ণ)-কেও তুমি নিদ্রাধীন করিয়াছ। তোমাকে স্তুতি করিতে এই জগতে কে সমর্থ? ৮১-৮৪ ॥ বিষ্ণু, শিব এবং আমি, এই তিন দেবতাকেই তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ। তোমাকে স্তব করে শক্তি কার? নিজ সুমহান্ প্রভাববশে তুমি এবং-বিধা। হে দেবি! তুমি স্তুতা হইয়া এই দুর্ধর্ষ অসুরদ্বয় মধু ও কৈটভকে মোহিত কর। জগৎপ্রভু অচ্যুতকে শীঘ্র প্রবুদ্ধ কর এবং এই দুই মহাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রবর্তিত কর। ৮৪-৮৭ ॥

(মেধা) ঋষি বলিলেন—সেই তামসী (যোগনিদ্রা) দেবীকে তখন সেইস্থলে ব্রহ্মা এইরূপ স্তুতি করিলে, তিনি মধু-কৈটভ-বধার্থ বিষ্ণুকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নয়ন মুখ বাহু হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গতা হইয়া ব্রহ্মার নয়নগোচর হইলেন। ৮৮-৯১ ॥ তখন জগৎপতি জনার্দন, যোগনিদ্রা কর্তৃক মুক্ত হইয়া কারণসমুদ্রে ভুজঙ্গশয্যা হইতে উঠিলেন এবং অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সেই দুরাত্মা মহাপরাক্রান্ত মধু-কৈটভ ক্রোধে লোহিতনয়ন হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিলেন। তখন সমুত্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদের সহিত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু বিষ্ণু তাহাদের সহিত পঞ্চসহস্র বর্ষ বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অতিবলে উন্মত্ত হইয়া এবং মহামায়া দ্বারা মোহিত হইয়া শ্রীহরিকে অসুরদ্বয় বলিল—তুমি আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। ৯১-৯৫ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি অন্য বর চাহি না, তোমরা যদি আজ তুষ্ট হইয়া থাকো, আমি তবে এই বর চাহি যে তোমরা আমার বধ্য হইবে। ৯৬-৯৮ ॥ ঋষি (মেধা) বলিলেন—এইরূপে বঞ্চিত হইয়া অসুরদ্বয় যখন দেখিল, সমগ্র জগৎ জলপ্লাবিত, তখন তাহারা ভগবান্ পদ্মলোচনকে বলিল, যেখানে পৃথিবী জলে মগ্না নহে সেইস্থানে আমাদিগকে বধ কর। ৯৯-১০১ ॥ ঋষি (মেধা) কহিলেন—শঙ্খচক্র-গদাধারী ভগবান্ হরি, তাহাই হউক, এইকথা বলিয়া নিজ জঙ্ঘার উপরে তাহাদের মস্তক রাখিয়া তাহা চক্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার স্তবে দেবী মহামায়া স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই দেবীর মাহাত্ম্য আপনাকে আরও বলিতেছি শুনুন। ১০২-১০৪ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

মধ্যম চরিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-সৈন্য-বধ

ঋষিরুবাচ। ১

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥২
তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥৩
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ-গরুড়ধ্বজৌ ॥৪
যথা বৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুর-চেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভব-বিস্তরম্ ॥৫
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥৬
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥৭
এতদ্ বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারি-বিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥৮
ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটি-কুটিলাননৌ ॥৯
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥১০
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥১১

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্ ।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥১২
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেব-শরীরজম্ ।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥১৩
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্ ।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥১৪
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরু নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥১৫
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা ।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥১৬
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা ।
নয়ন-ত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥১৭
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥১৮
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশি-সমুদ্ভবাম্ ।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥১৯
শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্মৈ পিনাকধৃক্ ।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥২০
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥২১
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ ॥২২

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দ্দদৌ ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্ ।।২৩
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্ ।।২৪
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে ।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ।।২৫
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু ।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্ ॥২৬
অঙ্গুরীয়ক-রত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ ।।২৭
বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্ ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাঽভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ।।২৮
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্ ।
অদদাজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্ ।।২৯
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ।।৩০
শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণি-বিভূষিতম্ ।
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ।।৩১
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ।।৩২
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ।
অমায়তাঽতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ ।।৩৩
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ।।৩৪

জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্ ।
তুষ্টুবুর্ম্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ॥৩৫
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ ॥৩৬
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ ॥৩৭
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা ।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্ ॥৩৮
ক্ষোভিতাশেষ-পাতালাং ধনুর্জ্যা-নিস্বনেন তাম্ ।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥৩৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্ ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥৪০
মহিষাসুর-সেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥৪১
রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ ।
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥৪২
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥৪৩
গজবাজি-সহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ ।
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥৪৪
বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ ।
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥৪৫

অন্যে চ তত্রাযুতশো রথ-নাগ-হয়ৈর্বৃতাঃ।
যুযুধে সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ ॥৪৬
কোটি-কোটি-সহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা।
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ ॥৪৭
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশু-পট্টিশৈঃ ॥৪৮
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে।
দেবীং খড়্গপ্রহারৈশ্চ তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ ॥৪৯
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥৫০
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥৫১
সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেসরী।
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ ॥৫২
নিঃশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥৫৩
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসি-পট্টিশৈঃ।
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥৫৪
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥৫৫
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥৫৬

পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বন-বিমোহিতান্ ।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধ্বা চান্যানকর্ষত ॥৫৭
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাঽপরে ।
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥৫৮
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুসলেন ভৃশং হতাঃ ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥৫৯
নিরন্তরাঃ শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে ।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ ॥৬০
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাঽপরে ।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥৬১
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ ।
এক-বাহ্বক্ষি-চরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ ॥৬২
ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥৬৩
কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ ॥৬৪
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥৬৫
পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা ।
অগম্যা সাঽভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥৬৬
শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুর-বাজিনাম্ ॥৬৭
ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা ।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥৬৮

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধূতকেসরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ।।৬৯

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ।।৭০

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরসৈন্যবধঃ॥

মধ্যম-চরিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর সৈন্য-বধ

ঋষি (মেধা) কহিলেন—পুরাকালে পূর্ণ একশত বর্ষ ধরিয়া দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন দেবগণের অধিপতি ছিলেন ইন্দ্র এবং অসুরাধিপতি ছিল মহিষাসুর। সেই যুদ্ধে মহাবল অসুরগণ দেব-সৈন্যকে পরাজিত করিলে সকল দেবকে জয় করিয়া মহিষাসুর দেবগণের ইন্দ্র হইল। ১-৩॥ অনন্তর পরাজিত দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে পুরোভাগে করিয়া, যেখানে শিব ও বিষ্ণু ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট দেবগণ যথাযথ বর্ণনা করিলেন মহিষাসুর কর্ত্তৃক দেবগণের পরাজয়ের বিবরণ। সেই অসুর নিজে সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্য দেবগণের পদ অধিকার করিয়াছে। ৪-৬॥ স্বর্গ হইতে সেই দুরাত্মা, দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাই তাঁহারা এক্ষণে মানুষের মতো মর্তলোকে বিচরণ করিতেছেন। আপনাদের নিকট অসুরের দুষ্কর্ম সমস্তই নিবেদন করিলাম। আমরা আপনাদের শরণ লইলাম। তাহার (সেই অসুরের) বধের কথা চিন্তা করিয়া দেখুন। ৭-৮॥ ভগবান্ মধুসূদন ও শিব, দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। ভ্রূকুটিতে তাঁহাদের বদন কুটিল হইল। অতঃপর অতি কোপাবিষ্ট শ্রীহরি শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীমহাদেবের বদন হইতে মহৎ জ্যোতি-নির্গত হইল। ৯-১০॥ ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতার শরীর হইতেও অতি প্রবল তেজ নির্গত হইল, এবং এই সকল তেজ একীভূত হইল। দেবগণ সেইস্থানে দেখিতে পাইলেন জ্বলন্ত পর্ব্বতের মতো সেই মহাতেজোরাশি, তাহার দীপ্তিতে দিকের অন্তরাল পূর্ণ হইয়াছে।

১১-১২ ॥ সেইস্থলে সকল দেবতার শরীরসঞ্জাত সেই তেজঃসমূহ একত্র হইয়া জ্যোতি দ্বারা ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিয়া একটি নারীতে পরিণত হইল। ১৩ ॥

শিবের তেজে হইল সেই নারীর মুখ, যমের তেজে তাঁহার কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুগুলি (ইঁহার অষ্টাদশ বাহু) চন্দ্রের তেজে পয়োধর যুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ। জঙ্ঘা ও উরু হইল বরুণের তেজে। পৃথিবীর তেজে হইল নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণদ্বয়, সূর্যের তেজে পায়ের অঙ্গুলিগুলি, হস্তের অঙ্গুলিগুলি হইল বসুগণের তেজে, কুবেরের তেজে নাসিকা। ১৪-১৬ ॥ প্রজাপতির তেজে হইল দন্তসমূহ। নয়ন তিনটি হইল অগ্নির তেজে। ভ্রূদ্বয় হইল সন্ধ্যাদেবীদ্বয়ের (প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা) তেজে। পবনের তেজে হইল কর্ণদ্বয়। এইরূপ অন্যান্য দেবগণেরও তেজ হইতে শিবা (দুর্গা) দেবী আবির্ভূতা হইলেন। ১৭-১৪ ॥ অনন্তর সমস্ত দেবতার তেজোরাশি হইতে উদ্ভূতা দেবীকে দেখিয়া, মহিষাসুর দ্বারা প্রপীড়িত দেবগণ আনন্দিত হইলেন। পিনাকধারী (মহাদেব) তাঁহাকে (দেবীকে) নিজ শূল হইতে একটি শূল বাহির করিয়া দিলেন। কৃষ্ণ (বিষ্ণু) নিজ চক্র হইতে একটি চক্র বাহির করিয়া দিলেন। বরুণ তাঁহাকে দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি (অস্ত্র বিশেষ), পবন দিলেন ধনুঃ এবং বাণপূর্ণ দুইটি তূণীর। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বজ্র হইতে একটি বজ্র নির্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি ঐরাবত হস্তীর গলদেশ হইতে ঘণ্টাও দেবীকে দিলেন। ১৯-২২ ॥ যম তাঁহার দণ্ড হইতে একটি দণ্ড দিলেন, জলাধিপতি দিলেন পাশ (তাঁহার অস্ত্র-বিশেষ)। প্রজাপতি দিলেন অক্ষমালা (জপমালা), ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু (নিজ কমণ্ডলু হইতে)। সূর্য দেবীর সমস্ত রোমকূপে নিজের

কিরণ সঞ্চারিত করিলেন। কাল তাঁহাকে দিলেন উজ্জ্বল খড়্গ ও চর্ম (ঢাল)। ২৩-২৪॥ ক্ষীরসমুদ্র দিলেন শুভ্র হার, দুইখানি অজর (চির নবীন) বস্ত্র, দিব্য চূড়ামণি, কুণ্ডলদ্বয়, বলয়, শুভ্র অর্ধচন্দ্র, সকল (অষ্টাদশ) হস্তে কেয়ূর, উজ্জ্বল নূপুরদ্বয়, অতিসুন্দর কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে রত্নরাজি (অঙ্গুরীয়)। বিশ্বকর্মা দেবীকে দিলেন অতি নির্মল (উজ্জ্বল) কুঠার, নানাবিধ অস্ত্র এবং অভেদ্য বর্ম্ম। ২৫-২৮॥

জলধি তাঁহাকে দিলেন মস্তকে এবং বক্ষে একটি করিয়া অমলিন (নির্ম্মল) পদ্মের মালা এবং একটি অতিমনোরম পদ্ম। হিমালয় দিলেন তাঁহার (দেবীর) বাহন সিংহ এবং নানাবিধ রত্ন। ২৮-২৯॥ কুবের দিলেন সুরাপূর্ণ পানপাত্র। পৃথিবী ধারণকারী, সকল ভুজঙ্গের অধীশ্বর শেষ (অনন্ত), দেবীকে দিলেন মহামণিমণ্ডিত একটি নাগহার। অন্যান্য দেবতাও তাঁহাকে অলংকার ও অস্ত্রদ্বারা সম্মানিত করিলে দেবী অট্টহাস্য সহকারে পুনঃপুন উচ্চনাদ (সিংহনাদ, অসুরকে যুদ্ধে আহ্বান) করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সমগ্র আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল। ৩০-৩২॥ সেই ভয়ানক অপরিমিত অতিমহান্ শব্দের সুমহান্ প্রতিধ্বনি হইল—তাহাতে সকল ভুবন ও সমুদ্র কাঁপিয়া উঠিল, পৃথিবী ও সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত হইল। দেবগণ আনন্দে সেই সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করিলেন। (অথবা, 'জয়া' এই নাম দিল)। ভক্তিভরে নত হইয়া মুনিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৩-৩৫॥

সকল ত্রৈলোক্য বিক্ষুব্ধ দেখিয়া অসুরগণ সকল সেনা সজ্জিত করিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়া সমুত্থিত (যুদ্ধার্থে উদ্যোগী) হইল। মহিষাসুর বলিল, 'আঃ, এ কী।' ইহা বলিয়া সে অসংখ্য অসুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেই শব্দের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে দেখিতে পাইল, দেবী

তেজের দ্বারা ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার চরণের ভরে পৃথিবী বিনত হইয়াছে, তাঁহার কিরীট গগন স্পর্শ করিয়াছে, তিনি ধনুকের জ্যাশব্দ দ্বারা সমগ্র পাতালদেশ ব্যাকুল করিয়াছেন এবং সহস্র বাহু দ্বারা সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। ৩৫ ৩৯।

অনন্তর সুরারিগণের (অসুরদের) সেই দেবীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই যুদ্ধে নানাভাবে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহে দিগন্তর উদ্ভাসিত হইল। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামে এক প্রবল অসুর এবং চামর নামে অপর এক অসুর অন্য অসুরদের সহযোগে চতুরঙ্গ বল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৯-৪১॥ উদগ্র নামে এক মহাদানব ষাট হাজার রথ লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইল। মহাহনু নামে অসুর এক কোটি রথ লইল, অসিলোমা নামে অসুরের রথ পাঁচ কোটি। বাস্কল নামক অসুর ষাট লক্ষ রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল (রথ, রথারোহী সৈন্য)। অনেক সহস্র হস্তী (গজ সৈন্য), অশ্ব (অশ্বারোহী) ও কোটি রথ (রথী) দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অপর এক অসুর সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ৪২-৪৪॥

বিড়ালাক্ষ নামে অসুর পাঁচ লক্ষ অযুত (পাঁচশত কোটি) রথ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেই রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইরূপে অন্য মহাসুরগণও বহু অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবৃত হইয়া সেইস্থানে দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। (স্বয়ং) মহিষাসুরও সহস্র সহস্র কোটি রথ গজ ও অশ্বসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ৪৪-৪৭॥ অসুরগণ তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ (এইগুলি বিভিন্ন অস্ত্রের নাম) দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ শক্তি, কেহ পাশ, কেহ বা খড়্গ দ্বারা দেবীকে আঘাত করিতে লাগিল। সেই দেবী চণ্ডিকাও তখন সেই সকল শস্ত্র ও অস্ত্র (শস্ত্র

খড়্গাদি, যাহা দিয়া আঘাত করা হয়, অস্ত্র বাণাদি, যাহা ছুঁড়িয়া মারা মারা হয়) হেলায় ছেদন করিয়া স্বয়ং শস্ত্র ও অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবীর মুখে কোন ক্লান্তি দেখা গেল না—তাঁহাকে দেবর্ষিগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন। চণ্ডিকাদেবী অসুরগণের দেহে শস্ত্র ও অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৪৭-৫১ ॥ দেবীর বাহন সেই সিংহও ক্রুদ্ধ হইয়া কেশর কম্পিত করিয়া, বনমধ্যে দাবাগ্নির ন্যায় সেই অসুরসেনামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল (তাহাদের বধ করিতে লাগিল)। যুদ্ধকালে অম্বিকা দেবী যে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তাহাই তৎক্ষণাৎ শত শত গণে পরিণত হইল। তাহারা (সেই গণ) পরশু, ভিন্দিপাল অসি পট্টিশ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবীর শক্তির দ্বারা বর্ধিততেজা হইয়া তাহারা অসুর বধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কেহ বা পটহ, কেহ বা শঙ্খ, কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইয়া সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। ৫১-৫৫ ॥ অনন্তর দেবী ত্রিশূল ও গদা দ্বারা; শক্তি বর্ষণ করিয়া এবং খড়্গাদির আঘাতে শত শত মহাসুর বধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঘণ্টারবে বিমুগ্ধ করিয়া অন্য অসুরদিগকে নিপাতিত করিলেন। আবার কতকগুলিকে পাশ অস্ত্রে বাঁধিয়া টানিয়া আনিলেন (ও বধ করিলেন)। কেহ বা তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল, কেহ বা গদার আঘাতে মর্দিত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিল (মরিয়া গেল)। কেহ কেহ মুষলের দারুণ আঘাতে রক্ত বমন করিতে লাগিল, কেহ বা শূলের দ্বারা বক্ষে আহত হইয়া ভূপতিত হইল। কোন কোন অসুর বা সৈন্যগণসহ যুদ্ধক্ষেত্রে বাণরাজি দ্বারা সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করিল। অসুরদের কাহারও বাহু ছিন্ন হইল, কাহারও গ্রীবাদেশ ছিন্ন হইল, কাহারও বা মস্তক ভূতলে পড়িল, কাহারও বা দেহের মধ্যদেশ বিদীর্ণ (খণ্ডিত) হইল। ৫৫-৬১ ॥

কোন কোন অসুর দেবী কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটি বাহু, নয়ন ও চরণ লইয়া ভূমিতে পতিত হইল। কাহারও বা মস্তক ছিন্ন হইলেও পড়িয়া গিয়া (কবন্ধাকারে) সে আবার উঠিল। সেই কবন্ধগুলি উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোন কোন কবন্ধ ছিন্নমস্তক হইয়াও তালে তালে সেই যুদ্ধে নাচিতে লাগিল। তাহাদের হাতে খড়্‌গ, শক্তি ও ঋষ্টি ছিল। এই মহাসুরগণ (কবন্ধরূপে) দেবীকে 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলিতে লাগিল। ৬২-৬৪ ॥

রথ হস্তী অশ্বগণ এবং অসুরগণ যুদ্ধে পতিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী তদ্দারা পূর্ণ হওয়ায় সেই মহারণক্ষেত্র অগম্য হইয়া উঠিল। হস্তী অসুর ও অশ্বগণের রক্তপ্রবাহে সত্বই সেখানে মহানদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই অম্বিকা সেই বিপুল অসুরসৈন্য নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন—অগ্নি যেমন তৃণ ও কাষ্ঠের মহাস্তূপকে ভস্ম করিয়া ফেলে। ৬৫-৬৭ ॥ সেই সিংহও কেশর কাঁপাইয়া ভীষণ গর্জন করিয়া অসুরগণের দেহ হইতে যেন প্রাণ অন্বেষণ করিতে লাগিল (বধ করিতে লাগিল)। সেই রণস্থলে অসুরদের সহিত দেবীর সেই গণও এইরূপ যুদ্ধ করিল যে দেবগণ তুষ্ট হইয়া আকাশে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬৮-৬৯ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-বধ

ঋষিরুবাচ ॥১

নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্ ॥২
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥৩
তস্য চ্ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্ ॥৪
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু চ্ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥৫
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ ॥৬
সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥৭
তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥৮
চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥৯
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ ॥১০
হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥১১

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্ ।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্ ॥১২
ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥১৩
ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥১৪
যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥১৫
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা ।
করপ্রহারেণ শির-শ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্ ॥১৬
উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥১৭
দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্ ।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্ ॥১৮
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্ ।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥১৯
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥২০
এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥২১
কাংশ্চিত্তুণ্ড-প্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্ ।
লাঙ্গূলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥২২

বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিঃশ্বাস-পবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥২৩
নিপাত্য প্রমথানীক-মভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা ॥২৪
সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥২৫
বেগভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্যত।
লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥২৬
ধুতশৃঙ্গ-বিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥২৭
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাঽকরোৎ ॥২৮
সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥২৯
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥৩০
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥৩১
করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকর্ষ জগর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥৩২
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩৩

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ ।
পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥৩৪
ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥৩৫
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ ।
উবাচ তং মদোদ্ধূত-মুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥৩৬

দেব্যুবাচ ॥ ৩৭

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্ ।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥৩৮

ঋষিরুবাচ ॥৩৯

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্ ।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥৪০
ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥৪১
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥৪২
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥৪৩
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৪৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধঃ ॥

মধ্যম চরিত্র

তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-বধ

ঋষি (মেধা) কহিলেন : মহাসুর (মহিষাসুরের সেনাপতি) চিক্ষুর যখন দেখিল, সেই দৈত্যসেনা অম্বিকার হস্তে নিহত হইয়াছে, তখন সে ক্রোধবশে দেবী অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া গেল। মেঘ যেমন মেরুপর্বতের শৃঙ্গে বর্ষণ করে, সেইরূপ সেই অসুর যুদ্ধে দেবীকে শরজালে আচ্ছন্ন করিল। ১-২ ॥ তখন অবহেলায় সেই অসুরের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ ছিন্ন করিয়া দেবী (নিজ) বাণের দ্বারা অসুরের (রথের) অশ্বগুলি এবং অশ্বের চালককে (সারথিকে) বধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি (অসুরের) ধনুক ও অত্যুচ্চ ধ্বজও ছিন্ন করিলেন এবং সেই ছিন্নধনু অসুরকে বাণ দ্বারা সর্বশরীরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩-৫ ॥ সেই অসুরের ধনুক ও রথ ছিন্ন হওয়ায় সে রথহীন, অশ্বহীন ও সারথিবিহীন হইয়া খড়্গ ও চর্ম ধারণ করিয়া সেই দেবীর প্রতি ধাবমান হইল (তাঁহাকে আক্রমণ করিল)। সেই মহাবেগ অসুর তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা সিংহকে মস্তকে আঘাত করিল। দেবীর বামহস্তেও সে আঘাত করিল। ৬-৭ ॥ দেবীর বাহুতে পড়িয়া (অসুরের) খড়্গ ভাঙ্গিয়া গেল। হে রাজপুত্র! তখন কোপে রক্তনয়ন হইয়া অসুর শূল ধারণ করিল। মহাসুর সেই শূল ভদ্রকালীর (দেবীর) প্রতি নিক্ষেপ করিল। আকাশ হইতে সূর্যমণ্ডলের ন্যায় তেজের দ্বারা জাজ্বল্যমান সেই শূল পতিত হইতে দেখিয়া দেবী তাঁহার শূল নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর শূল, অসুরের সেই শূলসহ অসুরকে শতখণ্ডে বিদীর্ণ করিল। ৮-১০ ॥

মহিষাসুরের সেই মহাবীর সেনাপতি (চিক্ষুর) নিহত হইলে চামর নামে অসুর হস্তীতে আরোহণ করিয়া (যুদ্ধে) আগমন করিল। সে-ও শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে দেবী শীঘ্র হুংকার দ্বারা সেই শক্তিকে আঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। ১১-১২ ॥ শক্তি ব্যর্থ হইয়া ভূপতিত হইল দেখিয়া চামরাসুর কোপান্বিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিলে দেবী তাহাও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সিংহ লম্ফ দিয়া পড়িয়া হস্তি-কুম্ভের অন্তরালে থাকিয়া সেই অসুরের সহিত প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সেই সিংহও অসুর, হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে প্রবল আঘাত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।১৩-১৫ ॥ অতঃপর সিংহ বেগে আকাশে উঠিয়া লম্ফ দিয়া পড়িয়া করাঘাতে (থাবা দিয়া) অসুরের মস্তক (দেহ হইতে) বিচ্ছিন্ন করিল। প্রস্তর ও বৃক্ষাদি বর্ষণ করিয়া দেবী উদগ্র নামে অসুরকে এবং দণ্ড, মুষ্টি ও করতলের আঘাতে করাল নামক অসুরকে বধ করিলেন। (অতঃপর) দেবী কুপিত হইয়া গদার আঘাতে উদ্ধত নামে অসুরকে চূর্ণ করিলেন। ভিন্দিপালের দ্বারা বাস্কলকে এবং বাণ দ্বারা তিনি তাম্র ও অন্ধককে বধ করিলেন। ১৬-১৮ ॥ ত্রিনয়না পরমেশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য এবং মহাহনুকে বিনাশ করিলেন। তিনি অসিদ্বারা বিড়াল অসুরের দেহ হইতে মস্তক ভূপাতিত করিলেন এবং দুর্ধর্ষ ও দুর্মুখ নামে দুই অসুরকে বাণ দ্বারা যমালয়ে পাঠাইলেন। ১৯-২০ ॥ এই প্রকারে নিজ সেনা পরিক্ষীণ হইতে দেখিয়া মহিষাসুর নিজের মহিষ রূপে দেবীর গণদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সে কতকগুলিকে মুখের প্রহারে, অপর গুলিকে খুরের আঘাতে, আবার কাহাকেও বা লাঙ্গুলের আঘাতে, কাহাকেও বা শৃঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ করিল। অন্য কতক গণকে বেগের

দ্বারা, গর্জনের দ্বারা, ভ্রমণ দ্বারা এবং নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা ভূতলে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে (দেবীর) প্রমথ সৈন্য নিপাতিত করিয়া সেই অসুর দেবীর সিংহকে বধ করিতে ধাবিত হইলে, দেবী অম্বিকা ক্রুদ্ধা হইলেন। ২১-২৪ ॥ সেই মহাবীর অসুরও ক্রোধে খুরাঘাতে ভূতল বিদীর্ণ করিয়া. নিজ শৃঙ্গদয় দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। তাহার প্রবলবেগে বিচলিতা পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং লাঙ্গূলের আঘাতে আহত হইয়া সমুদ্র সর্বদিক্ প্লাবিত করিল। ২৫-২৬ ॥ সে শৃঙ্গ কম্পিত করিয়া আঘাত করিলে তাহাতে মেঘসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। শত শত পর্ব্বত তাহার নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ হইতে পড়িতে লাগিল। এইরূপে ক্রোধে উদ্দীপ্ত সেই মহাসুরকে আকাশ হইতে (তাঁহার অভিমুখে) আসিতে দেখিয়া দেবী চণ্ডিকা তাহার বধার্থ কোপ প্রকাশ করিলেন। ২৭-২৮ ॥ দেবী তাহার উপর পাশ নিক্ষেপ করিয়া সেই মহাসুরকে বন্ধন করিলেন। সেই অসুরও বদ্ধ হইয়া সেই মহারণে মহিষের রূপ পরিত্যাগ করিল (সে ছিল মায়াবী)। অতঃপর সে তৎক্ষণাৎ সিংহমূর্তি ধারণ করিলে দেবী অম্বিকা যেই তাহার শিরশ্ছেদ করিতে গেলেন, তেমনি সে এক খড়্গধারী পুরুষরূপে দেখা দিল। তখন দেবী অবিলম্বে বাণ দিয়া খড়্গচর্ম সহ সেই পুরুষকে খণ্ডিত করিলে সে এক বিশাল হস্তী হইল। ২৯-৩১ ॥ সে হস্তদ্বারা সেই দেবীবাহন সিংহকে আকর্ষণ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। আকর্ষণ করিবার সময়ে দেবী তাহার হস্ত খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। অতঃপর সেই মহাসুর পুনরায় মহিষ রূপ ধারণ করিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় চরাচর ত্রিভুবন বিচলিত করিয়া তুলিল। জগজ্জননী চণ্ডিকা অনন্তর কুপিতা হইয়া পুনঃ পুনঃ উত্তম সুরা পান করিতে লাগিলেন এবং রক্তনয়না হইয়া হাস্য করিতে

লাগিলেন। ৩২-৩৪ ॥ সেই অসুরও বলবীর্য ও মদে উদ্ধত হইয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা দেবীর প্রতি পর্ব্বত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই নিক্ষিপ্ত পর্বত তিনি শরজালে চূর্ণিত করিয়া (পান হেতু) রক্তবদনা হইয়া অস্পষ্ট অক্ষরে সেই মদোদ্ধত অসুরকে কহিলেন। ৩৫-৩৬ ॥ দেবী কহিলেন, ওরে মূঢ়! যতক্ষণ আমি মধুপান করি সেই অল্পক্ষণ তুই গর্জন কর। আমি তোকে বধ করিলে এইস্থলেই দেবগণ শীঘ্র (আনন্দে) গর্জন করিবেন। ঋষি (মেধা) কহিলেন, এই কথা বলিয়া দেবী লম্ফ প্রদান করিয়া সেই মহাসুরের উপর আরোহণ করিলেন এবং চরণ দ্বারা কণ্ঠ নিপীড়িত করিয়া তাহাকে শূলদ্বারা আঘাত করিলেন। ৩৭-৪০ ॥ তখন অসুর দেবীর চরণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া নিজের বদন হইতে বহির্গত হইতে গিয়া দেবীর তেজে স্তব্ধ হইয়া গেল। অর্ধনিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতে সেই যুদ্ধরত মহাদৈত্যকে দেবী তাঁহার সেই বিশাল খড়্গ দ্বারা শিরশ্ছেদ করিয়া পাতিত করিলেন। ৪১-৪২ ॥ তখন 'হায় হায়' করিতে করিতে সেই দৈত্য সৈন্য সমস্তই বিনষ্ট হইল। (ইহাতে) সকল দেবগণই পরম আনন্দ লাভ করিলেন। দেবগণ দিব্য মহর্ষিগণ সহ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরোবৃন্দ (তৎসহ) নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৩-৪৪ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

[৪র্থ অধ্যায়—শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি]

ঋষিরুবাচ ॥১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে

তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা ।

তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা

বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষ-পুলকোদ্‌গম-চারুদেহাঃ ॥২

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা,

নিঃশেষদেবগণ-শক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা ।

তামম্বিকামখিল-দেবমহর্ষি পূজ্যাং,

ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥৩

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো-

ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ ।

সা চণ্ডিকাখিল-জগৎপরিপালনায়,

নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ।৪

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ

পাপাত্মনাং, কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ ।

শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা,

তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥৫

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ,

কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি ।

কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি

সর্ব্বেষু দেব্যসুর-দেবগণাদিকেষু ॥৬

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাঽপি দোষৈ-

ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।

সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ ৭

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন

তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।

স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-

রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ,

অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়-তত্ত্বসারৈঃ।

মোক্ষার্থিভির্মুনিভি-রস্তসমস্তদোষৈ-

র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৯

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-

মুদ্গীথরম্য*-পদ-পাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়,

বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ১০

মেধাঽসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা,

দুর্গাঽসি দুর্গ-ভবসাগরনৌরসঙ্গা।

শ্রীঃ কৈটভারি-হৃদয়ৈক-কৃতাধিবাসা,

গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১১

---

*উদ্গীত—ইত্যপি পাঠঃ।

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্রং
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি,
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥১২

দৃষ্ট্বা তু দেবি! কুপিতং ভ্রূকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং,
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তক-দর্শনেন ॥ ১৩

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়,
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৪

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং,
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা,
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥১৫

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী-প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি! তেন ॥ ১৬

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্য-দুঃখভয়-হারিণি কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকার-করণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥১৭

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে,
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু,
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৮

*দৃষ্ট্বৈব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম,
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা,
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥ ১৯

খড়্গপ্রভা-নিকর-বিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তি-নিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়-মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ২০

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি! শীলং,
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ, হৃতদেবপরাক্রমাণাং,
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥২১

---

* দৃষ্টৈ্বেতি পাঠান্তরম্

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা,
ত্বয্যেব দেবি ! বরদে ! ভুবনত্রয়েঽপি ॥২২

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদ-সুরারিভবং নমস্তে ॥২৩

শূলেন পাহি নো দেবি ! পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥২৪

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥২৫

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থ-ঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥২৬

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥২৭

ঋষিরুবাচ ॥ ২৮

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥২৯

ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদ-সুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥ ৩০

দেব্যুবাচ ॥ ৩১

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৩২

(দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা) ॥

দেবা উচুঃ ॥ ৩৩

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ।

যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩৪

যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি ।

সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ ৩৫

যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে ।

তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদি-সম্পদাম্ । ৩৬

বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে ॥ ৩৭

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৮

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ ।

তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥ ৩৯

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা ।

দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয়হিতৈষিণী ॥ ৪০

পুনশ্চ গৌরীদেহাৎ সা সমুদ্ভূতা যথাঽভবৎ ।

বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥ ৪১

রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী ।

তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥৪২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদিস্তুতিঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি

ঋষি (মেধা) কহিলেন—সেই মহাবীর্য দুরাত্মা মহিষাসুর এবং অসুরসেনা দেবী কর্তৃক হত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ নানাবিধ বাক্যদ্বারা দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রণতিকালে তাঁহাদের গ্রীবা ও স্কন্ধ অবনত হইয়াছিল এবং আনন্দে তাঁহাদের চারুদেহে পুলকের উদ্গম হইয়াছিল। ১-২ ॥ সমগ্র দেবগণের শক্তিসমূহের পুঞ্জীভূত মূর্তিস্বরূপা যে দেবী নিজ শক্তিবলে এই ভুবন ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সমস্ত অমর ও ঋষিগণের পূজনীয়া সেই অম্বিকা দেবীকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি—তিনি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। যে দেবীর অনুপম প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করিতে ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মা এবং শিবও সমর্থ নহেন, সেই চণ্ডিকা দেবী সকল জগৎ পালনার্থে এবং অসুরভয় বিনাশার্থে অভিলাষিণী হউন। ৩-৪ ॥

যিনি পুণ্যাচারীদের গৃহে লক্ষ্মী এবং পাপাচারীদিগের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি সুবুদ্ধি মানবের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং সৎকুলজাত মনুষ্যের হৃদয়ে লজ্জা (পাপকর্মে সঙ্কোচ), সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। তুমি জগৎ পরিপালন কর, দেবি! ৫ ॥ হে দেবি! সকল দেব অসুর প্রভৃতির মধ্যে অচিন্ত্য তোমার এই রূপ, অসুর-বিনাশী এই যে প্রভূত অলৌকিক বীর্য এবং দৈত্যযুদ্ধে তোমার এই অসামান্য আচরণ, ইহা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ৬ ॥ তুমি সকল ভুবনের কারণ এবং ত্রিগুণময়ী হইলেও হরি, শিব প্রভৃতি দেবগণও তোমাকে জানিতে পারেন না, কারণ তোমার অন্ত নাই। তুমি সকলের আশ্রয়-

ভূত। এই জগৎ তোমার অংশস্বরূপ। তুমি অব্যাকৃতা (নামরূপাদি-হীনা) পরমা আদ্যা প্রকৃতি (সকল কারণের কারণ)। ৭॥ হে দেবি! যাহা উচ্চারণ করিলে সকল যজ্ঞে সকল দেবতা তৃপ্তিলাভ করেন, তুমি সেই 'স্বাহা'। পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু 'স্বধা'ও তুমি। তাই লোকে তোমাকেই 'স্বাহা' এবং 'স্বধা' বলিয়া উচ্চারণ করে। ৮॥ হে দেবি! যাহা মুক্তির হেতু, অচিন্তনীয় মহাব্রত (যোগদর্শনোক্ত সার্বভৌম ব্রত-বিশেষ) যাহার সাধন; সর্বপ্রকার দোষমুক্ত, মুক্তিকামী মুনিগণ সম্যক্ জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া যাহা অভ্যাস করেন, তুমিই সেই ভগবতী পরমা বিদ্যা। ৯॥ হে দেবি! তুমি শব্দব্রহ্মরূপা, নির্মল (উদাত্তাদি-যোগে উচ্চারিত) ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদের আশ্রয়স্থল; আবার তুমি গীত সহ রমণীয় পাঠযুক্ত সামমন্ত্রেরও আশ্রয়। অতএব তুমি দেবী ভগবতী, জগৎ কল্যাণের জন্য বার্তারূপা (কৃষি, গবাদিপালন ও বাণিজ্যরূপা) এবং ত্রিভুবনের সকল দুঃখহারিণী। ১০॥

হে দেবী! তুমিই মেধা, যাহার বলে সকল শাস্ত্রের সার অবগত হওয়া যায়; তুমিই দুর্গম ভবসমুদ্র পারার্থ দুর্গারূপা তরণী। তুমি অদ্বিতীয়া। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর হৃদয়ে একমাত্র অধিবাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তুমি। ভগবান্ চন্দ্রচূড়ের (মহাদেবের) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা গৌরীও তুমি। ১১॥ দেবি! ইহা অতীব আশ্চর্য যে মহিষাসুর তোমার এই ঈষদ্‌হাস্যময় নির্মল, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়াও সহসা ক্রোধভরে আঘাত করিল (করিতে পারিল)। ১২॥ হে দেবি! কুপিত, ভ্রূকুটি হেতু ভয়ঙ্কর, তথাপি উদীয়মান শশধরের ন্যায় কান্তিমান্ তোমার মুখখানি দেখিয়া মহিষাসুর যে তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ত্যাগ করে নাই, ইহা অতীব বিচিত্র। ক্রুদ্ধ যমকে দেখিয়া কে বাঁচিয়া

থাকিতে পারে ? ১৩ ॥ দেবি ! প্রসন্না হও। তুমি কৃপাবতী হইয়াও বিশ্বের মঙ্গলার্থে কুপিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ সবংশে (অসুরাদি) বিনাশ কর। মহিষাসুরের অতি বিশাল বাহিনী নিঃশেষ হইতে দেখিয়া আমরা এখন ইহা বুঝিতে পারিলাম। ১৪ ॥ দেবি ! সর্বদাই কল্যাণপ্রদা তুমি যাহাদের প্রতি প্রসন্না হও, তাহারাই নগরে সম্মান লাভ করে, তাহারাই ধনলাভ করে, তাহারাই কীর্তিমান্ হয়, তাহাদেরই প্রতি বন্ধুগণ কখনও বিমুখ হয় না, তাহারাই ধন্য, তাহারাই পুত্র ভৃত্য পত্নীসহ নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারে। ১৫ ॥ হে দেবি ! তোমার প্রসাদে পুণ্যবান্ মানব সর্বদাই সকল পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠিত করে, লোকের সমাদর লাভ করে এবং (অন্তে) স্বর্গে গমন করে। হে দেবি ! তাই তুমি ত্রিলোকেই শুভফল দান করিয়া থাক। ১৬॥ হে দুর্গে ! তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি সকলের ভয় দূর কর। সজ্জনে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাদিগকে অত্যন্ত শুভ বুদ্ধি (সৎকর্মে প্রেরণা) দান কর। তুমি দারিদ্র্য, দুঃখ ও ভয় দূর কর। তুমি ব্যতীত আর কে আছে (এইরূপ) সর্ববিধ কল্যাণ বিধান করিতে সর্বদাই দয়ার্দ্রহৃদয়া ? ১৭ ॥

হে দেবি ! তুমি নিশ্চয়ই শত্রুগণকে (অসুরগণকে) বধ কর এই কথা চিন্তা করিয়া যে, ইহারা বিনষ্ট হইলে জগৎ (জগজ্জন) সুখী হউক এবং ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া নরকলাভোচিত পাপ করিলেও যুদ্ধে নিহত হইয়া ইহারা স্বর্গে গমন করুক। ১৮ ॥ হে দেবি ! তুমি সমস্ত অসুর দৃষ্টিমাত্রই ভস্মীভূত কর না কেন ? শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপে তোমার প্রয়োজন কী ? (ইহার হেতু এই) শত্রুগণের বিষয়েও তোমার এই অতি শুভ বুদ্ধি হয় যে ইহারাও অস্ত্রের আঘাতে পবিত্র হইয়া উত্তম লোক (স্বর্গ) লাভ করুক। ১৯ ॥ (হে ভগবতি !) অসুরগণ (যুদ্ধকালে)

তোমার জ্যোতির্ময় চন্দ্রতুল্য বদনখানি দেখিতেছিল, তাই তোমার খড়্গ হইতে নির্গত প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ এবং তোমার শূলের অগ্রভাগের দীপ্তি-দ্বারা তাহাদের নয়ন বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই। ২০॥ দেবি! তোমার স্বভাব হইল দুরাত্মাদিগের দুরাচার দমন করা। তোমার এই রূপও অচিন্তনীয়. কাহারও সহিত ইহার তুলনা হয় না। যে অসুরগণ দেবতাদের বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছে সেই অসুরদেরও বিনাশক তোমার বীরত্ব। তুমি আবার এই প্রকারে শত্রুদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করিয়াছ। ২১॥ হে বরপ্রদে দেবি! তোমার এই পরাক্রমের সহিত কিসের তুলনা হইতে পারে? এইরূপ অতি মনোহর, শত্রুগণের ভীতিপ্রদ রূপই বা কোথায় আছে? তোমার চিত্তে যুদ্ধকালীন নিষ্ঠুরতা এবং দয়া দুইই দেখা গিয়াছে। ত্রিভুবনে তোমাতেই ইহা সম্ভবপর। ২২॥ (হে দেবি!) শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তুমি এই নিখিল ভুবনের পরিত্রাণ করিয়াছ। শত্রুগণকে সম্মুখযুদ্ধে বধ করিয়া তুমি তাহাদিগকেও (পাপীদিগকেও) স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছ। আমাদিগের (দেবগণের) মদমত্ত অসুর হইতে ভীতিও তুমি অপসারণ করিয়াছ। তোমাকে প্রণাম করি। ২৩॥ হে দেবি! তুমি শূলদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। হে অম্বিকে! আমাদিগকে খড়্গের দ্বাবা রক্ষা কর। তুমি ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা এবং ধনুকের জ্যা-শব্দের দ্বারাও আমাদিগকে রক্ষা কর। ২৪॥ হে চণ্ডিকে! হে ঈশ্বরি! তুমি তোমার শূল চালনা করিয়া আমাদিগকে পুর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে রক্ষা কর। ২৫॥ (হে দেবি!) ত্রিভুবনে তোমার যে সৌম্যমূর্তি এবং যে অতীব ভয়ঙ্করী মূর্তিসকল বিরাজমান, সেই সমুদয় দ্বারা তুমি আমাদিগকে ও বিশ্বকে রক্ষা কর। ২৬॥ হে অম্বিকে! তোমার পাণি-পল্লবে খড়্গ, শূল,-

গদা প্রভৃতি যে অস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। ২৭ ॥

ঋষি (মেধা) কহিলেন, সমুদয় দেবতা কর্তৃক এইরূপ স্তুতা হইয়া, নন্দন কাননে জাত দিব্য পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা ভক্তিসহকারে অর্চিতা হইয়া এবং দিব্য ধূপদ্বারা সুধূপিত হইয়া, জগদ্ধাত্রী দেবী অনুগ্রহ করিবার অভিমুখী (প্রসন্না) হইলেন। তিনি প্রণত দেবগণকে (এইরূপ) বলিলেন। ২৮-৩০ ॥ দেবী কহিলেন—হে দেবগণ! তোমরা সকলে আমার নিকট যাহা অভিপ্রেত তাহা প্রার্থনা কর (বর চাও)। ৩১-৩২ ॥ দেবগণ বলিলেন—(দেবি) তুমি তো সমস্তই (সকল অভীষ্টই) প্রদান করিয়াছ, আর কিছুই (প্রার্থনীয়) অবশিষ্ট নাই। কারণ তুমি আমাদের শত্রু এই মহিষাসুরকে বধ করিয়াছ। তবে যদি মহেশ্বরি! তুমি আমাদিগকে বর দিতে চাও, তবে এই বর দেও যে আমরা যখনই স্মরণ করিব, তখনই তুমি (আসিয়া) আমাদিগের (এইরূপ) ঘোর বিপৎসমূহ বিনষ্ট করিবে। ৩৩-৩৬ ॥ যে মানব এই সমুদয় স্তুতি (পাঠ) করিয়া তোমার স্তব করিবে, হে বিমলাননে! হে অম্বিকে! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া সেই মানবের ধন, দার প্রভৃতি সম্পদের প্রাচুর্য প্রদান করিয়া সর্বদা তাহার বৃদ্ধি সম্পাদন করিবে। ৩৬-৩৭ ॥

ঋষি (মেধা) কহিলেন—জগতের এবং নিজেদের নিমিত্ত দেবগণ, দেবীকে এইরূপ (স্তব দ্বারা) প্রসন্না করিলেন। হে মহারাজ! তখন দেবী ভদ্রকালী 'তাহাই হইবে' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৮-৩৯ ॥ হে রাজন্! ত্রিলোকের কল্যাণকারিণী দেবী পুরাকালে যেরূপে দেবগণের শরীর হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিলাম। ৪০ ॥

(মহারাজ !) দুরাত্মা অসুরদিগের এবং (বিশেষতঃ) শুম্ভ-নিশুম্ভের বধার্থে এবং ভুবনের রক্ষার্থে দেবগণের হিতকরী দেবী গৌরীদেহে যেভাবে পুনরায় উৎপন্না হইয়াছিলেন, (এক্ষণে) তাহা তোমাকে যথাযথ বলিতেছি, আমার নিকট শোন। ৪১-৪২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

৫ম অধ্যায় — দেবীদূত-সংবাদ

ঋষিরুবাচ ॥১

পুরা শুম্ভ-নিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥২
তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥৩
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম্ম চ।
ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥৪
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥ ৫
তয়াস্মাকং বরো দত্তো মহাপৎসু স্মৃতাঽখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৬
ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৭

দেবা ঊচুঃ ॥৮

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কূর্ম্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥১৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ ॥১৪ নমস্তস্যৈ ॥১৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ ॥১৭ নমস্তস্যৈ ॥১৮ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥২০ নমস্তস্যৈ ২১ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥২৩ নমস্তস্যৈ ॥ ২৪ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥২৬ নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥২৯ নমস্তস্যৈ ॥৩০ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥৩২ নমস্তস্যৈ ॥৩৩ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥৩৫ নমস্তস্যৈ ॥৩৬ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। ৩৮ নমস্তস্যৈ। ৩৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৪১ নমস্তস্যৈ ॥৪২ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৪৪ নমস্তস্যৈ ॥৪৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৬
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৪৭ নমস্তস্যৈ ॥ ৪৮ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪৯
যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৫০ নমস্তস্যৈ ॥৫১ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৫৩ নমস্তস্যৈ ॥৫৪ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৫৬ নমস্তস্যৈ ॥৫৭ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৫৯ নমস্তস্যৈ ॥৬০ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৬২ নমস্তস্যৈ ॥৬৩ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৬৫ নমস্তস্যৈ ॥৬৬ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৬৮ নমস্তস্যৈ ॥৬৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ॥৭১ নমস্তস্যৈ ॥৭২ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭৩

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥৭৪ নমস্তস্যৈ ॥৭৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭৬
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥৭৭
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ ॥৭৮ নমস্তস্যৈ ॥৭৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৮০
স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়া-
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী,
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥৮১
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ,
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ ॥৮২

ঋষিরুবাচ। ৮৩

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন! ॥৮৪
সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা।
শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ॥৮৫
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥৮৬
শরীরকোষাদ্ যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল-কৃতাশ্রয়া ॥৮৮
ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥৮৯
তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ! ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥৯০
নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর! ॥৯১
স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র! তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥৯২
যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে-গৃহে ॥৯৩
ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥৯৪
বিমানং হংসসংযুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥৯৫
নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৯৬
ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৯৭
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ! ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥৯৮

নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥৯৯
এবং দৈতেন্দ্র! রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥১০০

ঋষিরুবাচ ॥১০১

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥১০২
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু ॥১০৩
স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে।
যা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥১০৪

দূত উবাচ ॥১০৫

দেবি! দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥১০৬
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জিতাখিল-দৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥১০৭
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥১০৮
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥১০৯
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥১১০

যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্ব্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥১১১
স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি! লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্ ॥১১২
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি! রত্নভূতাঽসি বৈ যতঃ ॥১১৩
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥১১৪

ঋষিরুবাচ ॥১১৫

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১১৬

দেব্যুবাচ ॥১১৭

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥১১৮
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥১১৯
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥১২০
তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্নাতু মে লঘু ॥১২১

দূত উবাচ ॥ ১২২

অবলিপ্তাঽসি মৈবং ত্বং দেবি! ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥১২৩

অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি! কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥১২৪
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্যসি সম্মুখম্ ॥ ১২৫
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণ-নির্দ্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥ ১২৬

দেব্যুবাচ ॥১২৭

এবমেতদ্ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥১২৮
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥১২৯
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
দেব্যা দূতসংবাদঃ ॥

উত্তর চরিত্র

পঞ্চম অধ্যায়

দেবী-দূত-সংবাদ

ঋষি (মেধা) কহিলেন—পুরাকালে দম্ভ ও শক্তির প্রভাবে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অসুরদ্বয় ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিভুবনের আধিপত্য ও যজ্ঞ-ভাগ কাড়িয়া লইয়াছিল। ১-২ ॥ তাহারা দুইজনেই সূর্য চন্দ্র কুবের যম ও বরুণের অধিকার (পদ) হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহারা পবনের ঐশ্বর্য হরণ করিয়াছিল এবং অগ্নিদেবের কর্মও স্বয়ং করিতেছিল। তখন দেবগণ পরাজিত হইয়া অধিকারচ্যুত এবং স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। ৩-৪ ॥ এইরূপে সমস্ত দেবতাই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই প্রবল অসুরদ্বয় কর্তৃক বিতাড়িত হইলেন। তখন তাঁহারা সেই অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিলেন। তাঁহারা এইরূপ মনে করিলেন, দেবী ত আমাদিগকে বর দিয়াছেন যে বিপদে তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি আমাদের সমস্ত ঘোর বিপদ্ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা পর্বতরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন এবং অতঃপর সেখানে বিষ্ণুমায়া দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৬-৭ ॥ দেবগণ কহিলেন (এইরূপে স্তুতি করিলেন)—দেবীকে প্রণাম করি, মহাদেবীকে প্রণাম করি, শিবা (কল্যাণময়ী) দেবীকে সতত প্রণাম করি। প্রকৃতি দেবী, ভদ্রা দেবীকে সর্বদা প্রণাম করি। রৌদ্রা দেবীকে, নিত্যা দেবীকে, গৌরী দেবীকে প্রণাম করি, প্রণাম করি। জ্যোৎস্নারূপিণী, চন্দ্ররূপিণী সুখময়ী দেবীকে সর্বদা প্রণাম করি। কল্যাণীকে প্রণত হই, বৃদ্ধি ও

সিদ্ধি দেবীকে পুনঃপুন নমস্কার জানাই। তুমি নৈঋ'তী (রাক্ষসীরূপিণী) দেবী তোমাকে প্রণাম করি। রাজগণের লক্ষ্মীরূপা দেবীও তুমি, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি শর্বাণী দেবী, তোমাকে প্রণাম করি। ৮-১১ ॥ দুর্গা দেবীকে নমস্কার করি, যিনি দুর্গমে (বিপদে) পার করেন, যিনি সারভূতা, সর্বকর্ত্রী, তাঁহাকে প্রণাম। কীর্তিরূপা, কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা দেবীকেও সতত প্রণাম করি। যিনি অতি সৌম্যা আবার অতি রৌদ্রা (ভয়ঙ্করী), নত হইয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। জগতের প্রতিষ্ঠারূপিণী দেবীকে, কৃতি-রূপা (ক্রিয়াস্বরূপা) দেবীকে পুনঃপুনঃ নমস্কার জানাই। ১২-১৩ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীর মধ্যে বিষ্ণুমায়া নামে বর্ণিতা হন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। ১৪-১৬ ॥ যে দেবী সকল প্রাণীতে চৈতন্য বলিয়া অভিহিতা হন, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধি-রূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে বার বার প্রণতি জানাই। ১৭-১২ ॥ যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে স্থিতা, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি। ২২-২৫ ॥ যে দেবী সকল প্রাণীতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে নমস্কার, পুনঃপুনঃ নমস্কার। যে দেবী সর্বভূতে ছায়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ২৬-৩১ ॥ যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ৩১-৩৪ ॥ যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণারূপে স্থিতা, সেই দেবীকে পুনঃপুনঃ পুনঃপুনঃ প্রণতি করি। ৩৫-৩৭ ॥ যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি। ৩৮-৪০ ॥ যে দেবী সর্বভূতে জাতিরূপে অবস্থিতা, সেই দেবীকে বারংবার প্রণাম জানাইতেছি। ৪১-৪৩ ॥ যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণতি করিতেছি।

৪৪-৪৬ ॥ যে দেবী সর্বভূতে শান্তিরূপে রহিয়াছেন, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি। ৪৭-৪৯ ॥ যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে স্থিতা, সেই দেবীকে বারবার প্রণতি নিবেদন করিতেছি। ৫০-৫২ ॥ যে দেবী সর্বভূতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি। ৫৩-৫৫ ॥ যে দেবী সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণতি জানাইতেছি। ৫৬-৫৮ ॥ যে দেবী সর্বভূতে বৃত্তিরূপে (কৃষি-গোপালন-বাণিজ্যরূপে) অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। ৫৯-৬১ ॥ যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণতি করিতেছি ৬২-৬৪ ॥ যে দেবী সর্বভূতে দয়ারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। ৬৫-৬৭ ॥ যে দেবী সর্বভূতে তুষ্টিরূপে বিরাজ করেন, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি। ৬৮-৭০ ॥ যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে বিরাজমানা, তাঁহাকে বার বার প্রণতি নিবেদন করিতেছি। ৭১-৭৩ ॥ যে দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম জানাইতেছি। ৭৪-৭৬ ॥ যে দেবী প্রাণিগণের (একাদশ) ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী এবং (পৃথিবী জল প্রভৃতি) পঞ্চভূতে সতত অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, সেই ব্যাপ্তি দেবীকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি। ৭৭ ॥ যে দেবী এই সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া চৈতন্যশক্তিরূপে বিরাজমানা, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি। ৭৮-৮০ ॥ পূর্বে দেবগণ যাহার স্তুতি করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র, অভীষ্টলাভ হওয়ায় যাহাকে প্রত্যহ পূজা করিয়াছিলেন—আমরা দেবগণ, উদ্ধত দানবগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া যে ঈশ্বরী দেবীকে সম্প্রতি প্রণতি করিতেছি, এবং আমরা ভক্তিনম্র দেহে স্মরণ করিলে যিনি আমাদের সকল আপদ্ তৎক্ষণাৎ

অভিহত করেন সেই কল্যাণদায়িনী পরমেশ্বরী আমাদের কল্যাণবিধান ও অভীষ্ট প্রদান করুন এবং (আমাদের) বিপৎসমূহ বিনষ্ট করুন। ৮১-৮২ ॥

ঋষি (মেধা) কহিলেন, হে রাজকুমার, দেবগণ যখন এইরূপ স্তবাদি (স্তব ও প্রার্থনা) করিতেছিলেন, তখন পার্বতী দেবী সেখানে জাহ্নবীর (মন্দাকিনীর) জলে স্নান করিতে আসিলেন (দৃষ্টিগোচর হইলেন)। সেই সুভ্রূ (দেবী) সেই দেবগণকে কহিলেন, তোমরা এখানে কাহার স্তুতি করিতেছ? (তখন) তাঁহার (সেই দেবীর) দেহকোষ হইতে নির্গতা হইয়া শিবা দেবী কহিলেন, শুম্ভ এবং নিশুম্ভ দৈত্য কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও বিদূরিত হইয়া দেবগণ সমবেত হইয়া এই স্তব আমারই করিতেছেন। ৮৩-৮৬ ॥ যেহেতু অম্বিকা দেবী, পার্বতীদেবীর দেহকোষ হইতে নির্গতা হইয়াছেন, তাই সর্ব্বজগতে কৌষিকী (কৌশিকী) বলিয়া তিনি অভিহিতা। ৮৭ ॥ তিনি (কৌশিকী দেবী) (দেহ হইতে) বিনির্গতা হইলে পার্ব্বতী দেবীও কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন। তাই তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমালয়-বাসিনী হইলেন। ৮৮ ॥ অতঃপর সেই অম্বিকা (কৌষিকী) দেবী অতি সুমনোহর রূপ ধারণ করিলে, শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড, তাঁহাকে দেখিতে পাইল (তিনি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন)। ৮৯ ॥ তাহারা শুম্ভকে গিয়া কহিল, মহারাজ! হিমালয়কে রূপে উদ্ভাসিত করিয়া একটি নারী রহিয়াছেন। ৯০ ॥ সেই-প্রকার উৎকৃষ্ট রূপ কখনও কেহ দেখে নাই। হে অসুরাধিপতি! আপনি এই রমণীকে জানুন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করুন। হে দৈত্যরাজ! এইটি অঙ্গনাকুলে শ্রেষ্ঠা, অতি মনোহরাঙ্গী. এবং তেজে (দেহকান্তিতে) দিঙ্‌মণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আপনি তাঁহাকে

(একবার) দেখুন। ৯১-৯২ ॥ হে প্রভু, ত্রিভুবনের সমস্ত রত্ন, মণি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সমুদয়ই এক্ষণে আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। ৯৩ ॥ আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ হস্তী ঐরাবত, পারিজাত বৃক্ষ এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও আনিয়াছেন। এই যে অদ্ভুত হংসচালিত বিমান আপনার অঙ্গনে রহিয়াছে ইহা রত্নভূত (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমান) এবং পূর্ব্বে এইটি ব্রহ্মার ছিল। আপনি কুবেরের নিকট হইতে এই মহাপদ্ম নামে নিধি আনিয়াছেন। সমুদ্র আপনাকে দিয়াছে কিঞ্জল্কিনী (বা কেশর নির্মিতা) মালা, যে মালায় পদ্মফুল কখনও মলিন (শুষ্ক) হয় না। ৯৪-৯৬ ॥ আপনার গৃহে বরুণের ছত্র রহিয়াছে, ইহা সুবর্ণ প্রসব করে। আর এই শ্রেষ্ঠ রথটি পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির ছিল (এক্ষণে আপনার গৃহে আছে)। যমরাজের যে এক শক্তি অস্ত্র আছে তাহা প্রাণহরা, তাহাও আপনি হরণ করিয়াছেন। জলাধিপতির (বরুণের) পাশ অস্ত্র রহিয়াছে আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের হস্তে। সাগর হইতে জাত সকল রত্নই আপনার সহোদর নিশুম্ভের হস্তগত। অগ্নিদেবও আপনাকে অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল দুইখণ্ড বস্ত্র (পরিধেয়) দিয়াছেন। ৯৭-৯৯ ॥ হে দানব-রাজ। আপনি সকল অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থই করায়ত্ত করিয়াছেন। তবে এই কল্যাণী রমণীরত্ন কেন গ্রহণ করিতেছেন না ? ১০০ ॥ ঋষি (মেধা) কহিলেন, চণ্ড ও মুণ্ডের এই কথা শুনিয়া শুম্ভ (অসুররাজ) সুগ্রীব নামে দূতকে দেবীর সকাশে পাঠাইলেন। এই এই কথা তুমি গিয়া তাঁহাকে আমার কথানুসারে বলিবে এবং যাহাতে তিনি প্রীতিবশে (বলপূর্ব্বক নহে), আসেন সেই চেষ্টা তুমি সত্বর করিবে। ১০১ ॥ অনন্তর সেই দেবী যেখানে রহিয়াছেন সেই পরম মনোরম পর্ব্বত প্রদেশে দূত (সুগ্রীব) গিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে কোমলভাবে এইরূপ নিবেদন

করিল। ১০৪ ॥ দূত কহিল, দেবি! দৈত্যাধিপতি শুম্ভ ত্রিভুবনে সর্ব্বেশ্বর। আমি তাঁহার দূত, তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। সমুদয় দেবগণ মধ্যে তাঁহার আদেশ সর্ব্বদা অপ্রতিহত, তিনি সকল দেবতাকে পরাজিত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ১০৬-১০৭ ॥ এই অখিল ত্রিভুবন আমারই, দেবগণ ও আমার বশবর্তী। সকল যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্ আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি। ত্রিলোকে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন (উৎকৃষ্ট বস্তু) আছে, তাহা সমস্তই আমার আয়ত্ত রহিয়াছে। ১০৮-৯ ॥ ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অশ্বরত্ন উদ্ভূত হইয়াছে, উচ্চৈঃশ্রবা নামে সেই অশ্ব দেবগণ আমাকে প্রণতিপূর্বক সমর্পণ করিয়াছে। অন্যান্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু পূর্বে দেবতা, গন্ধর্ব ও ভুজঙ্গগণের ছিল, হে সুন্দরি! তাহা (এক্ষণে) আমারই হইয়াছে। ১১০-১১। হে দেবি! আমরা মনে করি, এই জগতে তুমি নারীরত্ন (শ্রেষ্ঠা অঙ্গনা)। অতএব তুমি আমাদের নিকটে আগমন কর, কারণ আমরা (অসুর ভ্রাতৃদ্বয়, শুম্ভ-নিশুম্ভ) রত্নভোগী (রত্নভোগের যোগ্য পাত্র)। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! যেহেতু তুমি রত্নভূতা (রমণীকুলে শ্রেষ্ঠা) তাই তুমি আমাকে বা প্রবলবিক্রম আমার ভ্রাতা নিশুম্ভকে ভজনা কর। ১১২-১৩ ॥ (হে দেবি!) তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে অতুলনীয় পরম ঐশ্বর্য লাভ করিবে—এইকথা বুদ্ধিদ্বারা পর্যালোচনা করিয়া তুমি আমাকে ভজনা কর। ১১৪ ॥

ঋষি (মেধা) বলিলেন, যে দুর্গা ভগবতী কল্যাণময়ী, যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, সেই দেবী গম্ভীর হইয়া মনে মনে ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন। ১১৫-১৬ ॥ (দেবী কহিলেন) তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, এ বিষয়ে তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই। শুম্ভ (অসুররাজ)

ত্রৈলোক্যের অধিপতি বটেন। নিশুম্ভও তদ্রূপ। ১১৭-১৮॥ আমি কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা এই বিষয়ে করিয়াছি, তাহা তো মিথ্যা হইতে দিতে পারি না। আমি মন্দবুদ্ধি তাই আমি যে প্রতিজ্ঞা পূর্বে করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। "যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার (এই) দর্প হরণ করিবেন, যিনি পৃথিবীতে আমার তুল্যবল হইবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন"। ১১৯-২০॥ তবে এখন মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভ আসুন। বিলম্বে ফল কী? আমাকে (যুদ্ধে) পরাজিত করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করুন। ১১১॥ দূত কহিল, হে দেবি! আপনি দর্পিতা (দেখিতেছি)। আমার সম্মুখে আপনি এরূপ কথা বলিবেন না: শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখে কোন্ পুরুষই বা দাঁড়াইতে (যুদ্ধ করিতে) পারে? যুদ্ধে অন্য দৈত্যগণের নিকটেও, সকল দেবতা মিলিয়াও দাঁড়াইতে পারে না—আপনি একাকিনী নারী, আপনার তো কথাই নাই। ১১২-১৪॥ ইন্দ্রাদি সকল দেব যুদ্ধে শুম্ভ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে অবস্থান করিতে পারে নাই। আপনি নারী হইয়া কী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে (যুদ্ধে) অবস্থান করিবেন? তাই আমার কথামতো আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট গমন করুন। কেশাকৃষ্টা হইয়া হৃতগৌরবা হইয়া যাইবেন না (ভালয় ভালয় চলুন)। ১১৫-১৬।

দেবী বলিলেন, শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে অত্যন্ত বলশালী তাহা তো যথার্থ। কিন্তু কী করিব, আমি যে বিবেচনা না করিয়া পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি। তাই তুমি যাও, আমি যাহা বলিলাম সকল কথা যত্ন করিয়া (ভালো করিয়া) অসুরশ্রেষ্ঠের নিকট জানাও। তিনি যাহা সঙ্গত মনে হয় তাহা করুন। ১১৭-১৯॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচনবধ

ঋষিরুবাচ ॥১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥২
তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥৩
হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্য-পরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণ-বিহ্বলাম্ ॥৪
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা ॥৫

ঋষিরুবাচ ॥৬

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥৭
স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচল-সংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥৮
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৯

দেব্যুবাচ ॥১০

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥১১

ঋষিরুবাচ ॥১২

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥১৩

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তি-পরশ্বধৈঃ ॥১৪

ততো ধূতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥১৫

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যাঞ্জঘান সুমহাসুরান্ ॥১৬

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥১৭

বিচ্ছিন্ন-বাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেশরঃ ॥১৮

ক্ষণেন তদ্ বলং সর্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥১৯

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥২০

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥২১

হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥২২

কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি ।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্ ।।২৩
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে ।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ।।২৪
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
ধূম্রলোচনবধঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচনবধ

ঋষি (মেধা) কহিলেন, দেবীর এই উক্তি শুনিয়া ক্রোধপূর্ণ হইয়া সেই দূত দৈত্যরাজের নিকট গিয়া সবিস্তরে (সকল) নিবেদন করিল। অনন্তর সেই দূতের সেই কথা শুনিয়া অসুররাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ধূম্রলোচন নামে অসুরপ্রধানকে কহিলেন (আদেশ করিলেন)। ১-৩॥ ওহে ধূম্রলোচন! তুমি নিজসেনাবেষ্টিত হইয়া শীঘ্র কেশ আকর্ষণে আকুল করিয়া সেই দুষ্টা নারীকে বলপূর্বক আনয়ন কর। তাহাকে (সেই রমণীকে) রক্ষার নিমিত্ত যদি কেহ উপস্থিত হয়, তবে সে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, যেই হৌক, তাহাকে বধ করিবে (করিয়া নারীটিকে আনিবে)। ৪-৫॥

ঋষি (মেধা) বলিলেন, তাহার (শুম্ভের) আদেশ পাইয়া সেই ধূম্রলোচন দৈত্য শীঘ্র ষাট হাজার অসুর বেষ্টিত হইয়া দ্রুত গমন করিল। ৬-৭। অনন্তর সে (ধূম্রলোচন) হিমালয়ে অবস্থিতা দেবীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আপনি শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট আগমন করুন। যদি আপনি প্রীতিপূর্ব্বক (ভালো কথায়, আপসে) আমার প্রভুর নিকট আগমন না করেন, তবে এই আমি আপনাকে কেশ আকর্ষণে পীড়িত করিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। ৮-৯। দেবী কহিলেন, দৈত্যরাজ তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি বলবান্, তোমার সঙ্গে সৈন্যও রহিয়াছে। যদি এইরূপ আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কী করিতে পারি? ১০-১১॥

ঋষি (মেধা) কহিলেন, এই কথা বলা হইলে সেই অসুর ধূম্রলোচন তাঁহার (দেবীর) প্রতি ধাবমান হইল। তখন দেবী অম্বিকা তাহাকে

হুংকার করিয়াই ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। ১২-১৩ ॥ অনন্তর সেই মহতী অসুরসেনা ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে এবং শক্তি ও কুঠার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর দেবীর বাহন সেই সিংহ কোপে কেশর কম্পিত করিয়া অতি ভীষণ গর্জন করিয়া অসুরসৈন্যমধ্যে (ঝাঁপাইয়া) পড়িল। সে (সিংহ) মহাসুরমধ্যে কাহাকেও করপ্রহারে (থাবা মারিয়া), কাহাকেও মুখের দ্বারা (অর্থাৎ দংশন করিয়া), আবার কাহাকেও বা অধরদ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিল। ১৪-১৬ ॥ সিংহ নখের দ্বারা কোন কোন অসুরের উদর বিদীর্ণ করিল, কাহারও বা করতল প্রহারের দ্বারা মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ১৭ ॥ কতকগুলি অসুরের আবার বাহু এবং মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। (সিংহ) আবার কেশর কম্পিত করিয়া কাহারও উদর হইতে রক্ত পান করিতে লাগিল। অতি কুপিত হইয়া সেই মহাত্মা সিংহ অল্প সময়েই সেই সমস্ত অসুরসৈন্য নিঃশেষ করিল। ১৮-১৯ ॥ দৈত্যরাজ শুম্ভ শুনিল, সেই অসুর ধূম্রলোচনকে দেবী বধ করিয়াছেন এবং দেবীর বাহন সিংহ সেই সমুদয় অসুরসৈন্য নিঃশেষিত করিয়াছে। তখন সে ক্রোধে অধর স্ফুরিত করিয়া সেই মহাসুরদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ডকে আদেশ করিল। ২০-২১ ॥ হে চণ্ড, হে মুণ্ড! বহু সেনা নিয়া তোমরা সেখানে যাও এবং গিয়া দেবীকে শীঘ্র কেশাকর্ষণ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। যদি যুদ্ধে বিপদ্ হইবে মনে কর, তবে সমুদয় অস্ত্র নিয়া সকল অসুর (সমস্ত সেনা) লইয়া তাহাকে বধ করিও (অর্থাৎ আনা সম্ভব না হইলে বধ করিও)। ২২-২৩ ॥ সেই দুষ্টা আহত হইলে এবং সিংহটা বিনষ্ট হইলে, শীঘ্র সেই অম্বিকাকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। ২৪ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ডবধ

ঋষিরুবাচ ॥১

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥২
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥৩
তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥৪
ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥৫
ভ্রূকুটী-কুটিলাত্তস্যা ললাট-ফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৬
বিচিত্র-খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্ম-পরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৭
অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বাললন-ভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥৮
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্ বলম্ ॥৯
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশ-গ্রাহি-যোধঘণ্টা-সমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥১০
তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥১১

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরস্যন্যমপোথয়ৎ ।।১২
তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি ।।১৩
বলিনাং তদ্ বলং সর্ব্বমসুরাণাং দুরাত্মনাম্।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তথা ।।১৪
অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্টাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ।।১৫
ক্ষণেন তদ্ বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ।।১৬
শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ।।১৭
তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ।।১৮
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শ-দশনোজ্জ্বলা ।।১৯
উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ।।২০
অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ।।২১
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ।। ২২

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাস-মিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥২৩
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৪

ঋষিরুবাচ ॥২৫

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥২৬
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥২৭

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
চণ্ডমুণ্ডবধঃ ॥

সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ডবধ

ঋষি (মেধা) বলিলেন, (দৈত্যরাজের) আদেশ পাইয়া চণ্ড ও মুণ্ডকে অগ্রবর্তী করিয়া সেই দৈত্যগণ চতুরঙ্গ (পদাতি, অশ্ব, হস্তী ও রথ) সৈন্য সহিত অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। ১-২ ॥ তখন তাহারা হিমালয়ের স্বর্ণময় মহান্ শৃঙ্গে সিংহোপরি বিরাজমানা ঈষৎ হাস্যময়ী দেবীকে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইয়া তাহারা চেষ্টিত হইল। অন্য কেহ কেহ ধনু আকর্ষণ করিয়া এবং তরবারি লইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিল।৩-৫ ॥ অতঃপর অম্বিকাদেবী সেই শত্রুগণের প্রতি অতীব কুপিতা হইলেন। তখন কোপে তাঁহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তাঁহার ললাটদেশ ভ্রূকুটি করায় কুটিল হইল এবং সেই ললাট হইতে ভীষণবদনা কালীদেবী অসি ও পাশধারিণী হইয়া দ্রুত নির্গতা হইলেন। ৫-৬ ॥ (এক্ষণে কালীর বর্ণনা হইতেছে) তিনি বিচিত্র-নরকপালধারিণী, নরমুণ্ডমালায় ভূষিতা, ব্যাঘ্র চর্ম-পরিহিতা, শুষ্কমাংসা, অতি ভয়ঙ্করী, অতিবিস্তৃতবদনশালিনী, লোলজিহ্বাহেতু ভীষণাকারা, তাঁহার নয়ন আরক্ত ও কোটরপ্রবিষ্ট, তিনি গর্জনের দ্বারা দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন (ঈদৃশী কালী নির্গতা হইলেন)।৭-৮ ॥ তিনি (কালী) সবেগে অসুর সৈন্য মধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িয়া মহাসুরগণকে বধ করিতে করিতে সেই সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।৯॥ হস্তিসমূহের পৃষ্ঠরক্ষক, চালক (মাহুত), সৈন্য (গজারোহী) এবং ঘণ্টা সহিত হস্তীগুলিকে একহস্তে তুলিয়া (নিজের) মুখের মধ্যে ফেলিতে লাগিলেন। ১০ ॥ এইরূপে অশ্বসহ অশ্বারোহী, সারথি সহিত রথ মুখে ফেলিয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে চর্ব্বণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১১ ॥

দেবী (কালী) কাহারও বা কেশে ধরিয়া, কাহারও গ্রীবা ধারণ করিয়া, অপর কাহাকেও পদতলে আক্রমণ করিয়া কাহাকেও বা বক্ষোদ্বারা নিষ্পিষ্ট করিয়া বধ করিয়লন ।১২ ॥ সেই মহাসুরগণ যে সকলশস্ত্র (অসি প্রভৃতি) ও মহাস্ত্রসমূহ (বাণ প্রভৃতি) নিক্ষেপ করিল, তখন দেবী তাহা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দন্ত দ্বারা মথিত করিলেন ।১৩ ॥ দেবী কালী সেই মহাবল দুরাত্মা অসুরগণের সেই বাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু মর্দন করিলেন, কিছু কিছু ভক্ষণ করিলেন, কিছু কিছু বা আঘাত করিয়া বধ করিলেন ।১৪ ॥ কেহ কেহ (দেবীর) অসির আঘাতে হত হইল, কেহ কেহ খট্টাঙ্গের আঘাতে, কেহ কেহ বা (দেবীর) দণ্ডাগ্রের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল ।১৫ ॥ ক্ষণমধ্যে সেই অসুর সৈন্য সকলেই নিহত হইল। তাহা দেখিয়া সেই অতিভয়ঙ্করী কালী দেবীর প্রতি চণ্ড (অসুর) ধাবিত হইল (সঙ্গে মুণ্ড ও আসিল)। সেই মহাসুর চণ্ড ভীষণ বাণ বৃষ্টি করিয়া এবং মুণ্ড (অসুর) সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই ভীম-নয়না দেবীকে আচ্ছন্ন করিল ।১৬-১৭ ॥ সেই অসংখ্য চক্র তাঁহার (দেবীর) মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মনে হইল, যেন অসংখ্য সূর্যবিম্ব মেঘের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে ।১৮ ॥ অতঃপর অতিকোপে ভয়ঙ্করী দেবী কালী ভীষণ গর্জন করিয়া অট্টহাস্য করিলেন। তখন তাঁহার বদন ভীষণ দেখাইতেছিল এবং বদনাভ্যন্তরে উজ্জ্বল দন্তের দিকে দৃষ্টি করা যাইতেছিল না ।১৯ ॥ অনন্তর কালী দেবী বিশাল অসি উদ্যত করিয় হুংকার ধ্বনি করিয়া চণ্ডের প্রতি ধাবমানা হইলেন এবং তাহার কেশ ধারণ করিয়া সেই অসি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ।২০ ॥ তখন চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ডও দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। দেবী ক্রোধে তাহাকেও অসির আঘাতে ভূপাতিত ও নিহত করিলেন ।২১ ॥ মহাবল

চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া সেই হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়াকুল হইয়া পলায়ন করিল ।২২ ॥ তখন দেবী কালী চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক লইয়া চণ্ডিকাদেবীর নিকট গিয়া প্রচণ্ড অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন—আমি তোমার নিকট এই দুই মহাপশু (চণ্ড ও মুণ্ড) এই উপহার দিলাম। তুমি স্বয়ং যুদ্ধরূপ যজ্ঞে (বলিরূপে) শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ কর ।২৩-২৪ ॥ ঋষি (মেধা) কহিলেন—অনন্তর কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী দুই মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ডকে (নিহত করিয়া) আনিতে দেখিয়া কালীদেবীকে মধুর বাক্যে কহিলেন ।২৫-২৬ ॥ যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে (বধ করিয়া) আনয়ন করিয়াছ, হে দেবি, সেইহেতু জগতে তুমি চামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধা হইবে ।২৭ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজবধ

ঋষিরুবাচ ॥১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥২
ততঃ কোপপরাধীন-চেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্‌যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥৩
অদ্য সর্ব্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥৪
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥৫
কালকা দৌর্হৃদা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥৬
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জ্জগাম মহাসৈন্য-সহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥৭
আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণী-গগনান্তরম্ ॥৮
ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥৯
ধনুর্জ্জ্যা-সিংহ-ঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥১০
তং নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥১১

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্য-বলান্বিতাঃ ।।১১
ব্রহ্মেশ-গুহ বিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ।।১৩
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণ-বাহনম্ ।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ।।১৪
হংসযুক্ত-বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুঃ ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ।।১৫
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ।।১৬
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবর-বাহনা ।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ।।১৭
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ।।১৮
যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ।।১৯
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপ-ক্ষিপ্তনক্ষত্র-সংহতিঃ ।।২০
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা ।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ।।২১
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ।।২২

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশত-নিনাদিনী ॥২৩
সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥২৪
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥২৫
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥২৬
বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥২৭
যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥২৮
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৯
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টি-বৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥৩০
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছূল-চক্র-পরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়া ধ্মাত-ধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥৩১
তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাত-বিদারিতান্।
খট্বাঙ্গ-প্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরত্তদা ॥৩২
কমণ্ডলু-জলাক্ষেপ-হতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥৩৩

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যাঞ্জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥৩৪
ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘ-প্রবর্ষিণঃ ॥৩৫
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষত-বক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৩৬
নখৈর্ব্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণ-দিগম্বরা ॥৩৭
চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥৩৮
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥৩৯
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৪০
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ ॥৪১
যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥৪২
কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ ॥৪৩
যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্য-বল-বিক্রমাঃ ॥৪৪

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্র-শস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥৪৫
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৬
বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥৪৭
বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥৪৮
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥৪৯
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৄঃ কোপ-সমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৫০
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তি-শূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥৫১
তৈশ্চাসুরাসৃক্-সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥৫২
তান্ বিষণ্নান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে! বিস্তরং বদনং কুরু ॥৫৩
মচ্ছস্ত্রপাত-সম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥৫৪
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥৫৫

ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে ॥৫৬
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্‌।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্‌ ॥৫৭
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্‌।
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি ॥৫৮
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্‌।
যতস্ততস্তদ্‌বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি ॥৫৯
মুখে সমুদ্‌গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্‌ ॥৬০
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভিঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্‌ ॥৬১
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘ-সমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল! রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৬২
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্‌মদোদ্ধতঃ ॥৬৩

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজবধঃ।

অষ্টম অধ্যায়

রক্তবীজবধ

ঋষি (মেধা) কহিলেন, চণ্ড ও মুণ্ড দুই দৈত্যই নিহত হইলে এবং সেই বিশাল সৈন্য নিঃশেষ হইয়া গেলে মহাপ্রতাপ অসুররাজ শুম্ভ ক্রোধপরবশ হইয়া সমুদয় দৈত্যসৈন্যের যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। ১-৩ ॥ (আদেশ এইরূপ) আজ চতুরঙ্গবল-সমন্বিত হইয়া এবং অস্ত্র উদ্যত করিয়া ষড়শীতি (৮৬ জন) অসুর, এবং নিজ সৈন্য সহিত চুরাশি জন কম্বু (অসুরবিশেষ) [যুদ্ধার্থ] নির্গত হউক। ৪ ॥ অসুরগণের কোটিবীর্য নামক পঞ্চাশটি কুল এবং ধৌম্র অসুরগণের একশত কুল আমার আদেশে নির্গত হউক। ৫ ॥ আমার আদেশ অনুসারে কালক, দৌহৃদ, মৌর্য ও কালকেয় (বিভিন্ন অসুরগোষ্ঠীর নাম) নামে অসুরগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সত্বর বহির্গত হউক। ৬ ॥ অসুররাজ শুম্ভের আদেশ ছিল ভয়ঙ্কর। সে এইরূপ আজ্ঞা দিয়া বহু সহস্র ভীষণ সৈনিক বেষ্টিত হইয়া বিনির্গত হইল। ৭ ॥ সেই অতি ভীষণ অসুরবাহিনী আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা জ্যাধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশের অন্তরাল পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ৮ ॥ হে রাজন্! অনন্তর সিংহ অতি ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল। দেবী অম্বিকাও ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সেই সিংহগর্জন বর্ধিত করিয়া তুলিলেন। ৯ ॥ কালী দেবী (পূর্ববর্ণিতা চামুণ্ডা) মুখ ব্যাদান করিয়া এরূপ ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন যে তাহা (পূর্ববর্ণিত) জ্যাশব্দ, সিংহগর্জন ও ঘণ্টাধ্বনিকেও অভিভূত করিল। ১০ ॥ সেই ধ্বনি শুনিয়া দৈত্যসেনা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে, সিংহকে ও কালীকে (চামুণ্ডাকে) বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ১১ ॥ মহারাজ! এই সময়ে অসুরদের সংহার এবং

বীর দেবগণের কল্যাণার্থে ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয় এবং বিষ্ণুর অতিবল-বীর্যযুক্ত শক্তিসমূহ সেই সেই রূপেই চণ্ডিকা দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ১২-১৩ ॥ যে দেবের যেমন রূপ (আকৃতি), যেমন ভূষণ ও বাহন, সেই সেই রূপেই সেই সেই শক্তি, অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থে আসিলেন। ১৪ ॥ জপমালা ও কমণ্ডলু লইয়া হংসচালিত বিমানে, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী নাম্নী দেবী আসিলেন। ১৫ ॥ বৃষে আরোহণ করিয়া উৎকৃষ্ট ত্রিশূল ধারণ করিয়া, বিশাল সর্প বলয়রূপে পরিয়া চন্দ্রকলা-ভূষিতা হইয়া মাহেশ্বরী শক্তি (শিবের শক্তি) আসিলেন। ১৬ ॥ কার্তিকেয়-রূপিণী অম্বিকা কৌমারী শক্তি, শ্রেষ্ঠ ময়ূর বাহনে শক্তি অস্ত্র ধারণ করিয়া দৈত্যগণসহ যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। ১৭ ॥ এইরূপে গরুড়াসীনা, শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ (বিষ্ণুর ধনুঃ) ও খড়্গ হস্তে লইয়া বৈষ্ণবী শক্তি আবির্ভূতা হইলেন। ১৮ ॥ ভগবান্ শ্রীহরি যে অনুপম বরাহ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বরাহের আকার ধারণ করিয়া বারাহী শক্তি ও সেখানে আসিলেন। ১৯ ॥ নরসিংহদেবের (বিষ্ণুর অবতার) তুল্য দেহ ধারণ করিয়া, কেশরের আক্ষেপে (ঝাঁকুনি দ্বারা) নক্ষত্রসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেখানে নারসিংহী শক্তি আসিলেন। ২০ ॥ গজরাজের (ঐরাবতের) উপরে চড়িয়া বজ্র হস্তে লইয়া সহস্রনয়না ঐন্দ্রী শক্তিও আগমন করিলেন। তাঁহার আকৃতি ইন্দ্রের মতো দেখাইতেছিল। ২১ ॥ অতঃপর দেবগণের সেই শক্তিসমূহে বেষ্টিত হইয়া ভগবান্ শিব আসিয়া চণ্ডিকাকে কহিলেন—আমার প্রতি প্রীতিবশে শীঘ্র অসুরগণকে বধ কর। ২২ ॥ তখন দেবীর দেহ হইতে (পূর্ববর্ণিতা) অতিভয়ঙ্করী, অতিঘোরা শত শত শৃগালের ন্যায় রবকারিণী যে চণ্ডিকা-শক্তি নির্গতা হইয়াছিলেন, সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্র-জটাধারী

ঈশানকে (মহাদেবকে) কহিলেন—হে ভগবন্। আপনি দূত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন করুন। ২৩-২৪ ॥ আপনি সেই অতি অহঙ্কারী শুম্ভ-নিশুম্ভ দানবদ্বয় এবং সেখানে অন্য যে সব দানব যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলুন (এই কথা)। ২৫ ॥ ইন্দ্র ত্রৈলোক্য লাভ করুন। দেবগণ যজ্ঞের হবিঃ ভোজন করুন। তোমরা যদি বাঁচিতে চাহ তবে পাতালে চলিয়া যাও। আর যদি বলদর্পে তোমরা যুদ্ধ করিতে চাও তবে আগমন কর, আমার (চামুণ্ডার) শৃগালগণ তোমাদের মাংসভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হউক (অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী)। ২৬-২৭ ॥ সেই দেবী (চামুণ্ডা) স্বয়ং শিবকে দূতকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তদবধি 'শিবদূতী' এই নামে লোকে প্রসিদ্ধি হইল। ২৮ ॥ সেই মহাদানবগণও শিবকর্ত্তৃক উক্ত, দেবীর বাক্য শুনিয়া সেই কাত্যায়নী (নামভেদে চণ্ডিকা) যেখানে ছিলেন, সেখানে ক্রোধান্বিত হইয়া উপস্থিত হইল। ২৯ ॥ অতঃপর প্রথমেই অসুরগণ সম্মুখে আসিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীর উপরে বাণ ও শক্তিসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ৩০ ॥ দেবী ধনুকে টঙ্কার দিয়া তাহা হইতে নিক্ষিপ্ত প্রবল বাণের দ্বারা অনায়াসে (শত্রু) ক্ষিপ্ত বাণ শূল চক্র কুঠার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৩১ ॥ তখন কালী দেবী শূলাঘাতের দ্বারা এবং খট্টাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া শুম্ভের সম্মুখেই শত্রুগণকে বিমর্দিত করিয়া সেই সমরে (রণক্ষেত্রে) বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩২ ॥ ব্রহ্মাণী দেবী যে যে পথে ধাবমানা হইলেন, সেই সেই স্থলেই শত্রুগণের প্রতি কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের শক্তি ও বীর্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ৩৩ ॥ মাহেশ্বরী দেবী ত্রিশূলের দ্বারা, বৈষ্ণবী দেবী চক্রের দ্বারা এবং কৌমারী দেবী অতি ক্রুদ্ধা হইয়া শক্তি অস্ত্র

দ্বারা দৈত্যবধে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৪। ঐন্দ্রী দেবীর বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া শত শত দৈত্য-দানব রক্তপ্রবাহ বর্ষণ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। ৩৫॥ বরাহমূর্তি (বারাহী) দেবীর মুখের আঘাতে আহত হইয়া, তাঁহার দংষ্ট্রার আঘাতে বিদীর্ণবক্ষা হইয়া এবং চক্রদ্বারা খণ্ডিত হইয়া, দৈত্যগণ ভূমিতে পতিত হইল। ৩৬॥ নারসিংহী দেবী নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া অন্য মহাদৈত্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি (ভীষণ) নিনাদ দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল ও আকাশ পূর্ণ করিয়া দিয়া যুদ্ধ-ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৭॥ শিবদূতী দেবীর ভীষণ অট্টহাস্যে মূর্ছিত হইয়া অসুরগণ ভূতলে পড়িল এবং তিনি তখন তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩৮॥ এইরূপে মাতৃশক্তিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যগণকে নানা উপায়ে মর্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। ৩৯॥ মাতৃগণ দ্বারা পীড়িত হইয়া দানবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রক্তবীজ নামে অসুরশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। ৪০॥ এই রক্তবীজের শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত যখন ভূতলে পড়িত, তখনই পৃথিবী হইতে তাহারই মতো একটি অসুর সমুৎপন্ন হইত। ৪১॥ সেই মহাসুর ইন্দ্রশক্তির সহিত গদাহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সেই দেবী ঐন্দ্রী তাহাকে নিজের বজ্র দ্বারা আঘাত করিলেন। ৪২॥ বজ্রের আঘাতে অসুর আহত হইলে দ্রুত তাহার রক্তস্রাব হইতে লাগিল। সেই রক্ত হইতে তাহারই আকৃতি ও বীর্য সম্পন্ন যোদ্ধা অসুরগণ উত্থিত হইল। ৪৩॥ তাঁহার শরীর হইতে যত বিন্দু রক্ত পড়িল, তাহারই বলবীর্য ও বিক্রম লইয়া ততগুলি পুরুষই জন্মিল। ৪৪॥ সেই রক্ত হইতে পুরুষগণ অতি ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মাতৃগণের সহিত অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

করিতে লাগিল। ৪৫ ॥ আবার বজ্রের আঘাতে রক্তবীজের মস্তক ছিন্ন হইলে যখন রক্তস্রোত বহিতে লাগিল, তখন তাহা হইতে সহস্র সহস্র পুরুষ (পূর্ববৎ) জন্মগ্রহণ করিল। ৪৬ ॥ বৈষ্ণবী দেবী যুদ্ধে সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে চক্রদ্বারা এবং ঐন্দ্রী দেবী গদা দ্বারা আঘাত করিলেন। ৪৭ ॥ বৈষ্ণবী দেবীর চক্রে খণ্ডিত সেই অসুরের শোণিতস্রাব হইতে উৎপন্ন, তাহারই তুল্য মহাসুর সহস্র সহস্র, জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ৪৮ ॥ কৌমারী দেবী শক্তিদ্বারা, বারাহী দেবী তরবারিদ্বারা এবং মাহেশ্বরী দেবী ত্রিশূলের দ্বারা সেই মহাসুর রক্তবীজকে আঘাত করিলেন। ৪৯ ॥ সেই মহাসুর রক্তবীজও কোপাবিষ্ট হইয়া গদা দ্বারা সকল মাতৃগণকে পৃথক্ পৃথক্ আঘাত করিল। ৫০ ॥ রক্তবীজ শক্তি শূল প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা আহত হইলে তাহার দেহ হইতে যে রক্তের প্রবাহ নির্গত হইল, তাহা হইতে শত শত অসুর জন্মিল। ৫১ ॥ সেই অসুরের রক্ত হইতে জাত অসুরগণ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। তাহাতে দেবগণ অতিশয় ভয়াকুল হইলেন। ৫২ ॥ সেই দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা অবিলম্বে কালী দেবীকে কহিলেন, চামুণ্ডে, তুমি তোমার মুখ বিস্তৃত করো। ৫৩ ॥ আমার অস্ত্রপাত হইতে পতিত রক্তবিন্দুসমূহ এবং তাহা হইতে জাত অসুরগণকে তোমার এই (বিস্তৃত) বদন দ্বারা সত্বর গিলিয়া ফেল। ৫৪ ॥ রক্ত হইতে উৎপন্ন মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি রণক্ষেত্রে বিচরণ কর। তবেই এই দানব রক্তক্ষয় হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ৫৫ ॥ এই ভীষণ অসুরগণ তোমা কর্তৃক ভক্ষিত হইলে আর কেহ উৎপন্ন হইতেও পারিবে না (কারণ রক্ত ত ভূমিতে পড়িবে না)। এই কথা বলিয়া দেবী (চণ্ডিকা) তাহাকে (রক্তবীজকে) অতঃপর শূলদ্বারা আঘাত করিলেন। ৫৬ ॥ রক্তবীজের

যে রক্ত পতিত হইল তাহা কালী দেবী মুখ দিয়া গ্রহণ করিলেন (গিলিয়া ফেলিলেন)। তখন সেই অসুর গদা দ্বারা চণ্ডিকা দেবীকে আঘাত করিল। ৫৭॥ গদার আঘাতে দেবীর বিন্দুমাত্রও বেদনা জন্মিল না। কিন্তু আহত রক্তবীজের দেহ হইতে প্রচুর রক্ত ক্ষরিত হইল। ৫৮॥ সঙ্গে সঙ্গেই চামুণ্ডা (কালী) দেবী নিজের মুখে সেই রক্ত পান করিলেন। সেই রক্ত হইতে উত্থিত মহাসুরগণকেও তিনি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন এবং রক্তবীজের রক্তও পান করিলেন। তখন চামুণ্ডা দেবী রক্ত পান করিয়া ফেলিলে সেই (রক্তহীন) রক্তবীজকে দেবী (চণ্ডিকা) বাণ, অসি এবং ঋষ্টিসমূহদ্বারা আঘাত করিলেন। ৫৯-৬১॥ হে রাজন্! তখন বহু অস্ত্রে আহত হইয়া সেই রক্তশূন্য রক্তবীজ ভূতলে পতিত হইল (প্রাণত্যাগ করিল)। ৬১-৬২॥ মহারাজ! অনন্তর দেবগণ অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিলেন। সেই দেবগণের শক্তি হইতে জাত মাতৃগণও রক্তপান করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৬২-৬৩॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবম অধ্যায়—নিশুম্ভবধ

রাজোবাচ ॥১

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্। ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥২
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥৩

ঋষিরুবাচ ॥৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥৫
হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥৬
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥৭
আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥৮
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্ দেব্যা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥৯
চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥১০
নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥১১

তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্ ।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥১২
ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥১৩
কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ ।
আয়াতং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥১৪
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥১৫
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্ ।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥১৬
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে ।
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥১৭
স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥১৮
তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥১৯
পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ ।
সমস্ত-দৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধ-বিধায়িনা ॥২০
ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥২১
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥২২

অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥২৩
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪
শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥ ২৫
সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম।
নির্ঘাতনিস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥ ২৬
শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৭
ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥২৮
ততো নিশুম্ভঃ সম্প্রাপ্য চেতনামাত্তকার্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥২৯
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥৩০
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ॥৩১
ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥৩২
তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥৩৩

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্ ।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ।।৩৪
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ।।৩৫
তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ ভুবি ।।৩৬
ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণ-শিরোধরান্ ।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ।।৩৭
কৌমারী-শক্তি নির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্ম্মহাসুরাঃ ।
ব্রহ্মাণী-মন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ।।৩৮
মাহেশ্বরী-ত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে ।
বারাহী-তুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ।।৩৯
খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্র-বিমুক্তেন তথাপরে ।।৪০
কেচিদ্ বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী-শিবদূতী-মৃগাধিপৈঃ ।।৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধঃ ।।

নবম অধ্যায়

নিশুম্ভ-বধ

রাজা (সুরথ) কহিলেন, হে ভগবন্! রক্তবীজের বধ অবলম্বন করিয়া দেবীর চরিত্রের যে মাহাত্ম্য আপনি আমার নিকট বর্ণনা করিলেন, তাহা বিচিত্র। ১-২ ॥ আমি আরও (দেবী-মাহাত্ম্য) শুনিতে চাই—রক্তবীজ নিহত হইলে অতি কুপিত শুম্ভ এবং নিশুম্ভ কী করিল। ৩ ॥ ঋষি বললেন, যুদ্ধে রক্তবীজ নিপাতিত হইলে এবং অন্যান্য দৈত্যগণ হত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অতীব ক্রুদ্ধ হইল। ৪-৫ ॥ বিশাল বাহিনী নিহত হইলে নিশুম্ভ কোপবশে প্রধান অসুরসেনা লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। ৬ ॥ তাহার (নিশুম্ভের) সম্মুখে পশ্চাতে ও দুই পাশে মহাসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে দেবীর বধার্থ উপাগত হইল। ৭ ॥ মহাবীর শুম্ভ ও নিজসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া কোপবশে মাতৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া (অতঃপর) চণ্ডিকা দেবীকে বধ করিতে আসিল। ৮ ॥ তখন দেবীর (চণ্ডিকার) সহিত মহাসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল—তাঁহাকে তাহারা (অসুরেরা) দুইজনে মেঘের মত বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। ৯ ॥ তাহাদের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ সমূহ, নিজ শর বর্ষণ করিয়া দেবী ছেদন করিলেন, এবং বহু শস্ত্রদ্বারা দুই অসুর প্রধানের অঙ্গে আঘাত করিলেন। ১০ ॥ নিশুম্ভ তীক্ষ্ণ খড়্গ ও উজ্জ্বল চর্ম লইয়া দেবীর উৎকৃষ্ট বাহন সিংহের মস্তকে আঘাত করিল। ১১। বাহনকে (ঐরূপ) আঘাত করিলে দেবী বাণ দ্বারা সেই তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং সেই অষ্টচন্দ্র চিহ্নিত চর্ম্ম (ঢাল) ছিন্ন করিয়া

ফেলিলেন। ১২ ॥ খড়্গ ও চর্ম ছিন্ন হইলে সেই অসুর (নিশুম্ভ) শক্তি নিক্ষেপ করিল। তাহার সেই অস্ত্র (শক্তি) সম্মুখে আসিয়া পড়িলে দেবী তাহাও চক্রের দ্বারা ছেদন করিলেন। ১৩ ॥ ক্রোধান্বিত নিশুম্ভ দৈত্য তখন শূল লইয়া আক্রমণ করিলে দেবী সেই শূলও মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিলেন। ১৪ ॥ তখন সেও গদা ঘুরাইয়া চণ্ডিকাদেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই গদা ও দেবী ত্রিশূলের আঘাতে ভগ্ন করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। ১৫ ॥ তখন সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ কুঠার হস্তে আসিতেছে দেখিয়া দেবী তাহাকে বহু বাণ দ্বারা আঘাত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। ১৬ ॥ সেই ভীষণ পরাক্রমশালী ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূপাতিত হইলে শুম্ভ অতীব কুপিত হইয়া অম্বিকা (চণ্ডিকা) দেবীকে বধ করিতে অগ্রসর হইল। ১৭ ॥ অতুলনীয়, অতি দীর্ঘ এবং নানাশস্ত্র সমন্বিত অষ্টবাহু দ্বারা রথারূঢ় শুম্ভ সমগ্র গগন মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া শোভমান হইল। ১৮ ॥ দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খ বাজাইলেন এবং ধনুকে অতি দুঃসহ জ্যাধ্বনি করিলেন। ১৯ ॥ তিনি নিজের ঘণ্টারবে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিলেন—তাহাতে সমস্ত দানব সৈন্যের তেজ নষ্ট হইয়া গেল। ২০ ॥ (সেই) সিংহের ভীষণ গর্জনে হস্তিগণের মদস্রাব রুদ্ধ হইয়া যাইত (হস্তীরা অত্যন্ত ভীত হইত)—সেইরূপ গর্জনের দ্বারা সিংহ (দেবীর বাহন) আকাশ, পৃথিবী ও সমীপস্থ দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ২১ ॥ তৎপরে কালী দেবী আকাশে লম্ফ দিয়া উঠিয়া গগন ও পৃথিবীকে করদ্বয় দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই শব্দে পূর্বের সকল শব্দ ডুবিয়া গেল। ২২ ॥ শিবদূতী অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন—অসুরের অশুভকর সেই (হাস্যের) শব্দে অসুরগণ ত্রাসিত হইল এবং শুম্ভ অতীব কুপিত হইল। ২৩ ॥ অম্বিকা দেবী যখন বলিলেন, ওরে

দুরাত্মা, দাঁড়া দাঁড়া, তখন আকাশে অবস্থিত দেবগণ (দেবীর) জয় দিতে লাগিলেন। ২৪ ॥ শুম্ভ আসিয়া তীব্র-শিখাবিশিষ্ট, অগ্নিকূটের ন্যায় দীপ্তিমতী যে শক্তি নিক্ষেপ করিল, তাহা আসিতে আসিতে, দেবী তাহাকে মহোল্কা অস্ত্রে বিনষ্ট করিলেন। ২৫ ॥ হে মহারাজ! শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিভুবনের অন্তরাল পরিপূর্ণ হইল এবং ভীষণ উৎপাত শব্দ উত্থিত হইল। ২৬ ॥ শুম্ভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র বাণ, দেবী স্বকীয় তীব্র বাণ সমূহ দ্বারা ছিন্ন করিলেন। পক্ষান্তরে দেবীর নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র বাণও শুম্ভ স্বীয় ভীষণ বাণের আঘাতে ছেদন করিল। ২৭ ॥ তখন চণ্ডিকা দেবী কুপিতা হইয়া শূলের দ্বারা শুম্ভকে আঘাত করিলে সে মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। ২৮ ॥ অনন্তর নিশুম্ভ চৈতন্যলাভ করিয়া ধনু গ্রহণ করিয়া বাণ দ্বারা দেবী চণ্ডিকাকে, দেবী কালীকে এবং সিংহকে আঘাত করিল। ২৯ ॥ পুনরায় সেই দানবপতি অযুত বাহু (মায়াবলে) সৃষ্টি করিয়া চণ্ডিকাদেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ৩০ ॥ তখন দুর্গতিনাশিনী ভগবতী দুর্গা কোপান্বিতা হইয়া সেই চক্রসমূহ এবং বাণরাজি নিজ বাণ দ্বারা ছিন্ন করিলেন। ৩১ ॥ তখন নিশুম্ভ দৈত্যসৈনিকে পরিবৃত হইয়া গদা লইয়া বেগে চণ্ডিকাদেবীকে বধ করিতে ধাবিত হইল। ৩২ ॥ সে আসিয়া না পড়িতেই চণ্ডিকাদেবী তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গে তাহার গদা ছেদন করিলেন। তখন সে শূল (হস্তে) লইল। শূলহস্তে সেই দেবারি (দৈত্য) নিশুম্ভ অগ্রসর হইলে দেবী চণ্ডিকা তাহাকে বেগে নিক্ষিপ্ত শূলের দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। ৩৩-৩৪ ॥ সে (দেবীর) শূলের আঘাতে বিভিন্ন হইলে তাহার হৃদয় হইতে অপর এক মহাবল মহাবীর্য পুরুষ নির্গত হইয়া 'দাঁড়া দাঁড়া' বলিতে লাগিল। সে (সেই পুরুষ) নির্গত হইবার কালে দেবী উচ্চহাস্য করিয়া তৎপরে খড়্গ

দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন সে ভূমিতে পতিত হইল। ৩৫-৩৬ ॥ অনন্তর সিংহ তাহার ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রা দ্বারা সেই অসুরদিগের ঘাড় ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিল। কালী দেবী এবং শিবদূতী দেবীও অন্যান্য অসুরগণকে ভক্ষণ করিলেন। ৩৭ ॥ কৌমারী দেবীর শক্তি (অস্ত্র) দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া কতগুলি মহাসুর বিনষ্ট হইল। আর অন্য কতগুলি ব্রহ্মাণী দেবীর মন্ত্রপূত জলের দ্বারা (তাহার স্পর্শে) নিহত হইল। ৩৮ ॥ অপর কতক অসুর মাহেশ্বরী দেবীর ত্রিশূলে বিদীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল, কেহ বা বারাহী দেবীর মুখের (মুখাগ্রের) আঘাতে চূর্ণিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। ৩৯ ॥ বৈষ্ণবী দেবীর চক্রে দানবগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। আবার কতগুলি ঐন্দ্রী দেবীর করাগ্রদ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইল। ৪০ ॥ কোন কোন অসুর বিনষ্ট হইল, আবার কেহ কেহ সেই মহাযুদ্ধ হইতে পলায়ন করিল, আবার অন্য কেহ কেহ কালীদেবী, শিবদূতী দেবী এবং সিংহের দ্বারা ভক্ষিত হইল। ৪১ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশম অধ্যায়—শুম্ভবধ

ঋষিরুবাচ ॥১

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্ ।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥২
বলাবলেপ-দুষ্টে ! ত্বং মা দুর্গে ! গর্ব্বমাবহ ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥৩

দেব্যুবাচ ॥৪

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।
পশ্যৈতা দুষ্ট ! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥৫
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্ ।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥৬

দেব্যুবাচ ॥৭

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা ।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥৮

ঋষিরুবাচ ॥৯

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥১০
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥১১
দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা ।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাত-কর্ত্তৃভিঃ ॥১২

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্র-হুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥১৩
ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥১৪
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥১৫
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবত্তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥১৬
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্ম্মুক্তৈঃ শিতৈর্ব্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্ ॥১৭
হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকা-নিধনোদ্যতঃ ॥১৮
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ॥১৯
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥২০
তলপ্রহরাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥২১
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দ্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥২২
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধ-মুনিবিস্ময়কারকম্ ॥২৩

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥২৪
স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২৫
তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২৬
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্র-বিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্ ॥২৭
ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥২৮
উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥২৯
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভর-মানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥৩০
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৩১
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্ দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শুম্ভবধঃ ॥

দশম অধ্যায়

উত্তর-চরিত্র

ঋষি (মেধা) কহিলেন—প্রাণসম ভাই নিশুম্ভকে নিহত দেখিয়া এবং অসুরসৈন্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া (দেবীকে) এই কথা বলিল। ১-২ ॥ ওরে বলদর্পে দর্পিতা দুষ্টা দুর্গা, তুই অহঙ্কার করিস্ না, কারণ তুই অতীব মানবতী হইয়াও অন্য দেবীদের (বলের) সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিস্ (তাই তোর অহঙ্কার সাজে না, কারণ একা ত যুদ্ধ করিতেছিস্ না)। ৩ ॥ দেবী বলিলেন, আমি তো জগতে একাই, আমার কেহ দ্বিতীয় নাই (আমি অদ্বিতীয়া পরাশক্তি ব্রহ্মরূপিণী)। ওরে দুষ্ট, দেখ্ এরা আমার ঐশ্বর্য (শক্তি), আবার আমাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে। ৫ ॥ তৎপরে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবীই সেই দেবীর (অম্বিকার) দেহে লীনা হইলেন এবং এক অম্বিকাই অসুরের সম্মুখে রহিলেন। ৬ ॥ দেবী বলিলেন, আমি নিজ বিভূতির (ঐশ্বর্যের) প্রভাবে যে সকল মূর্তি অবলম্বন (ধারণ) করিয়াছিলাম, তাহা সবই (এক্ষণে) প্রতিসংহার করিলাম। এক্ষণে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে একাই আছি। তুই স্থির হ। ৭-৮ ॥

ঋষি (মেধা) কহিলেন, অনন্তর দেবী ও শুম্ভ এই উভয়ের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সকল দেবতা ও অসুর তাহা দেখিতে লাগিলেন। ৯-১০ ॥ বাণ-বর্ষণ এবং তীক্ষ্ণ ও ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১১ ॥ অম্বিকাদেবী যে সকল দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তাহার প্রতিরোধক অস্ত্রদ্বারা শুম্ভ সে সমস্ত বিনষ্ট

করিল। ১২ ॥ দৈত্য যে সকল দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিল, পরমেশ্বরী অম্বিকাও ভীষণ হুঙ্কারধ্বনি করিয়া তাহা অনায়াসে বিনষ্ট করিলেন। ১৩ ॥ অনন্তর সেই অসুর শত শত বাণ দ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবীও কুপিতা হইয়া বাণ দিয়া তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন। ১৪ ॥ ধনুক ছিন্ন হইয়া গেলে দৈত্যরাজ তখন শক্তি অস্ত্র ধারণ করিল। দেবীও চক্রদ্বারা তাহার (অসুরের) হস্তস্থিত সেই শক্তি ছেদন করিলেন। ১৫ ॥ অতঃপর দৈত্যগণের অধীশ্বর (শুম্ভ) খড়্গ এবং শতচন্দ্রচিহ্নিত উজ্জ্বল চর্ম (ঢাল) লইয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। ১৬ ॥ চণ্ডিকা দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়াই, তীক্ষ্ণ বাণসমূহ শীঘ্র নিক্ষেপ করিয়া তাহার (অসুরের) ধনু ও সূর্যকিরণেরন্যায় উজ্জ্বল চর্ম (ঢাল) ছেদন করিলেন। ১৭ ॥ তখন সেই দৈত্যের অশ্ব নিহত ও ধনুক ছিন্ন হওয়ায়, সে মায়াবিহীন হইয়া অম্বিকা দেবীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া ভীষণ এক মুদ্গর গ্রহণ করিল। ১৮ ॥ সে ধাবমান হইলে দেবী তাহার মুদ্গরটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেও মহাবেগে মুষ্টি উদ্যত করিয়া দেবীর দিকে ধাবিত হইল। ১৯ ॥ সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ দেবীর হৃদয়ে (বক্ষে) মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলে দেবীও করতলদ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিলেন। ২০ ॥ দৈত্য সেই করতল-প্রহারে (চপেটাঘাতে) আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু পরে হঠাৎ আবার উঠিয়া পড়িল। ২১ ॥ সে উচ্চ লম্ফ দিয়া দেবীকে লইয়া আকাশে উঠিয়া পড়িল। দেবী চণ্ডিকা অবলম্বনহীনা হইয়াও সেখানে (আকাশে) থাকিয়া দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তা হইলেন। ২২ ॥ তখন আকাশে দেবী ও শুম্ভ পরস্পর ভীষণ বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অভূতপূর্ব যুদ্ধ দেখিয়া সিদ্ধগণ ও মুনিগণ বিস্মিত হইলেন। ২৩ ॥ বহুক্ষণ

অসুরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া অম্বিকা তাহাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ঘুরাইয়া, ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ২৪ ॥ সেই দুরাত্মা অসুর নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতে পড়িলেও বেগে (উঠিয়া) মুষ্টি উদ্যত করিয়া চণ্ডিকা দেবীর বধেচ্ছায় প্রধাবিত হইল। ২৫ ॥

অতঃপর সেই অসুরকুলের অধিপতিকে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া, শূলদ্বারা দেবী তাহাকে বক্ষে আঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। ২৬ ॥ সেই অসুর, দেবীর শূলাগ্রের আঘাতে নিষ্প্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইবার কালে, সমুদ্র, দ্বীপ ও পর্বত-সহ সমস্ত পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিল। ২৭ ॥ সেই দুরাত্মা (শুম্ভ) নিহত হইলে জগৎ অত্যন্ত শান্ত হইল এবং আকাশও নির্মল হইল। ২৮ ॥ যে সমুদয় উৎপাত-মেঘ (অশুভসূচক মেঘ) ও উল্কা পূর্বে দেখা গিয়াছিল, শুম্ভ নিহত হইলে সেই সমুদয় বিদূরিত হইল, এবং নদীগুলিও নিজপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ২৯ ॥ অনন্তর শুম্ভ হত হইলে দেবগণের হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইল। গন্ধর্বগণও মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। ৩০ ॥ অন্যান্যরা (বাদ্য) বাজাইতে লাগিলেন এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল এবং সূর্যও উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অগ্নিসমূহও শান্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল এবং সকল দিকের অশুভ শব্দ শান্ত হইল। ৩১-৩২ ॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত

একাদশ অধ্যায়—নারায়ণীস্তুতি

ঋষিরুবাচ ॥১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে,

সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।

কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্-

বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাসিতাশাঃ ॥২

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,

প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥৩

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা,

মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।

অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-

দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥৪

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥৫

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ,

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥৬

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গভক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৭
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৯
সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১০
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১১
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১২
হংসযুক্ত-বিমানস্থে ব্রহ্মাণী-রূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৩
ত্রিশূল-চণ্ডাহি-ধরে মহাবৃষভ-বাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৪
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারী-রূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৫
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-গৃহীত-পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৬
গৃহীতোগ্র-মহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৭

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্য-ত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৮

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্র-নয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৯

শিবদূতী-স্বরূপেণ হতদৈত্য-মহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২০

দংষ্ট্রাকরাল-বদনে শিরোমালা-বিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২১

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২২

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২৩

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৪

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়-ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥২৫

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুর-সূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥২৬

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব ॥২৭

অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্ক-চর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥২৮

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা,

রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং,

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য,

ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্ ।

রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্ত্তিং,

কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-

ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা ।

মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে,

বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥৩১

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা

যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র ।

দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে,

তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥৩২

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,

বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্ ।

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি,

বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৩৩

দেবি ! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু,
উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৩৪
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি ! বিশ্বার্ত্তিহারিণি !
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে ! লোকানাং বরদা ভব ॥৩৫

দেব্যুবাচ ॥৩৬

বরদাহং সুরগণা ! বরং যং মনসেচ্ছথ ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥৩৭

দেবা উচুঃ ॥৩৮

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি ।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্‌বৈরিবিনাশনম্ ॥৩৯

দেব্যুবাচ ॥৪০

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে ।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥৪১
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা ।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৪২
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে ।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥৪৩
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্ ।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী-কুসুমোপমাঃ ॥৪৪

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥৪৫
ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৪৬
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাস্ততঃ ॥৪৭
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ! শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৪৮
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ॥৪৯
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
(দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি) ॥৫০
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষপয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥৫১
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৫২
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥৫৩
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥৫৪
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥৫৫

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতিঃ ॥ ১১

একাদশ অধ্যায়

নারায়ণী-স্তুতি

ঋষি (মেধা) কহিলেন, সেই যুদ্ধে মহাসুরাধিপতি শুম্ভ দেবীর হস্তে নিহত হইলে ইন্দ্র সহ সকল দেবতা, অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া সেই দেবী কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইষ্টলাভ করায় তাঁহাদের মুখ (আনন্দে) বিকশিত হইয়াছিল এবং দিক্‌সমূহ ও (দেবগণের আনন্দে) উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ১-২ ॥ হে দেবি! তুমি আশ্রিত জনের (ভক্তের) দুঃখ দূর কর। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। বিশ্বেশ্বরি। এই জগৎ পালন কর। দেবি! তুমি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের হে অধীশ্বরী।৩ ॥ তুমি জগতের একমাত্র আশ্রয়ভূতা, কারণ তুমি পৃথিবী-রূপে বর্তমান রহিয়াছ। দেবি! তোমার শক্তি অনতিক্রম্য। তুমি জলরূপে অবস্থিতা হইয়া এই সমুদয় বিশ্বকে বর্ধিত করিতেছ। ৪ ॥ তুমি অনন্তবীর্যময়ী বৈষ্ণবী শক্তি। বিশ্বের তুমি বীজভূতা। তুমি পরমা মায়াশক্তি। হে দেবি! তুমি এই সমগ্র জগৎ বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্না হইলে ইহলোকেই মোক্ষপ্রদা হও।৫ ॥ হে দেবি! সকল বিদ্যা তোমারই ভেদ (বিলাস)। কলাবিদ্যা-সমন্বিতা সমস্ত নারীই তুমি (তোমার মূর্তিভেদ)। তুমি জননীরূপা হইয়া এই ত্রিজগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। স্তুতি বিষয়ে প্রধান ও অপ্রধান উক্তি (স্তব) তোমার সম্বন্ধে কী হইতে পারে (তুমি সকল স্তুতির অতীত)।৬॥ তুমি সর্ব্বভূতরূপা (ব্রহ্মস্বরূপা বলিয়া সর্বময়ী), স্বর্গদায়িনী ও মুক্তিদায়িনী দেবী। যখন এইরূপে তোমার স্তব করা হয়, তখন তোমার স্তুতির উপযুক্ত কী উৎকৃষ্ট বাক্য কল্পনা করা যাইতে পারে।৭ ॥ সকল

মানবের বুদ্ধিরূপে তুমি অবস্থান করিতেছ, তুমি স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান কর। হে দেবি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি। ৮॥ তুমি কলা কাষ্ঠা (সময়ের অংশ) স্বরূপে পরিণাম (অন্ত) বিধান করিতেছ। তুমি জগতের বিনাশেও সমর্থা। হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি। ৯॥ তুমি সকল কল্যাণের কল্যাণদায়িনী। তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি সকল অভীষ্টপূরিকা। তুমি (জগতের) শরণভূতা, তুমি ত্র্যম্বকা, তুমি গৌরী, তুমি নারায়ণী, হে দেবি, তোমাকে প্রণাম করি। ১০। হে সনাতনি দেবি! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তি। তুমি গুণের আশ্রয় অথচ ত্রিগুণের অতীত। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি। ১১॥ হে দেবি তুমি শরণাগত জনের, দীনের ও দুঃখীর পরিত্রাণ সাধন কর। তুমি সকলের (সকল) দুঃখ বিনাশ কর। হে দেবি নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার জানাই। ১২॥ তুমি হংসচালিত বিমানে অধিষ্ঠিতা ব্রহ্মাণীরূপে স্থিতা। হে দেবি নারায়ণী! তুমি কুশ হইতে (পবিত্র) জল সিঞ্চন কর। তোমাকে প্রণাম করি। ১৩॥ হে দেবি! তুমি ত্রিশূল, চন্দ্র (ললাটে অর্ধচন্দ্র) ও সর্প ধারণ কর (সকলই মহাদেবের ন্যায়)। তুমি মহাবৃষভে অধিষ্ঠিতা, মাহেশ্বরীরূপা শক্তি। হে দেবি নারায়ণি, তোমাকে প্রণতি করি। ১৪॥ হে দেবি! তুমি ময়ূর এবং কুক্কুট দ্বারা পরিবৃতা, তুমি মহাশক্তিধারিণী, তুমি অনঘা (পাপলেশ-হীনা)। এবংবিধা কৌমারী শক্তিরূপিণি হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি।১৫॥ হে দেবি! তুমি শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গধনু, এই পরমাস্ত্র ধারণ করিয়া আছ। তুমি বৈষ্ণবী শক্তি। হে দেবি নারায়ণি! তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে প্রণাম করি। ১৬॥ হে দেবি! তুমি মহাচক্র ধারণ করিয়াছ, তুমি দংষ্ট্রা দ্বারা পৃথিবীকে (সমুদ্র হইতে) উদ্ধৃত করিয়াছ। তুমি বরাহরূপিণী।

হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম। ১৭॥ তুমি উগ্র নরসিংহরূপে দৈত্যগণের বধে উদ্যুক্তা হইয়াছ। ত্রৈলোক্যের পরিত্রাণকারিণী তুমি নারায়ণী দেবী, তোমাকে প্রণাম করি। ১৮॥ তুমি কিরীট, মহাবজ্র ধারণ করিয়া আছ, তুমি সহস্রনয়নধারিণী উজ্জ্বলা, তুমি বৃত্রের প্রাণহরণ-কারিণী। হে ঐন্দ্রীশক্তিরূপিণি দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি। ১৯॥ হে দেবি। শিবদূতীরূপে তুমি দৈত্যগণের বিশাল বাহিনী নিহত করিয়াছ। তুমি ভীষণাকৃতি, ভীমরবা। হে নারায়ণি দেবি! তোমাকে প্রণাম।২০॥ দংষ্ট্রাসমন্বিত তোমার বদন ভীষণ দেখায়, তুমি নরশিরের মালা দ্বারা বিভূষিতা। হে মুণ্ডদৈত্যের মথনকারিণি চামুণ্ডে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি।২১॥ হে দেবি লক্ষ্মি! হে লজ্জা-রূপে! হে মহাবিদ্যে! তুমি শ্রদ্ধা পুষ্টি ও স্বধারূপিণী। তুমি ধ্রুবা (নিত্যা), তুমি মহারাত্রি, তুমি মহামায়া। হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি।২২॥ হে মেধারূপিণি সরস্বতি! তুমি শ্রেষ্ঠা, ঐশ্বর্যরূপিণী (সত্ত্বরূপা), রজোরূপা এবং তমোরূপা। তুমি সনাতনী ঈশ্বরী। প্রসন্না হও। হে দেবি নারায়ণি! তুমি প্রসন্না হও। তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি। ২৩॥ তুমি সর্বস্বরূপিণী, সকলের ঈশ্বরী এবং সর্ব্বশক্তিমতী। হে দেবি! আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা কর। হে দেবি দুর্গে! তোমাকে প্রণাম করি। ২৪॥ তোমার এই যে তিনটি নেত্রসমন্বিত শান্ত বদন, ইহা আমাদিগকে সর্বভূত হইতে রক্ষা করুক। হে দেবী কাত্যায়নি! তোমাকে নমস্কার। ২৫॥ তোমার ত্রিশূল তীব্রদীপ্তিময়, অতিভীষণ এবং সকল অসুরের নাশকারী। এই ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে ত্রাণ করুক। হে ভদ্রকালি দেবি! তোমাকে প্রণাম। ২৬॥ তোমার যে ঘণ্টা, ধ্বনিদ্বারা জগৎ পূরিত করিয়া দৈত্যগণের তেজ বিনষ্ট করে, সেই ঘণ্টা সন্তানবৎ আমাদিগকে

সকল পাপ হইতে রক্ষা করুক। ২৭ ॥ তোমার খড়্গ অসুরের রক্ত ও বসারূপ কর্দমে লিপ্ত এবং দীপ্তিমান্। সেই খড়্গ আমাদিগের কল্যাণ সাধন করুক। হে দেবি চণ্ডিকে! তোমার চরণে আমরা প্রণত হইলাম। ২৮ ॥ হে দেবি! তুমি তুষ্টা হইলে সকল রোগ বিনষ্ট কর। আবার কুপিতা হইলে সকল ঈপ্সিত সকল কামনা বিনষ্ট কর। তোমাকে যাহারা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে, সেই মানবগণের কোন বিপদ্ থাকে না। তোমার আশ্রয় লইলে সে জন জগতের (অন্যান্য সকলের) আশ্রয় (শরণ্য) হইতে পারে। ২৯ ॥ হে দেবি! নিজ মূর্তিকে অদ্য তুমি বহুরূপে প্রকটিত করিয়া ধর্মদ্বেষী মহাসুরগণের যে ধ্বংসসাধন করিয়াছ, হে অম্বিকে দেবি! এইরূপ করিতে আর কে সমর্থ? ৩০ ॥ হে দেবি! নানাবিধ বিদ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞানে, বিবেকবিদ্যায় (উপনিষদাদিতে) এবং আদি শাস্ত্রে (বেদবিদ্যায়) তুমি ভিন্ন কে (প্রবর্তিত করিতে) সমর্থা? মমত্ব বুদ্ধিরূপ যে অন্ধকারময় গর্ত তাহা অতি প্রবল তমসাচ্ছন্ন। তাহাতে এই বিশ্বকে (জগতের জীবকে) ভ্রমণ করাইতে তুমি ছাড়া কে পারে? ৩১ ॥ হে দেবি! যেখানে রাক্ষসগণ ও তীব্রবিষ ভুজঙ্গমগণ বাস করে, যেখানে শত্রুগণ ও দস্যুরা থাকে, সমুদ্রমধ্যে যে স্থলে বাড়বাগ্নি থাকে, সেই স্থানে থাকিয়া তুমি আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। ৩২ ॥ দেবি! তুমি বিশ্বের অধীশ্বরী, তুমি বিশ্বকে পালন করিতেছ। তুমি বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তাই বিশ্ব-স্বরূপা (ব্রহ্মা রূপে)। তুমি বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মাদিরও পূজনীয়া। যাহারা তোমাকে ভক্তি করিয়া প্রণত হয়, তাহারা বিশ্বের আশ্রয়ভূত হয়। ৩৩ ॥ হে দেবি! তুমি প্রসন্না হইয়া আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে সতত রক্ষা কর, যেমন এক্ষণেই অসুরনিধন করিয়া রক্ষা করিয়াছ। তুমি সকল জগতের পাপসমূহ, এবং পাপের ফলে উৎপন্ন

উৎকট উপদ্রবসমূহ (ভূমিকম্পাদি) শান্ত কর। ৩৪ ॥ হে দেবি! তুমি প্রণত ভক্তগণের প্রতি প্রসন্না হও। তুমি সকল জগতের দুঃখহারিণী এবং ত্রিভুবনের অধিবাসীদিগের পূজ্যা। হে দেবি! তুমি লোকসকলের প্রতি বরপ্রদা হও। ৩৫ ॥

(দেবগণের স্তুতি শুনিয়া) দেবী কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের মনের অভিলষিত বর কামনা কর। আমি বরদা (তোমাদিগকে বর দিব)। জগতের কল্যাণকর যে বর চাহিবে তাহাই প্রার্থনা কর—আমি সেই বরই দিব। ৩৬-৩৭ ॥ দেবগণ কহিলেন, হে ত্রিভুবনেশ্বরি! তুমি আমাদের শত্রু (অসুরগণ) বিনষ্ট করিয়া যেমন ত্রিলোকের সকল বিঘ্ন দূর করিলে, তুমি জগতের এইরূপ কল্যাণই সাধন করিও। ৩৮-৩৯ ॥

দেবী কহিলেন, অষ্টাবিংশ যুগে, বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে অপর দুই মহাসুর (আবার) জন্মিবে। ৪০-৪১ ॥ বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী আমি নন্দ নামে গোপের গৃহে যশোদা দেবীর গর্ভে জন্মিয়া সেই অসুরদ্বয় বিনষ্ট করিব। ৪২ ॥ আবার পৃথিবীতে অতি ভীষণরূপে অবতীর্ণা হইয়া আমি বিপ্রচিত্তিবংশীয় মহাসুরগণকে বধ করিব। ৪৩ ॥ সেই বিপ্রচিত্তিবংশীয় অসুরগণকে ভক্ষণ করায় আমার দন্তগুলি দাড়িম পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে। ৪৪ ॥ তৎপরে স্বর্গের দেবগণ এবং পৃথিবীর মানবগণ স্তুতি করিয়া সর্বদা আমাকে রক্ত-দন্তিকা নামে অভিহিত করিবে। ৪৫ ॥ পুনরায় শতবর্ষ ধরিয়া অনাবৃষ্টি এবং জলাভাব ঘটিলে, মুনিগণ আমার স্তুতি করিবে—তখন আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইব। ৪৬ ॥ তখন আমি শত নয়নদ্বারা মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব। অতএব আমাকে লোকে শতাক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিবে। ৪৭ ॥ অতঃপর আমি (অনাবৃষ্টিপীড়িত) সমস্ত

মানবগণকে নিজ দেহ হইতে জাত, প্রাণধারক শাক (তরিতরকারি) দিয়া বাঁচাইয়া রাখিব (ধারণ ও পোষণ করিব), যাবৎ না বৃষ্টি হয়। ৪৮ ॥ ইহাতে আমি 'শাকম্ভরী' এই নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধা হইব। সেই সময়েই আমি দুর্গম নামে এক মহাসুরকে বধ করিব। তাহা হইতে আমার 'দুর্গাদেবী' এই প্রখ্যাত নাম হইবে। ৪৯-৫০ ॥ পুনরায় আমি যখন ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া হিমালয়ে মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষস-সমূহ বধ করিব, তখন আমাকে সকল মুনিগণ প্রণত হইয়া স্তুতি করিবে। তখন আমার 'ভীমাদেবী' এই বিখ্যাত নাম হইবে। ৫০-৫২ ॥ যখন অরুণ নামে এক মহাসুর ত্রিলোকে গুরুতর বিপদ্ (উৎপাত) সৃষ্টি করিবে, আমি তখন অসংখ্য ভ্রমরময় ভ্রামর রূপ ধারণ করিয়া সেই মহাসুরকে ত্রিভুবনের কল্যাণার্থে বধ করিব। তখন লোকে সকল স্থানে 'ভ্রামরী' বলিয়া আমার স্তুতি করিবে। ৫২-৫৪ ॥ এইরূপে যে যে কালে দানবকৃত বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তখনই আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রু বধ করিব। ৫৪-৫৫ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশ অধ্যায়—ভগবতীবাক্য

দেব্যুবাচ ॥১

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥২
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুর-ঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্ বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৩
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৪
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্ট-বিয়োজনম্ ॥৫
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানল-তোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥৬
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥৭
উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারী-সমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥৮
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্ বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥৯
বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ ॥১০
জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥১১

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী ।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ।।১২
সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।।১৩
শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ।।১৪
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে ।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ।।১৫
শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ।।১৬
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ।।১৭
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্ ।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ।।১৮
দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্ ।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ।।১৯
সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ।।২০
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ।।২১
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগপ্রদানৈর্ব্বৎসরেণ যা ।
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ।।২২

শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম ॥২৩
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্য-নিবর্হণম্‌ ॥
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥২৪
যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥২৫
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নি-পরিবারিতঃ।
দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥২৬
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥২৭
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥২৮
সর্ব্ববাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দিতোঽপি বা।
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥২৯
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥৩০

ঋষিরুবাচ ॥৩১

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩২
তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥৩৩
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥৩৪

নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ।।৩৫
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ ! জগতঃ পরিপালনম্ ।।৩৬
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ।।৩৭
ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর !
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া ।।৩৮
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা ।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ।।৩৯
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে ।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ।।৪০
স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা ।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্ ।।৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শুম্ভনিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়—ভগবতীবাক্য

দেবী কহিলেন, এই স্তবসমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি সমাহিত (একাগ্রমনা) হইয়া নিত্য (প্রত্যহ) আমার স্তুতি করিবে, আমি নিঃসন্দেহে তাহার সকল বিঘ্ন দূর করিব। ১-২ ॥ মধু-কৈটভ-বধ, মহিষাসুর-বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ রূপ আমার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য যাহারা ভক্তিপূর্বক অনন্যচিত্তে, অষ্টমী, চতুর্দশী বা নবমীতে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে—তাহাদের কোন পাপ থাকিবে না এবং পাপজনিত বিপদ্‌ও তাহাদের কিছু ঘটিবে না। তাহাদের দারিদ্র্য থাকিবে না এবং প্রিয়বিয়োগ ঘটিবে না। এইরূপ ব্যক্তির শত্রু বা দস্যু বা রাজার নিকট হইতে ভয় থাকিবে না। অস্ত্র, অগ্নি বা জল হইতেও তাহাদের ভয় কখনও হইবে না। ৩-৬ ॥ অতএব আমার এই মাহাত্ম্য সমাহিত চিত্তে পাঠ করিতে হইবে এবং ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিতে হইবে। কারণ ইহাই পরম স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গলকর কর্ম)। ৭ ॥ আমার মাহাত্ম্য (পঠিত বা শ্রুত হইলে) মহামারী হইতে উদ্ভূত নানা উপদ্রব শান্ত করিবে। ইহাতে ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) উৎপাতও শান্ত হইবে। ৮ ॥ যে গৃহে প্রত্যহ আমার এই মাহাত্ম্য যথাযথভাবে পঠিত হইবে, আমি সে গৃহ ত্যাগ করিব না—সেই স্থানেই সন্নিহিত থাকিব। ৯ ॥ বলিদান কালে, পূজার সময়ে, অগ্নিকার্যে (যজ্ঞ হোম প্রভৃতিতে) এবং মহোৎসবে আমার এই চরিত সম্পূর্ণ পাঠ এবং শ্রবণ কর্তব্য। ১০ ॥ লোকে জানিয়া বা না জানিয়াও যদি আমার বলি-পূজা এবং অগ্নিহোম চণ্ডীপাঠপূর্বক অনুষ্ঠান করে, তবে আমি তাহা প্রীত হইয়া গ্রহণ করি। ১১ ॥ মানুষ যদি শরৎকালে আমার বার্ষিকী

মহাপূজা করিবার কালে ভক্তিপূর্বক আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তবে সে আমার অনুগ্রহে সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া ধন, ধান্য ও পুত্র লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১২-১৩ ॥ আমার এই মাহাত্ম্য, আমার যে (বিভিন্নরূপে) কল্যাণময়ী উৎপত্তি এবং (অসুর) যুদ্ধে পরাক্রম, ইহা শুনিয়া মানব (সকল) ভয় হইতে মুক্ত হইবে। ১৪ ॥ আমার মাহাত্ম্য যাহারা শোনে তাহাদের শত্রু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহারা কল্যাণ লাভ করে এবং তাহাদের কুল (বংশের সকলে) আনন্দ লাভ করে। ১৫ ॥ সকল শান্তিকর্মে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে এবং গ্রহজনিত উৎকট পীড়া জন্মিলে আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। ১৬ ॥ (ইহা শ্রবণ করিলে) সকল উপসর্গ শান্ত হয়, দারুণ গ্রহপীড়া দূর হয় এবং (মাহাত্ম্য-শ্রোতা) দুঃস্বপ্ন দেখিলে তাহা সু-স্বপ্নে পরিণত হয়। ১৭ ॥ বালগ্রহে আবিষ্ট শিশুদের পক্ষে ইহা (এই মাহাত্ম্য শ্রবণ) শান্তিকারক হয়। পরস্পরের মৈত্রী বিচ্ছিন্ন হইলে ইহা আবার তাহা সুস্থিত করে। ১৮ ॥ বিবিধ দুরাত্মার ইহাতে অতীব শক্তিক্ষয় ঘটে। ইহা পাঠ করিলেই (পাঠকের বিরুদ্ধ) রাক্ষস, ভূত ও পিশাচসমূহ বিনষ্ট হয়। ১৯ ॥ আমার এই সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব আমাকে নিকটে পায় (আমার কৃপা লাভ করে)। এক বৎসর ধরিয়া পশু (বলি) পুষ্প, অর্ঘ, ধূপ, গন্ধ ও দীপ দ্বারা আমার অর্চনা করিলে এবং দিবানিশি ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম, অভিষেক এবং অন্যান্য ভোগের দ্রব্য প্রদান করিলে আমি যেরূপ তুষ্ট হই, আমার সুচরিত্র (এই মাহাত্ম্য) একবার মাত্র শুনিলেও আমি সেই শ্রোতার প্রতি তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই। ২০-২১ ॥ আমার এই মাহাত্ম্য শ্রুত হইলে শ্রোতার সকল পাপ হরণ করে, তাহাকে আরোগ্য প্রদান করে এবং ভূতগণের উপদ্রব হইতে

তাহাকে রক্ষা করে। যুদ্ধে আমার যে দৈত্য-বিনাশকারী চরিত্র, তাহা শুনিলে মানুষের শত্রু হইতে কোন ভয় জন্মে না। ২২-২৪ ॥ তোমরা (দেবগণ) আমার যে স্তব করিয়াছ, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং ব্রহ্মা যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহা (শ্রুত, পঠিত হইলে) কল্যাণী বুদ্ধি প্রদান করে। ২৪-২৫ ॥ বনে, প্রান্তরে, বনাগ্নি বেষ্টিত অবস্থায়, দস্যুগণে বেষ্টিত হইলে, শত্রুগণ শূন্য-স্থানে (নিঃসহায় অবস্থায়) আক্রমণ করিলে, সিংহ বা ব্যাঘ্র ধাবন করিলে, কুপিত নৃপতি কারাদণ্ডের বা বধের আদেশ দিলে অথবা মহাসমুদ্রে পোতে অবস্থান কালে ঝটিকায় ঘূর্ণিত হইলে, অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ (তাহার প্রতি) নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, গুরুতর বিপৎসমূহ উপস্থিত হইলে, অথবা পীড়াদ্বারা অতীব ব্যথিত হইলেও মানুষ আমার এই চরিত্রের কথা স্মরণ করিলেই (সকল) আপদ্ হইতে মুক্ত হইবে। ২৫-২৯ ॥ আমার চরিত্রের কথা মনে করিলেই আমার প্রভাবে সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, দস্যুগণ এবং শত্রুগণ দূর হইতেই পলায়ন করিবে। ২৯-৩০ ॥

ঋষি (মেধা) কহিলেন, ভীষণ বিক্রমশালিনী ভগবতী চণ্ডিকা এই কথা বলিয়া দেবগণের সম্মুখেই অন্তর্হিতা হইলেন।৩১-৩২ ॥ সেই দেবগণও শত্রু নিহত হওয়ায় আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ববৎ যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ পদ অধিকার করিলেন। ৩৩ ॥ দেবগণের শত্রু শুম্ভদৈত্য ছিল ভুবনধ্বংসকারী মহাবীর, তাহার বিক্রম ছিল অনুপম। সেও নিশুম্ভ দেবীর হস্তে নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে চলিয়া গেল। ৩৪-৩৫ ॥ হে রাজন্! দেবী ভগবতী সনাতনী (জন্ম-মৃত্যু-রহিতা) হইয়াও এইরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণা হইয়া জগতের পালন করিয়া থাকেন। ৩৬ ॥ তিনিই (দেবীই) এই বিশ্বকে (মহামায়ারূপে) মোহিত করেন, তিনিই

আবার বিশ্বকে (সৃষ্টি) করেন। তিনি তুষ্ট হইলে প্রার্থিতা মা হইয়াও বিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) এবং ঐশ্বর্য প্রদান করেন (ভক্তের বাসনা মতো উভয়ই দেন, যেমন বৈশ্যকে তত্ত্বজ্ঞান, রাজাকে ঐশ্বর্য দিয়াছিলেন)। ৩৭॥ হে রাজন্! মহাকাল (প্রলয়) উপস্থিত হইলে এই মহাকালী দেবী মহামারীরূপে জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলেন (এবং ধ্বংস করেন)। ৩৮॥ অজা (জন্মরহিতা) দেবী সনাতনী (নিত্যা) — তিনিই প্রলয়কালে মহামারীরূপা হন, তিনি আবার অজা হইয়াও সৃষ্টিরূপা হন। স্থিতিকালে তিনিই স্থিতিরূপা হইয়া প্রাণিগণের স্থিতি (রক্ষা, পালন) করিয়া থাকেন। ৩৯॥ সৌভাগ্যের সময়ে তিনি লক্ষ্মী হইয়া গৃহে (ধন ধান্যাদির) বৃদ্ধি প্রদান করেন। আবার দুর্ভাগ্যকালে অলক্ষ্মীরূপা হইয়া বিনাশ সাধন করেন। ৪০॥ পুষ্প, ধূপ ও গন্ধ (চন্দন) প্রভৃতি দ্বারা পূজিতা ও স্তুতা হইলে দেবী ধন,পুত্র, ধর্মে মতি এবং (অন্তিমে) উত্তম গতি দান করেন। ৪১॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়—দেবীর বরপ্রদান

ঋষিরুবাচ ॥১

এতত্তে কথিতং ভূপ ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
এবম্প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥২
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া ॥৩
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥৪
তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্ ।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥৬

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ ।
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং শংসিতব্রতম্ ॥৭
নির্ব্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে ॥৮
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিন-সংস্থিতঃ ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥৯
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্ ।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ॥১০
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্ ॥১১
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥১২

দেব্যুবাচ ॥১৩

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ! ত্বয়া চ কুলনন্দন !
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥১৫

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি ।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥১৬
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ-বিচ্যুতি-কারকম্ ॥১৭

দেব্যুবাচ ॥১৮

স্বল্পৈরহোভির্ন্নৃপতে ! স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্ ॥১৯
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥২০
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ ॥২১
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥২২
বৈশ্যবর্য্য ! ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ॥২৩
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥২৫

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্ ॥২৬
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥২৭
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥২৮

ওঁ

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥ ১৩ অঃ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেবীর বরদান

ঋষি (মেধা) কহিলেন, হে নৃপ। এই উত্তম দেবীমাহাত্ম্য আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। যে দেবী এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার প্রভাব (শক্তি) কিরূপ তাহা বলিলাম। ১-২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, মায়া দ্বারা এমন বিদ্যা (আবরক জ্ঞান) সৃষ্টি করেন, যদ্দ্বারা তুমি, এই বৈশ্য এবং অপরাপর জ্ঞানিগণও মোহিত হন, পূর্বেও মোহিত হইয়াছেন আবার ভবিষ্যতেও হইবেন। ৩-৪ ॥ মহারাজ, তুমি সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও। আরাধনা করিলে তিনিই জীবনে ভোগ (সংসারসুখ), স্বর্গ এবং মুক্তি প্রদান করিতে পারেন। ৪-৫ ॥

মার্কণ্ডেয় ঋষি কহিলেন, সেই রাজা সুরথ তাঁহার (মেধা মুনির) ঐ কথা শুনিয়া সেই মহাত্মা দৃঢ়ব্রত ঋষিকে প্রণাম করিয়া, (স্বজনগণের প্রতি) অতিশয় মমত্ববোধ এবং নিজ রাজ্যহরণের ফলে নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে তপস্যা করিতে (বৈশ্য-সহিত) বনে গমন করিলেন। ৬-৯ ॥ হে মহামুনে (ভাগুরে), সেই বৈশ্য ও নৃপতি, মাতাকে (চণ্ডিকা দেবীকে) দেখিবার বাসনায় নদীতীরে থাকিয়া অত্যুত্তম দেবীসূক্ত (ঋগ্বেদের সূক্ত বিশেষ) জপ করিতে করিতে তপস্যায় রত হইলেন। ৯-১০ ॥ তাঁহারা দুইজনে (রাজা ও বৈশ্য) নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সংযতচিত্তে, আহার পরিত্যাগ করিয়া (উপবাসে), তন্মনস্ক এবং সমাহিত হইয়া (যোগ অবলম্বন করিয়া), ফুল, ধূপ ও অগ্নি (হোম) দ্বারা দেবীর তর্পণ (তৃপ্তিসাধন) করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ১০-১১ ॥ তাঁহারা (রাজা ও বৈশ্য) নিজ দেহ হইতে রক্ত দ্বারা সিক্ত উপহার (যেহেতু তপস্যাকালে জীবহিংসা নিষিদ্ধ)

দেবীর উদ্দেশ্যে দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর সংযতমনা হইয়া দেবীর আরাধনা করার ফলে, জগদ্ধাত্রী দেবী চণ্ডিকা অতীব তুষ্টা হইয়া দেখা দিয়া কহিলেন। ১১-১২ ॥ দেবী কহিলেন, হে রাজন্! হে বংশের গৌরবরূপী বৈশ্য! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা সমস্তই পাইবে—আমি পরিতুষ্টা হইয়া তোমাদিগকে তাহা দিব। ১৪-১৫॥ মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিলেন, অনন্তর রাজা এই বর চাহিলেন—পরজন্মে যে রাজ্য হইবে তাহা অবিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে। এই জন্মে নিজ বাহুবলে শত্রুর শক্তি বিনষ্ট করিয়া নিজ রাজ্য যেন পাই (উদ্ধার করিতে পারি)। ১৭ ॥ সেই প্রাজ্ঞ বৈশ্য (সমাধি), চিত্তে নির্বেদ (বৈরাগ্য) উদিত হওয়ায় দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, আমি-আমার এই আসক্তি-বুদ্ধি দূর করে এমন জ্ঞান (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) আমাকে প্রদান করুন।১৮ ॥ দেবী কহিলেন, হে রাজন্! তুমি শত্রু বিনাশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তোমার রাজ্য (পুনরায়) পাইবে। এই রাজ্য অস্খলিত হইবে (কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না) ১৯-২১ ॥ মৃত্যুর পরে তুমি (বহু জন্মের পরে) আবার সাবর্ণি মনু হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে। ২২-২৩ ॥ হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা দিতেছি। পরা সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করার জন্য তোমার জ্ঞান (বিবেক জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান) জন্মিবে। ২৩-২৫ ॥ এইরূপে দেবী তাঁহাদিগকে (সুরথ ও সমাধিকে) তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত বর দান করিলেন এবং তাঁহারা ভক্তিসহকারে দেবীর স্তুতি করিলে তিনি অন্তর্ধান করিলেন। ২৬-২৭ ॥ মার্কণ্ডেয় (মহর্ষি) কহিলেন, ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ সুরথ দেবীর নিকট এইরূপ বর লাভ করিলেন। (যথাকালে) সাবর্ণি মনু হইয়া তিনি জন্ম লাভ করিবেন। ২৮-২৯ ॥

শ্রীসপ্তশতী-দেবীমাহাত্ম্য সমাপ্ত

অপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্রম্

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি* ॥ ১

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে! ময়া, বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ, সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্ ॥ ২

যন্মাত্রা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনং,
ভক্ত্যা ভক্ত্যানুপূর্ব্বং প্রবচনবচনাদ্** ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেঽস্মিং-,
স্তৎ সর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে! ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ॥ ৩

প্রসীদ ভগবত্যম্ব! প্রসীদ ভক্তবৎসলে!
প্রসাদং কুরু মে দেবি! দুর্গে! দেবি! নমোঽস্তু তে ॥ ৪

যস্যার্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে।
তস্য দেহস্য গেহস্য শান্তির্ভবতু সর্ব্বদা ॥৫

---

* ক্ষন্তুমর্হসি তদ্দেবি কস্য ন স্খলিতং মনঃ

** প্রসভক্তিবশাদ্

অপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র

হে মহেশ্বরি দেবি! (পাঠকালে) আমার যে (কোন) অক্ষর বিচ্যুত অথবা মাত্রা (হ্রস্ব এক মাত্রা, দীর্ঘ দুই মাত্রা) স্খলিত হইয়াছে (হইয়া থাকিতে পারে), তোমার অনুগ্রহে তাহা সমস্তই পূর্ণ (অস্খলিত) হউক। ১ ॥ হে জগদম্বে! এই পাঠে (চণ্ডীপাঠে) বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু বা অক্ষর উচ্চারণে আমার যে স্খলন হইয়া থাকে, (তোমার) কৃপায় তাহা পূর্ণতম (সকল ত্রুটিমুক্ত) হউক। আমার যেন সর্বদাই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। ২ ॥ হে জননি! এই যে তোমার সম্পূর্ণ স্তব পাঠ করিলাম, ভক্তি বা অভক্তিবশে, দ্রুত পঠনের ফলে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উচ্চারিত হওয়ায় এবং মাত্রা (হ্রস্ব এক মাত্রা, দীর্ঘ দুই মাত্রা), অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সমাস বা বর্ণাদির যে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে—যাহা মোহবশে বা অজ্ঞতাবশে পঠিত বা অপঠিত (ভ্রষ্ট) হইয়াছে—হে বরদায়িনি ভগবতি! তৎসমুদায়ই তোমার অনুগ্রহে পরিপূর্ণ (ত্রুটিবিচ্যুতি-হীন) হউক। হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও। ৩ ॥ হে ভগবতি! হে মাতঃ! প্রসন্না হও। হে ভক্তবৎসলে! প্রসন্না হও। হে দেবি! আমাকে অনুগ্রহ কর। হে দেবি দুর্গে! তোমাকে প্রণাম করি। ৪ ॥ যাহার নিমিত্ত (কল্যাণার্থে) তোমার এই স্তোত্র পঠিত হইল, হে শঙ্করপ্রিয়ে দেবি! তাহার দেহ ও গেহের সর্বদা শান্তি হউক। ৫ ॥

অপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র সমাপ্ত

গীতাধ্যান

গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব গ্রন্থ

উদ্বোধন বলেন—

গীতা যে কেবল সন্ন্যাস-শাস্ত্র নহে, কেবল কর্ম্ম-শাস্ত্র নহে, কেবল ভক্তি-শাস্ত্র নহে, ইহা যে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমুচ্চয়-শাস্ত্র, অতি নিপুণতা সহকারে গ্রন্থকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শান্তিলাভের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন—জ্ঞান শান্তির জন্য অপরিহার্য্য। কিন্তু কিসের জ্ঞান? যিনি বাহিরে বিশ্বরূপ, অন্তরে যিনি ধীশক্তির প্রচোদয়িতা, তিনি সর্ব্ব-যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, তিনি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্—এই জ্ঞান। এইমাত্র উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

দৈনিক বসুমতী বলেন—

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। ধর্ম্মবক্তা রূপে তাঁহার খ্যাতি আন্তর্জ্জাতিক। সর্ব্বোপরি তিনি একজন বিশিষ্ট সাধক। তাঁহার সাধনা ও পাণ্ডিত্যের ধারার সম্মিলনে গীতাধ্যানের উদ্ভব। বস্তুতঃ গীতার এমন মৌলিক ব্যাখ্যা দুর্লভ।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'গীতাধ্যান' বইখানি পরম আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। হিন্দুর মহাগ্রন্থ এই গীতাকে আপনি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন ও ইহার উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

সুসাহিত্যিক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বলিয়াছেন—

আপনার 'গীতাধ্যান' একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ। গীতার অন্তর্নিহিত অভ্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদ্ঘাটিত করেছেন।